ত্রিপুরার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি

(ত্রিপুরার লোকজীবন ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়)

প্রথম খণ্ড

ডঃ রঞ্জিৎ দে

নবজাতক প্রকাশন

এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭



প্রথম প্রকাশ
২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

Tripurar Lokagiban-o-Lokasanskriti
(Folk-life and folk-lore of Tripura)
by Dr. Ranjit De

প্রকাশক ঃ
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

মুদ্রক
শুভেন্দু রায়
ঊষা প্রেস
শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ শিল্পী
খালেদ চৌধুরী

ভূমিকা

ত্রিপুরার লোকসমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে ত্রিপুরার তরুণ প্রাবন্ধিক ডঃ রঞ্জিৎ দে-র দ্বিতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থ "ত্রিপুরার লোকজীবন ও লোক-সংস্কৃতি" ত্রিপুরায় আমাদের সংস্কৃতি চর্চার উৎস সন্ধানে একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন। ডঃ দের প্রথম গ্রন্থেই আমরা লেখককে চিনেছিলাম।

ত্রিপুরার বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর জনগণের সাংস্কৃতিক জগৎ আজো অনাবিষ্কৃত। যে অল্প কয়েকজন এই আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন, ডঃ দে তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি আমাদের সংস্কৃতি আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান সুহৃদ। তাঁর এই গ্রন্থ ত্রিপুরায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একটি নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করুক।

আমরা আশা করব—ডঃ দে-র এই উদ্যোগে আরো অনেকেই ত্রিপুরার আদিবাসী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতিক পরিচয় সন্ধানে ব্রতী ও উৎসাহী হবেন।

আগরতলা
১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬

অনিল সরকার

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে আমি ত্রিপুরা যাই। তখনই ত্রিপুরা প্রসঙ্গে ও ত্রিপুরার লেখকদের বই প্রকাশে আগ্রহী হই। ইতিপূর্বে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রী বীরেন দত্ত মহাশয়ের একটি বই প্রকাশ করি ও তার পরে ত্রিপুরার প্রবীন সাহিত্যিক শ্রী কার্ত্তিক লাহিড়ি মহাশয়ের একটি উপন্যাস প্রকাশ করি।

এই বৎসর আগরতলা বই মেলায় ডঃ রঞ্জিৎ দে মহাশয়ের এই বইটি ও শ্রী দীপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "সমাজসাহিত্য ও রাজনীতি" নামক বইটি প্রকাশ করতে পারায় আমি ধন্য। বই দুটি পাঠকের কাছে আদৃত হলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

কলকাতা

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

মজহারুল ইসলাম

লেখকের নিবেদন

ত্রিপুরার লোকসাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা মূলক কাজ করে (দক্ষিণ ত্রিপুরার লোক-সাহিত্যে জনজীবন) পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেছি। বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই আলোকে ত্রিপুরার লোকজীবন, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার চেষ্টা করেছি। ত্রিপুরা সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন আলোচনা এখনও পাইনি—তাই এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। এই আলোচনা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

প্রথম খণ্ড ঃ ত্রিপুরার লোকজীবন ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ত্রিপুরার লোকসাহিত্যের পরিচয়।

তৃতীয় খণ্ড ঃ ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির অন্যান্য দিক, যেমন—লোকশিল্প, লোকনৃত্য প্রভৃতি।

শ্রদ্ধেয় ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ডি. লিট. নানাভাবে উপদেশ দিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছেন। শ্রীযুত মজহারুল ইসলামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ত্রিপুরার প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা শ্রদ্ধেয় বীরেন দত্ত মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া 'নবজাতক প্রকাশনের' শ্রদ্ধেয় শ্রীমজহারুল ইসলাম আমাকে বর্ত্তমান গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ রূপদানে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছেন।

এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার অগণিত ছাত্রও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে বলব 'নবজাতক প্রকাশন' বইটি প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে শুধু ঋণীই করেননি কৃতজ্ঞতা পাশেও আবদ্ধ করেছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অনিল সরকার (তথ্য ও সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী) মহাশয়, যিনি ত্রিপুরায় লোকসংস্কৃতির পুনর্জীবন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা নিয়েছেন, তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে এই গ্রন্থের গৌরববর্ধন করেছেন এবং ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির পরিচয়ে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাবরুম, আগরতলা — বিনীত

ফেব্রুয়ারী '৮৬ — **রঞ্জিৎ দে**

সূচীপত্র

ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা—১
ত্রিপুরার সামাজিক পটভূমি—৭
ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি ও সীমা—১০
উপজাতিদের ত্রিপুরা আগমন—১৪
রাজন্য-শাসিত ত্রিপুরার পরিচয়—২০
ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন—৪৪
কিংবদন্তীর দেশ ত্রিপুরা—৫৯
ত্রিপুরার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—৬৬
বিভিন্ন জাতির (বাঙালী ও উপজাতি) সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য—৭৩
উপজাতি জীবনে বিদ্রোহে—৭৮
ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট—৮৩
উপজাতি জনজীবন—৮৯
১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী উপজাতিদের পরিসংখ্যান—১২২
শিক্ষা—১২৬
ধর্ম—১৩৪
জুমভিত্তিক জীবনযাত্রা—১৪৫
ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা—১৫৮
ত্রিপুরায় বহিরাগত ও রাজানুকূল্যপুষ্ট সাহিত্য—১৬৫
জাতি উপজাতির সংস্কৃতিগত ঐক্য—১৭২
বর্ণবিন্যাস—১৭৯
উল্লেখপঞ্জী—১৮৬

ত্রিপুরার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি

ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা

অরণ্য-পর্বত ঘেরা সবুজের ছায়ামাখা ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে বিশ লক্ষ মানুষের বাসস্থান ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্য। ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছোট্ট রাজ্য, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে সুন্দর এক পার্বত্য স্বাধীনদেশ। এর আয়তন ১০,৪৮৬ বর্গ কিলোমিটার।

লংতরাই, টাক্‌কাতুলসী, দেবতামুড়া, আঠাবমুড়া, বড়মুড়া, জম্পুই প্রভৃতি পাহাড় ত্রিপুরার নানা দিকে নানা নামে ছড়ানো। এরা হিমালয়ের শেষ প্রতিভূ। আসামের কোল বেয়ে ত্রিপুরার বুক জুড়ে এদের অবস্থান; ওদের কিছুটা ত্রিপুরার সীমানা ছাড়িয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছে। শাল, সেগুন, গর্জন, চাম, বাঁশ আর পাহাড়ী কলাগাছে এরা ঢাকা। এ ছাড়া রয়েছে জাম, জারুল আর ঘন ছনবন। এই বন সমাবৃত পর্বত অঞ্চল থেকেই বের হয়েছে ত্রিপুরার প্রধান নদীগুলি—গোমতী, মুহুরী, ফেণী, মনু, হাওড়া, জুরি, খোয়াই প্রভৃতি। এসব নদীর তীরে তীরে গড়ে উঠেছে প্রাচীন ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য জনপদগুলি, এদের ঘিরেই গড়ে উঠেছে নানা কিংবদন্তী।

রাজ্যের তিনদিকে বাংলাদেশ, প্রায় ৮৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এর উত্তরে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা, পশ্চিমে কুমিল্লা জেলা এবং পূর্ব দিকে আসাম। এই রাজ্যের রাজধানী শহর আগরতলা থেকে আসামের করিমগঞ্জ জেলা পর্যন্ত দু'শ কিলোমিটার দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পাহাড়ী পথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সংগে তার প্রধান সংযোগ। এ ছাড়া বিমান পথেও বহির্ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগ আছে।

এই রাজ্য তিনটি জেলায় বিভক্ত—দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা ও উত্তর ত্রিপুরা। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ইংরেজশাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু বহু শতাব্দীর রাজন্যশাসন থেকে ত্রিপুরারাজ্য মুক্তি লাভ করে

১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর এবং ভারতবর্ষের 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত হয়। 'খ' শ্রেণীর রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা কেন্দ্রের অধীনে ছিল। ত্রিপুরা-বাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কেন্দ্রের রাজনৈতিক নেতাদের অভিমতই ছিল চূড়ান্ত। ফলে ত্রিপুরাবাসীর দাবীদাওয়া ও অধিকার সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতো না। তাই দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরাবাসী ত্রিপুরাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দেবার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে। অবশেষে ১৯৭২ সালের ২১শে জানুয়ারী ত্রিপুরা "নর্থ ইষ্টার্ণ এরিয়াস এ্যাক্ট অব ১৯৭১" অনুযায়ী পূর্ণ-রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। তার ফলে প্রশাসনিক দিক থেকে এই রাজ্যের দায়িত্ব বহুলাংশে বেড়ে যায়। এ ছাড়া সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে এর প্রতি আরো গুরুত্ব আরোপ করে ত্রিপুরাকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। এবং তিনটি জেলা দশটি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়।

ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ২০,৫৩,০৫৮ জন (১৯৮১-র লোকগণনা অনুসারে)। দেশের ২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার হিসেবে ত্রিপুরা ১৯তম রাজ্য। গত দশ বছরে, অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩১·৫৫ শতাংশ। এই সময় মোট জনসংখ্যা বেড়েছে ৪,৯১,০০৯ জন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত উপজাতিরাই ছিলেন জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশ। ১৯৫১-৫২ সালে এই রাজ্যে সর্বাধিক জনস্ফীতি দেখা যায়। সে সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৭৮·৭১ শতাংশ। তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু স্রোতের ফলে ঐ সময়ে জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে।[১]

প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা স্বাধীনতার পর খুব দ্রুত হারে বাড়ে, আমরা যদি স্বাধীনতাপূর্ব সংগে অবস্থার তুলনা করি তাহলেই বুঝতে পারব। বস্তুতঃ কোন দেশেই জনসংখ্যা বরাবর এক থাকে না। "দেশে নূতন নূতন শিশু জন্ম লইতেছে। আবার বহুলোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। ইহা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আবার জনসংখ্যার একটা অংশ জীবিকার অন্বেষণে অথবা অন্য নানাবিধ কারণে স্বদেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের কেহ ফিরিয়া আসে, অনেকে ফিরিয়া আসে না। আবার বাহির হইতে বহু লোকের আগমন ঘটিতে পারে। তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্বদেশে ফিরিয়া যায়। আবার অনেকে যায় না।"

"The core of demographic study always centres round the concept of population growth. The growth or change in the

absolute number of people during a decade can be ascertained from the difference between the population figures given by the later and earlier censuses The overall change in the population of an area comes out of the combined effect of three factors, namely, Fertility, Morality and Migration. These are thus rightly known as the components of population grown. In a demographic language physical manifestation of human fertility or reproductive process is called 'Birth' while 'Death' results from the process of morality...... A birth makes addition to the population death makes substraction from it. The difference between the number of births and deaths is thus defined as 'Natural changes' (increase or decease) to distinguish it, from the overall change in population which is the net effect of natural change and migrational change (in-migration or out-migration). In contrast to the two biological process of birth and death, migration is a movement of population from one area to another thereby increasing the population of the area imigrated to and decreasing that of the population of the area migrated from.

Incoming persons to an area are labelled as 'in-migrants' while the outgoing persons from an area within country are called 'out-migrants' when these terms relate to international migration i.e. migration between countries they are known as 'immigrants' and 'emigrants' of 'in-imigrants' and the number of 'out-migrants' can be said to be the 'not-migration' constituting the third components of population growth."[২]

ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যাও উপরোক্ত নিয়মে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে এই রাজ্যের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২০,৫৩,০৫৮ জন। অথচ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৫১ সালে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা

ছিল ৬,৩৯,০২৯ জন। নীচে যতদূর হিসেব পাওয়া যায়—সেই অনুযায়ী গত একশত বৎসরে এই রাজ্যের লোকসংখ্যার সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হলো।

সাল	জনসংখ্যা	মোট বৃদ্ধি
১৮৭২	৩৫,২৬২	—
১৮৮১	৯৫,৬৩৭	৬০,৩৭৫
১৮৯১	১,৩৭,৪ ২	৪১,৮০৫
১৯০১	১,৭৩,৩২৫	৩৫,৮৮৩
১৯১১	২,২৯,৭১৩	৫৬,২৮৮
১৯২১	৩,০৪,৪৩৭	৭৪, ২৪
১৯৩১	৩,৮২,৪৫০	৭৮,০১৩
১৯৪১	৫,১৩,০১০	১,৩০,৫৬০
১৯৫১	৬,৩৯,০২৯	১,২৬,০১৯
১৯৬১	১১,৪২,০০৫	৫,০২,৯৭৬
১৯৭১	১৫,৫৬,৩৪২	৪,১৪,৩৩৭
১৯৮১	২০,৫৩,০৫৮	৪,৯৬,৭১৬

এই খতিয়ান অবশ্য পুরোপুরি নির্ভুল নয়—কারণ, "সরকারী সূত্রেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেন্সাসের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করা হইয়াছে। চতুর্থ অর্থাৎ ১৯০১ সাল হইতে লোকগণনার হিসাব নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরা যায়। অনেকের মতে ১৯১১ সালের হিসাবও ত্রুটিপূর্ণ। ঐ সময় রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক গোলযোগের কথা স্মরণ করিলে উক্ত ধারণা যুক্তিসঙ্গত মনে হইবে।"[৩] এই হিসেব থেকে বুঝতে পারি ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মোট বিশ বৎসরের লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কে দুটি পর্বে ভাগ করলে দেখা যায় বৃদ্ধির হার ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যবর্তী সময় অপেক্ষা ১৯৩১-৪১ সালে বেশী। ১৯৪১ সালের পর পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এবং শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের পর সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু আগমনের কথা চিন্তা করলে প্রাক্‌চল্লিশ ও উত্তর চল্লিশ যুগের লোকবৃদ্ধি হারের এই তারতম্য অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। একে দু'ভাগে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ, দেশ বিভাগের পর একদিকে যেমন উদ্বাস্তু আগমন ঘটেছে, অন্যদিকে কিছু সংখ্যক মুসলমানও রাজ্য ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, ১৯৪৯ সালে ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির পর পাহাড় অঞ্চলে যে অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে লোকগণনার কাজ সঠিক ভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। এ কারণে আদিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গণনার বাইরে থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। ১৯৫১ সালের লোকগণনায় রাজ্যের অধিবাসী কম করে ধরা হয়েছে একথা স্বীকার করলেও ১৯৩১-৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ের জনসমষ্টি যে পূর্ববর্তী কালের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সরকারী বিবরণীতে এর কোন উল্লেখ না থাকলেও অনুমান হয়, ত্রিশ দশকের গোড়ায় বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের যুগে কৃষিনির্ভর ভারতের ওপর যে সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তারই ফলে পূর্ববাংলার জেলাগুলি থেকে (চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট) বিরাট সংখ্যক নিঃস্ব কৃষিজীবী আবাদী উর্বর জমির অন্বেষণে ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসে।

কোন নির্দিষ্ট দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি সূত্র ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি, স্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থাৎ নূতন জন্ম, অপরটি বাইরে থেকে লোকের আগমন। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই স্বাভাবিক হার হিসেব করে দেখা গেছে ১৯০১ সাল থেকে ১৯১১ সালের মোট লোকবৃদ্ধির হার মাত্র ১৫% ভাগ স্বাভাবিক বলে ধরা যায়, ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই হার আরও কমে ৬০% জনে দাঁড়ায়।

১৯৫১ সালের জনগণনায় নির্ধারিত জনসংখ্যার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—ত্রিপুরার মোট লোকংসখ্যা ৬,৩৯,০২৯ জন। এদের মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা ২৩৭৯৫৩ জন। অবশ্য এটা লক্ষণীয় যে, আদিবাসীদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ বরাবরই এক গুরুতর সমস্যা। এদের প্রায় অর্ধেক জুমিয়া অর্থাৎ জুমচাষের ওপর নির্ভরশীল। জুমিয়ারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। এরা মূলতঃ যাযাবর, জুমের উপযুক্ত জমির অন্বেষণে প্রতি বৎসর ঘুরে বেড়ায়। এভাবে অতীতে এরা এই রাজ্যের বাইরে চলে যায়।

"রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় আদিবাসীগণের রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কুকিদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে ইংরেজ সরকার তদানীন্তন ত্রিপুরাধিপতির ওপর কুলি সংগ্রহের ভার অর্পণ করেন। এই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার রাজা স্বীয় পার্বত্য প্রজাগণকে কার্য গ্রহণে বাধ্য করেন। এই অপমানকর রাজাজ্ঞার প্রতিবাদে অনেক আদিবাসী সেই সময় রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক

পার্বত্য চট্টগ্রামে চলিয়া যায়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহকারী কমিশনারের বিবরণীতে প্রতি বৎসর ত্রিপুরা হইতে বহুসংখ্যক আদিবাসীর চট্টগ্রাম পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ আছে।"[৪]

সুতরাং ত্রিপুরারাজ্যে বহিরাগত লোক প্রধানতঃ দুই কারণে আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমতঃ, ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য জমির খোঁজে এসেছে—এই ধরনের লোক স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এ রাজ্যে আসতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়তঃ, দেশবিভাগের ফলে এ রাজ্যে কিছু সংখ্যক লোক আশ্রয় নেয়। ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু সংখ্যা নীচের হিসেব থেকে বোঝা যাবে।

সাল	পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা	অন্য রাজ্য
১৯৪৬	৩৩২৭	৬৫
১৯৪৭	৮১২৪	২৬
১৯৪৮	৯৫৫৪	৬৭
১৯৪৯	১.৫৭৫	৩৭
১৯৫০	৬৭১১১	২৫১
১৯৫১	২০১৬	৩
১৯৫২	৮০০০০	
১৯৫৩	৩২০০০	
১৯৫৪	৪৭০০	
১৯৫৫	১৭৫০০	
১৯৫৬	৫০৭০০	
১৯৫৭	৬৬০০	

প্রসঙ্গতঃ তৎকালীন পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন সম্পর্কে খুব উল্লেখযোগ্য সময়ের চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো—"The influx of Hindus from Pakistan to Tripura began mainly from the middle of February 1950 and this number began to increase so rapidly that it necessitated arrangements for providing immediate shelter, and with this end in view of one reception centre was opened at Akhaura border as a temporary measure and from this the refugees were shifted for temporary shelter to the local college and schools ·· the number

of camps and their population and the number of recipients of dols as on different dates are detailed below :

Date	No. of camps	Population	No. of dols
13.12. 1947	—	—	—
30. 6. 1948	—	—	—
31.12. 1949	—	—	—
30. 6. 1950	47	31,537	31,537
31.12. 1950	47	29,922	26,914
30. 6. 1951	39	25,547	24,052

The maximum population in 47 camps was 39,000 in the month of March 1951.[৫]

ত্রিপুরার সামাজিক পটভূমি

ত্রিপুরা গ্রামপ্রধান রাজ্য। বর্তমানে এই রাজ্যে ৭০৪টি গাঁওসভা আছে। রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় নগরজীবন ছিল প্রায় অনুপস্থিত, বা থাকলেও তা ছিল নিতান্তই সীমিত। বর্তমানে যন্ত্রের দ্রুত প্রসার ও আধুনিক জীবনের তাগিদে ধীরে ধীরে নগরজীবন গড়ে উঠছে। বস্তুতঃ রাজ্যের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনসংখ্যাকে নগর ও গ্রামবাসী এই দুই ভাগে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আগরতলাই ছিল এই রাজ্যের একমাত্র শহর। মোট ১,৩২,১৮৬ জনসংখ্যা নিয়ে রাজধানী আগরতলা 'ক' শ্রেণীর শহরের মর্যাদা লাভ করেছে। অন্যতম মহকুমা শহর ধর্মনগর তৃতীয় শ্রেণীর, খোয়াই, বিলনীয়া, কৈলাসহর ও উদয়পুর এই চারটি চতুর্থ শ্রেণীর শহর। কমলপুর ও সাবরুম হলো ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শহর।

মহকুমাগুলির বর্তমান (১৯৮১ সালের গণনা) জনসংখ্যা নিম্নরূপ—

জেলা	মহকুমা	জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা
পশ্চিম ত্রিপুরা	আগরতলা	৬,৩০,৯৫৮	১,৩২,১৮৬
,,	খোয়াই	২,১১,৮৬৮	১০,৭২২
,,	সোনামুড়া	২,৪৪,৩৯১	৬,৩৮০
উত্তর ত্রিপুরা	ধর্মনগর	২,২৯,৪৮৩	২০,৮০৬

জেলা	মহকুমা	জনসংখ্যা	শহরের জনসংখ্যা
উত্তর ত্রিপুরা	কৈলাসহর	১,৯০,৭৮৭	১২,৯২৮
”	কমলপুর	১,২০,৯৭৮	৩,৬৮৮
দক্ষিণ ত্রিপুরা	উদয়পুর	১,৫৯,৯৭৩	১৬,৩০৪
”	অমরপুর	১,১৩,৪৩১	৭,১৫০
”	বিলোনীয়া	১,৮২,৪৩৬	১২,০৫৪
”	সাবরুম	৭৯,৩১৮	৩,৩৪০

১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ত্রিপুরার শহর ও গ্রামের লোকসংখ্যার অনুপাত ১ : ১৪। অর্থাৎ ত্রিপুরার মোট জনসমষ্টির ৯৩.৩% গ্রামবাসী। বহিরাগতের আগমনের জন্যই ১৯৫১-৬১ সালে ত্রিপুরাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৭৯% এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল ২২% জন। শতকরা ৭৯ জনের এই বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের সমগ্র রাজ্য, বা অঞ্চলের বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী। ১৯৬১-৭১ সালের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩৬'৩২%। এই বৃদ্ধিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য বা অঞ্চলের সঙ্গে এর তুলনা করলে চিত্রটা সুস্পষ্ট হবে।

রাজ্য	১৯৭১ সাল (হাজার)	বৃদ্ধির হার (১৯৬১-১৯৭১)
ত্রিপুরা	১৫,৫৬	৩৬'৩২
নাগাল্যাণ্ড	৫,১৫	৩৯ ৬৪
মণিপুর	১০,৬৯	৩৭'১২
গোয়া দমন দিউ	৮,৫৭	৩৬'৭৮
আন্দামান নিকোবর	১,১৫	৮১'১১
মেঘালয়	১,৮৩	৩২'০২
আসাম	১৪,৮৫৭	৩৩'৫১
পশ্চিমবঙ্গ	৪৪,৪৪০	২৭'২৪
কেরল	২.১২,৮০	২৫'৮৯
কর্ণাটক	২,৯২,২৪	২৩ ৯০
উড়িষ্যা	২,৯২,২৪	২৯'৯০
তামিলনাড়ু	৪,১১,০৩	২২'০১

রাজ্য	১৯৭১ সাল (হাজার)	বৃদ্ধির হার (১৯৬১-১৯৭১)
উত্তরপ্রদেশ	৮,৮২,৯	১৯.৭৩
সমগ্র ভারতবর্ষ	৫৪,৬১,৫৫	২৪.৫৭ [৬]

দেখা যাচ্ছে যে, আন্দামান, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং গোয়া দমন দিউ—এরপরই ত্রিপুরার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী এবং আন্দামান ছাড়া এই সমস্ত স্থানেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় সমান। প্রকৃতপক্ষে ১৯০১-৭১ পর্যন্ত এই সত্তর বৎসরের বৃদ্ধির হারও ত্রিপুরায় বেশী। এখানে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৮৯ জন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ১২৯%। এই সত্তর বৎসর আসাম, কেরল, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩৪০, ২৩৩, ১৯৩ এবং ১৯৫ জন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৮২% জন এবং ১১৪% জন। বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই তারতম্য সবটাই স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা জন্ম-মৃত্যুর হারের তারতম্যের জন্য নহে।

মহারাষ্ট্রের বৃদ্ধির কারণ অন্যান্য রাজ্য হতে এরাজ্যে লোক আগমন এবং উত্তরপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে বৃদ্ধির স্বল্পতার একটি কারণ এই রাজ্যগুলি হতে অন্যান্য রাজ্যে লোকের বহির্গমন। ত্রিপুরায়ও পূর্বোক্ত কারণে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। "ত্রিপুরায় স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার বা জন্ম-মৃত্যুর হারের পার্থক্য সমগ্র ভারতবর্ষের হারের চেয়ে অধিক নয়। অনুমান এখানে ত্রিপুরাতে জন্মের হার ৩৬.২% এবং মৃত্যুর হার ১৪.৬৭% অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ২১.৬০%। সমগ্র ভারতে এই হারগুলি যথাক্রমে ৩৭.০, ১৫.৯ এবং ২১.১ জন।"[৭]

ত্রিপুরার বহিরাগত লোকেরা মূলতঃ পূর্ববঙ্গের। এরা শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা থেকে এসেছে। সুতরাং ত্রিপুরাবাসীর লোকসংস্কৃতি মূলতঃ পূর্ববঙ্গের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতি ক্রমশঃ এখানে অভিন্নরূপ নিচ্ছে। অন্যদিকে ত্রিপুরার আদিবাসীদের সঙ্গেও বাঙালী জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটছে। ফলে উভয় সম্প্রদায় তাদের আলাদা আলাদা সংস্কৃতি নিয়ে পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করলেও পরস্পর কিছুটা প্রভাবিত হচ্ছে।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি, প্রাচীন ত্রিপুরার সীমা ও ত্রিপুরায় উপজাতিদের আগমন

ত্রিপুরা রাজ্যের নামকরণের নানা মত প্রচলিত আছে, যেমন—প্রাচীনকালে সে রাজবংশ ত্রিপুরায় রাজত্ব করতেন সে রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত ছিল। যযাতির তৃতীয়পুত্র দ্রুহ্য ত্রিপুরা রাজবংশের আদিপুরুষ। এই বংশের পঞ্চদশ রাজা ত্রিপুর পরাক্রান্ত হলেও অধার্মিক ছিলেন। তাঁর অনাচারে প্রজাগণ সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকত। রাজ্যে অমঙ্গল দেখা দিল। এ সময় রাজ্যে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অসন্তুষ্ট প্রজাগণ রাজাকে হত্যা করে। কোথাও শিব কর্তৃক নিহত হওয়ার বিবরণও পাওয়া যায়।

অহংকারী ত্রিপুর নিজের নামে রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রেখেছিলেন—ইহা সাধারণের বিশ্বাস।

ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে 'রাজমালা'য় নিম্নরূপ বিবৃতি আছে ঃ

"সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।
ত্রিপুরা সুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে॥
ত্রিপুরেশ নামে শিব ত্রিপুর রাজ্যেতে।
তারবরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে।
সেই সে কারণে ক্ষত্রী-ত্রিপুর জাতি বলে।
অবধান কর রাজা মত কুতূহলে।"[৮]

কেহ কেহ বলেন, " 'তুই' ও 'প্রা' দুই শব্দের সহযোগে প্রথমে 'তুই প্রা' এবং কালক্রমে ত্রিপুরা নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ত্রিপুরী ভাষায় 'তুই' শব্দের অর্থ জল এবং 'প্রা' শব্দের অর্থ সমুদ্র। এককালে ত্রিপুরা সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"[৯]

এই নামকরণের সর্বশেষ অবস্থা নিম্নরূপ—"বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইবার পূর্বে সমতল ত্রিপুরার যে অংশ মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়, তাহা "রোশনাবাদ ত্রিপুরা" নামে আখ্যাত হইলেও, জনসাধারণের নিকট ঐ অঞ্চল "মোগলান ত্রিপুরা" নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও প্রথমতঃ "রোশনাবাদ ত্রিপুরা" ও তৎপর "ত্রিপুরা" নামেই পৃথক একটি বৃটিশ জেলা গঠিত হইয়াছিল যাহা দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের "কুমিল্লা" জেলা নামে পরিবর্তিত হইয়া, বর্ত্তমান সময়েও ইহা ভিন্ন রাষ্ট্র 'বাংলা দেশের' 'কুমিল্লা' জেলা নামেই পরিচিত। রাজ্য ত্রিপুরার সঙ্গে

বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতেই, নৃপতি-শাসিত ত্রিপুরা রাজ্য 'স্বাধীন ত্রিপুরা' 'কোহে ত্রিপুরা' 'পর্বত ত্রিপুরা' বা 'পার্বত্য ত্রিপুরা' বা 'হিল টিপারা' বা 'রাজগী' বা 'রাজগী ত্রিপুরা' নামে অভিহিত হইত—নামের ও অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য। শতাধিক বর্ষ পূর্বে রাজ্যের আদালতের সীলমোহরে 'কোহে' (ফরাসী) শব্দেরও ব্যবহার ছিল 'পার্বত্য' অর্থে। ইহার দালিলিক প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যেই পাওয়া যাবে। পরবর্তী কালে (মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরের রাজত্ব সময়ে) এই রাজ্যের সরকারী নাম "ত্রিপুরা রাজ্য" রূপে গৃহীত হইলেও, সরকারী কাগজপত্রে 'রাজগী' অথবা 'রাজগি' শব্দটির ব্যবহার যে শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও প্রচলিত ছিল"[১০] তার বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

সীমা

আধুনিক ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় তিন দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে ৮৪৫ কি.মি. আন্তর্জাতিক সীমানা এবং আসাম ও মিজোরামের সঙ্গে যথাক্রমে ৫৩ কি.মি. এবং ১০৯ কি মি. সীমানা। এর পূর্বদিকে আসাম, মিজোরাম, উত্তরে শ্রীহট্ট, পশ্চিমে কুমিল্লা এবং দক্ষিণে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম।

প্রাচীন ত্রিপুরার বিস্তৃত আয়তন ছিল। রাজমালার প্রথমে লহরে, দৈত্য খণ্ডেও এর বিবরণ আছে।[১১]

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমিও কিরাত জাতিকে ভারতের পূর্বপ্রান্তবাসী বলেছেন। "ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজ হইতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ঐ সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী পার্ব্বত্য জাতিসমূহকে 'কিরাত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্বীকৃত হইতেছে, এক সময়ে হিমালয়ের পূর্বাংশস্থিত বর্তমান ভূটান, আসামের পূর্ব্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশ এবং চীন সমুদ্রের তীরবর্তী কম্বোজ পর্যন্ত স্থানে কিরাত জাতির বাস ছিল এবং সেই সকল স্থান 'কিরাত ভূমি' বলিয়া অভিহিত হইত। এখনও নেপালের পূর্ব্বাংশ হইতে আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে কিরাতগণ বাস করিতেছে। ইহারা নেপালে 'করান্তি' এবং আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে নাগা, কুকি, গারো ও মঘ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।"[১২]

"প্রাচীন রাজমালায় রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ—

'ত্রিবেগ স্থলেতে রাজা নগর করিল।
কপিল নদীর তীরে রাজ্যপাট কৈল।।

উত্তরে তৈউঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্বে মেখলি সীমা পশ্চিমে কাচরঙ্গ ॥

গ্রন্থান্তরে পাওয়া যায়——

'ত্রিবেগ স্থলেতে রাজা নগর করিল।
কপিলা নদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল ॥
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কোচরঙ্গ ॥'

আর এক গ্রন্থে নিম্নোধৃত পাঠ পাওয়া যাইতেছে——

রাজধানী হইল কপিল নদী তীরে।

* * *

উত্তরে তৈরঙ্গ হতে দক্ষিণে আচরঙ্গ।
পূর্বেতে মেখলি সীমা পশ্চিমে কচরঙ্গ ॥"

উত্তর সীমায় কোন গ্রন্থে তৈরঙ্গ নদী, কোন গ্রন্থে তৈয়ঙ্গ বা তৈউঙ্গ নদী লিখিত আছে। এই পার্থক্য যে লিপিকার প্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, তাহা অতি সহজবোধ্য। ত্রিপুরা ভাষায় জলকে 'তুই' বলে। 'উঙ্গ' প্রকর্ষার্থদ্যোতক। 'তুই·উঙ্গ' শব্দ দ্বারা প্রশস্ত জলরাশি অর্থাৎ পবিত্র বা বৃহৎ নদীকে বুঝায়। এই 'তুই অঙ্গ' শব্দ বিকৃত হইয়া তৈয়ঙ্গ বা তৈরঙ্গ প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। প্রকৃত শব্দ যাহাই হউক, ইহা যে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে তৎ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নদ দ্বারাই রাজ্যের উত্তর সীমা নির্দ্ধারিত ছিল। সকল গ্রন্থেই দক্ষিণ সীমায় 'আচরঙ্গ' নাম পাওয়া যায়। এই আচরঙ্গ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটীর (উদয়পুরের) সন্নিহিত। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থান 'আচলং' নামে পরিচিত। একটি নদীর নাম হইতে তৎতীরবর্ত্তী স্থানের এই নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে 'মেখলি' শব্দও সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। অসমীয়াগণ মণিপুর রাজ্যকে মেখলি দেশ বলে। পূর্ব্বদিকে এইরাজ্য ত্রিপুরার প্রত্যন্ত দেশ ছিল। পশ্চিমসীমায়ই গোলযোগ কিছু বেশী। ………কোচরাজ্য ও বঙ্গদেশকে পশ্চিমসীমা বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।"[১৩]

রাজমালার মতে কিরাতদেশ আর্য্যাবর্ত্তের বাইরে অবস্থিত। মহারাজ দৈত্য কিরাতভূমি লাভ করার গ্লানি অনুভব করেন।

"কিরাত আলয় যত অগ্নিকোণ দেশে।

ভাল রাজ্য বাপে মোরে দিয়াছে বিশেষে ॥
কতেক জন্মের আছে পাপের সঞ্চয় ।
তে কারণে বাপে দিছে কিরাত আলয় ॥
আর্য্যাবর্ত্ত হতে ভূমি নাহি পৃথিবীতে ।
ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ স্থল জগত বিদিতে ॥
যে স্থানে জন্মিতে ইচ্ছা করে দেবগণ ।
সাধুসঙ্গ লভে ধর্ম্ম ত্যাজিয়া গগন ॥

*   *   *

এইমাত্র দেখিতেছি কিরাত আলয় ।
ভয়ঙ্কর পশু যত সিংহের উদয় ॥"

(। কালীপ্রসন্ন সেন । রাজমালা । দৈত্যখণ্ড । পৃঃ ৭.)

'রাজমালা' নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নয় । অনেক ঐতিহাসিক 'রাজমালা' সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন । তবু প্রাচীন ত্রিপুরা সম্পর্কে 'রাজমালা' বা লোক-শ্রুতিই এখনও বিশেষ নির্ভরযোগ্য স্থল । ত্রিপুরী ভাষায় রাজ্যের সীমানা সম্পর্কে একটি গান পাওয়া যায়—

"উতুর পার্অ রোআ-গাং ছেরা,
পছিম পার্অ র ব ছিপাই ছম্তরি,
পূব পার্অ ব বথাই ছাই কুরুং,
দক্ষিণ পার্অ ব বরমা পন্জিৎ
বীয়াং তাই কলি হাপ ফাই ?"

অর্থাৎ ত্রিপুরার উত্তর সীমান্তে "রোআগাং" নামে একটি ছোট্ট নদী ছিল, পশ্চিম সীমান্তে সৈন্যসামন্ত থাকে, পূর্ব্ব সীমান্তে এমন একটি জাতির বাস যারা কাপড়ের পাড়ে নক্সা আঁকতে দক্ষ আর দক্ষিণ সীমান্তে বার্মার পর্বতশ্রেণী । এই চারিদিক বন্ধ সীমানায় কি করে কলিযুগ প্রবেশ করলো ? এই হচ্ছে গানের সারমর্ম ।

আর এর মধ্যেই নিহিত ছিল ত্রিপুরা বা ত্রিবেগ রাজ্যের একটি অলিখিত মানচিত্র । রোআগাং কোন নদীর নাম সেটা চিহ্নিত করা যায়নি তবে পশ্চিম সীমানা বোঝা যাচ্ছে মেঘনা-পদ্মা-পূর্ব্বতীর । কারণ ওখানে নবাবী সৈন্য এবং ত্রিপুরা সৈন্য যুদ্ধ বিগ্রহের আশঙ্কায় সব সময়েই মোতায়েন থাক্তো। পূর্ব্ব সীমানাও চেনা যায় । কারণ মণিপুরীরা কাপড় বোনায় এবং রকমারী

নক্সা অংকনে দক্ষ। সুতরাং মণিপুর রাজ্য। দক্ষিণসীমা তো পরিষ্কার Burma Hill Range"

[মহেন্দ্র দেববর্মা ঃ উপজাতি ও ত্রিপুরারাজ্য]

বস্তুঃত প্রাচীনকালেও যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয় নানা কারণে রাজ্যসীমা বার বার পরিবর্তন হয়েছে। তবে কখনও কখনও বর্তমান শ্রীহট্ট, জয়ন্তিয়া, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যও ত্রিপুরার অধীনে ছিল।

উপজাতিদের ত্রিপুরা আগমন

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কিরাত-জন-কৃতি' গ্রন্থে উত্তর ও উত্তর-পূর্বভারতে অবস্থিত কিরাত বা মঙ্গোলয়েডদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ তিনি এই অঞ্চলগুলি সম্পর্কে আলোচনা খুব কম হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন। "THE CIVILIZATION of India is the jo'nt creation of her diverse peoples, Aryan, Dravidian, Austric (Kol) and Mongoloid. Tbe Aryan bases have always received the greatest attention and rightly so. A study of the Dravidian heritage has now been taken up with increased interest since beginnings in this direction were made by Caldwell over a century ago. The Austric elements too are now being investigated and we are realising its importance The Mongoloid contribu ion has not yet been seriously studied as an element in Indian history and civilization" [১৪] সুতরাং এই কিরাতদেশে মঙ্গোলয়েডদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আরো আলোচনার অবকাশ রয়েছে। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র দেববর্মন, ধবলকৃষ্ণ দেববর্মা প্রমুখ লেখকগণ এই বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তবু আসাম বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল সম্পর্কে যতদূর আলোচনা হয়েছে—ত্রিপুরা সম্পর্কে ততখানি আলোচনা হয়নি। কারণ এতদ্‌অঞ্চলের আদিবাসী ও তাদের ভাষা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত ঘটে মাত্র গত শতাব্দী থেকে—"A serious study of the backward Sino-Tibetan and Austric language began only during the middle age of the nineteenth century

when European scholars took up the job in right earnest". (cultural heritage of India Vol, V P 659)

প্রকৃতপক্ষে এতদ্‌অঞ্চল সম্পর্কে শুধু আলোচনার সীমাবদ্ধতা নয় ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতায় মঙ্গোলয়েডদের অবদানও নানাভাবে আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে। যদিও ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মঙ্গোলয়েডদের অবদান গবেষকদের আলোচনায় ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে। "An appraisement of the role of the Mongo'oid peop'es in the development of the composite Hindu or Indian culture, the North-Eastern and Eastern India through Mongoloid contact or participation—should be looked upon as an important line of enquiry in tracing the history of Indian civilization, Yet so far as I know this has not been viewed in its proper perspective by any scholar (except in some works on Nepal) ; and there are reasons for this neglect. The part played by the Mongoloid peoples was confined to the distant eastern and northern frontiers of India—in Central and Eastern Nepal, in North Bihar, in North and East Bengal and in Assam, ···The Mongoloid elements, again, because of their late arrival (they were possibly later than even the Aryans) could not penetrate far into the interior plains of India, and were not in a position to leaven the whole of India, so to say, in the way that the Austrics, the Dravidians and the Aryans did···Their work remained confined to their restricted spheres of operations only.···Their earlier history was already obscure at that time, and still remains obscure, ·····we can now just make some guessess about where they were and what they were doing prior to 1000 A D. [১৫]

কিরাত বা ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতিরা মোঙ্গলীয় বা ভোটবর্মী (Sino-Tibetan) গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১০০০ হাজার বৎসরে পূর্বে সাইবেরিয়া, মোঙ্গলীয়া থেকে ক্রমশঃ চীনের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী উপত্যকায় সমৃদ্ধ উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে তিব্বত হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয়। এবং ধীরে ধীরে কোচ, আসাম, খাসি, জয়ন্তিয়া, মণিপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে মোঙ্গলীয় মানব গোষ্ঠীকেই কিরাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ "পূর্বাঞ্চল ছাড়া ভারতের অপর কোন অংশেরই কিরাত বা মোঙ্গলীয়জন সমষ্টিকে আপনার করে পাবার সৌভাগ্য হয় নি। ভারতের দুই বিরাট মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারতের মানুষ কিরাতদের গুরুত্ব সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হতে লাগলেন, কারণ ওই দুই মহাকাব্যে কিরাতদের কথা উত্তরোত্তর অধিকতর বর্ণিত হতে থাকল। তাঁরা দেখলেন মোঙ্গলীয়দের গায়ের রঙ মনোরম হলুদ রঙের— সোনারঙা হলুদ (কাঞ্চন দ্রুম সন্নিভ) কিংবা হলুদ রঙা কর্ণিকারা ফুলের তুল্য—শ্বেতাঙ্গ আর্য অথবা কৃষ্ণাঙ্গ দ্রাবিড় ও প্রোটো-অস্ট্রেলীয় উপজাতিদের মত আদৌ নয়। এই মোঙ্গলীয়রা ছিল বলিষ্ঠ ও সাহসী মানুষ, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে কুশলী এবং নির্মম। ভেষজ গাছ-গাছড়ার ব্যবহার এঁদের জানা ছিল। বন-সম্পদ এবং সোনা ও রূপার ন্যায় খনিজ সম্পদের সন্ধান এঁরা করেছেন। সুতো কাটা ও বোনার কাজ এঁরা জানতেন। এবং সুতো, সিল্ক ও তন্তু সব রকমের বস্ত্রই এঁরা তৈরী করতেন। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ম্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত যোগ দেন এবং তিনি ছিলেন সমুদ্রতীরবাসী কিরাত। চীনা ও অন্যান্য সৈনিক সজ্জিত এক বিরাট বাহিনীর (অক্ষৌহিনী) পুরোধা।"[১৬]

উত্তর বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই সমস্ত অঞ্চলে কিরাতদের পূর্বে নিষাদ বা অষ্ট্রিক মানব গোষ্ঠী বসবাস করত। পরবর্তী মোঙ্গলীয় বা কিরাত মানব গোষ্ঠী এই সমস্ত অঞ্চল অধিকার করে। এবং তাদের (অষ্ট্রিকদের) ভাষা, সংস্কৃতি কিছু কিছু গ্রহণ করে। মঙ্গোলয়েডদের নানা শাখা এইসব অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। যেমন খাসিয়া জাতি হিসাবে কিরাত বা বোডো হলেও তাদের ভাষা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বা মুণ্ডারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

"ব্রহ্মদেশ ও কম্বোজ হতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে ঐ সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী পার্বত্য জাতি সমূহকে কিরাত নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, এককালে হিমালয়ের পূর্ব্বাংশস্থিত বর্ত্তমান ভূটান, আসামের পূর্ব্বাংশ

মণিপুর, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ পর্যন্ত স্থানে কিরাত জাতির বাস ছিল।" (নগেন্দ্র দেববর্মণ, ত্রিপুরার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন)। ত্রিপুরার "আদিম অধিবাসী পার্বত্য জাতি" বা উপজাতিদের ত্রিপুরায় আগমন ও বসবাস সম্পর্কেও সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। ত্রিপুরার উপজাতিরা প্রধানতঃ বড়ো শাখার অন্তর্ভুক্ত। "কাছাড়ি, গারো, মেচ, রাভা এবং টিপরা (ত্রিপুরা) প্রভৃতি জাতিরা এই বোডো মহাশাখার অন্তর্গত।···কুকী-চীন ও নাগা প্রভৃতি জাতিরা আসাম বর্মা মহাশাখার মঙ্গোলয়েড। এর মধ্যে কুকী-চীন গোষ্ঠীর মোঙ্গল-জাতিরা মণিপুর রাজ্যের (মেইথেই) ও লুসাই পাহাড়ের প্রধান অধিবাসী। কুকী জাতি সেখান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে (টিপরাইরা অবশ্য বোডো মহাশাখার) বিস্তৃত হয়েছে······"[১৭]

মোঙ্গলীয় বা কিরাত মানবগোষ্ঠীর ভাষা ভোটবর্মী ভাষাগোষ্ঠীর (Tibeto-Burman language) অন্তর্ভুক্ত। বৃহত্তর ভাবে এই ভাষাগোষ্ঠীকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা—তিব্বতী শাখা, হিমালয় শাখা, উত্তর-পূর্ব শাখা ও আসাম বর্মী শাখা। আসাম বর্মী শাখা, সংখ্যা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসাম বর্মী শাখাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ঃ—

(ক কুকীচীন—মেইতেই, লুসাই

(খ) মিকির

(গ) নাগা—আও, সেমা, আংগামী, টাংখুল ও ছাঠাংম

(ঘ) বড়ো—ত্রিপুরী, কাছারী, কোচ, মেচ, গারো, রাভা।

সুতরাং ত্রিপুরার উপজাতিদের প্রধান ভাষা বা কক্‌বরক্ ভাষা বড়ো ভাষার একটি শাখা এবং এই ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এক সময় বড়ো ভাষার প্রচলন খুব ব্যাপক ছিল। (At one time Bodo or Boro group of speeches were current throughout the entire valley of the Brahmaputra, in North Bengal up to Northern Bihar and in East and South East Bengal. This very extensive Bodo block is, however, broken up due to the intrursion of the Aryan Assamese and Bengali. The Assam-Bengal Bodo speeches are the Bodo, the Rajbangsi, the Koch, the Mech, the Rabha, the Dimasa, the Kachari, the

Chutya, the Garo, the Haigong and the Tipra (or Tripuri) dialects They are very close to each other, and are largly mutually intelligible.)

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন একটি বিশেষ জাতির উদ্ভব সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। ভারতের জাতি উপজাতিরা ভারতের পূর্ব বা পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করেই এদেশে এসেছিল।

প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে আর্যদের ভারতে আগমন ও আক্রমণ শুরু হওয়ার ফলে উত্তরাঞ্চল থেকে দ্রাবিড়রা ক্রমশঃ বিতাড়িত হতে থাকে। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি অতিক্রম করে আর্যদের পূর্বভারতে প্রবেশ করতে কয়েকশত বৎসর সময় লাগে। গবেষকদের অনুমান খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দ আর্যেরা বিহারে এসে পৌছয়। সুতরাং আরো পরে তারা আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবেশ করে। ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষ ভাবে রামায়ণ মহাভারতে আর্যদের সাথে মোঙ্গলদের বিশেষ যোগাযোগের পরিচয় মেলে। আর্যদের কত কাল পরে মোঙ্গলদের ভারতে আগমন ঘটে - সময় নির্ধারণ সহজ না হলেও ভারতের পশ্চিম উত্তর অঞ্চলে আর্য অধ্যুষিত হিন্দু ধর্ম প্রসারের যুগে পূর্বাঞ্চলে মোঙ্গলদের গভীর প্রভাবের পরিচয় মেলে।

সম্ভবতঃ মোঙ্গলরাও আর্যদের মতই যাযাবর হিসাবে ভারতের বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তারা এইসমস্ত ঢুকে পড়ে এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা অতিক্রমে আরো পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে হিমালয়ের সুবিস্তৃত পাদদেশ তাদের একাধিপত্য এসে যায়।

"বহুবিদ মোঙ্গল জাতির মানুষ আসামের পর্বতে প্রান্তরে বসবাস করে। তারা নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচলেও ছড়িয়ে আছে।...নাগাদের এখন নিজেদের রাজ্য হয়েছে। বৃটিশ শাসিত আসামে যে নাগাপাহাড় জেলা ছিল, তার সঙ্গে নেফা অর্থাৎ অরুণাচলের টুয়ানসাং বিভাগ জুড়ে দিয়ে এই নাগাল্যাণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬০ অব্দে। অরুণাচলের টিরাপ সীমান্তের অধিবাসী দুটি নাগাজাতির মানুষ সুদূর অতীত কাল থেকে নিকটবর্ত্তী সমতলীয় লখিমপুর (অধুনা ডিব্রুগড়ে) জেলার লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করে আছেন। এদের মধ্যে নক্টেদের সংখ্যা হলো ১২০০০ এবং ওয়াবেতাদের সংখ্যা হলো প্রায় ২০০০০, বৃটিশ শাসিত আসামে খাসিয়া জয়ন্তিয়ারা তাদের নামাঙ্কিত জেলায়

বাস করত। এখনো তারা সেই একই জায়গায় বসবাস করে কিন্তু আজকাল এই জেলা নবগঠিত মেঘালয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।...পূর্বভারতে মোঙ্গলসম্ভূত জাতিদের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বোডো অথবা বোড়োরা।... তাদের সমগোত্রেরা বঙ্গদেশ ও বিহারের উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে তো আছেই, এমন কি টিপরাই জাতি হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য তারাই স্থাপন করেছিল। বাংলা-দেশের শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলায় টিপরাইদের দেখা মেলে। হয়তো এককালে তারা কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চীন তিব্বতীয় ভাষা সমূহের অন্তর্গত তিব্বত-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী থেকে বোডো ভাষার উদ্ভব।...মেচ, রাভা, গারো ও কাছাড়ি ভাষা এই বোড়ো ভাষারই শাখা।...বলা হয় মোঙ্গলজাতি হিসাবে বোড়োরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্ত্তী কালে এই উপত্যকার ধারে কাছে কিংবা দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে যায়।..."[১৮]

বস্তুতঃ ধীরে ধীরে আর্য অসভ্যতার প্রভাবে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতির সংমিশ্রণের ফলে যে হিন্দুসভ্যতার উদ্ভব, তার ঢেউ বিহার পর্যন্ত এসে পৌছায় খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে। সুতরাং সেইসময় আর্যদের সাথে পূর্বাঞ্চলের মোঙ্গলদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠা সম্ভব মনে হয়। এ ছাড়া রামায়ণ মহাভারতে ত্রিপুরা বা আসামের বা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যে উল্লেখ দেখা যায় তা' এই সময়কাল থেকেই। এ ছাড়া দশম শতক নাগাদ সংকলিত বেদসমূহের যে সংকলন তাতেও মোঙ্গলদের উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ এদেশের অষ্ট্রিকদের সঙ্গে পশ্চিম অঞ্চলের আত্মীয় বন্ধুদের যোগাযোগ ছিল। সেই যোগসূত্রেই বেদ বা অন্যান্য গ্রন্থে মোঙ্গলদের উল্লেখ দেখা যায়।

সুতরাং দেখা যায়, ত্রিপুরার উপজাতিরা বা মঙ্গোলয়েড শ্রেণীর লোকদের বৃহত্তর ত্রিপুরায় আগমনকাল আনুমানিক ১000 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এবং বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় তারা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এবং জাতি হিসাবে "শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক থেকে এরা 'মঙ্গোলীয়' জাতির বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।"[১৯]

বৃহত্তর সভ্যতার অধিকারী 'মোঙ্গলয়েডদের এই বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবেশ ও অষ্ট্রিয় সংস্কৃতির সঙ্গে যে মিশ্রণ প্রক্রিয়া সে সম্পর্কে গভীর আলোচনা ও গবেষণা প্রয়োজন। যে গবেষণা তুলে ধরবে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ মিলন মিশ্রণের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে।

বহু রাজা-মহারাজার শাসন ও কিংবদন্তীর নায়কদের উপস্থিতি প্রাচীন ত্রিপুরাকে আমাদের নিকট আকর্ষণীয় করেছে। ত্রিপুরার মহারাজগণ চন্দ্র-বংশীয় হিসাবে খ্যাত হলেও প্রাচীন ত্রিপুরায় সূর্যবংশীয়দেরও নানা প্রভাব লক্ষণীয়। "শ্রীহট্ট হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রসারিত পর্বতের নাম 'ত্রিপুরার পর্বতমালা'। ইতিহাসে তার একটি প্রাচীন নাম রয়েছে। সেই নাম 'রঘু নন্দন পর্বত'। এই পর্বতমালার উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি প্রাচীন প্রবাহিনী নদী বিদ্যমান। একটির নাম 'মনু' নদী ও অন্যটির নাম 'গোমতী' নদী। এই এই তিন নামেই আর্য সংশ্রব প্রমাণিত করে। তিনটি নামই বিশুদ্ধ আর্য নাম। আর্য সংশ্রব ব্যতীত এই নামকরণ এইরূপ সম্ভবপর হইতে পারে না।

প্রাগুক্ত রঘুনন্দন শব্দ, রঘুবংশীয়দের দ্যোতক। সূর্যবংশীয়দের মধ্যে রঘুর পব পুরুষগণই রঘুনন্দন নামে পরিচিত। রঘুবংশীয়দের সরযু বা গঙ্গাতীরে অধিষ্ঠিত ছিল, গোমতী নামের নদীটি সরযুর শাখা। মনু সূর্য-বংশীয়দের আদিরাজা। এইরূপে ত্রিপুরার রঘুনন্দন পর্বত ও গোমতী এবং মনুনদী এই তিনটি প্রচীন নিদর্শনের সঙ্গে সূর্যবংশের যোগ দেখতে পাওয়া যায়।...ত্রিপুরার পর্বতমালা কেবল প্রাগৈতিহাসিক তাহা নহে। ত্রিপুরা রাজ্যের শিখরে দেবতামুড়ার সিংহবাহিনী দেবী মূর্তি উৎকীর্ণ এবং কৈলা-সহরের ঊনকোটি তীর্থের পর্বতমালায় খোদিত অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি সূর্যবংশীয়দেরই কীর্তি, এইসব উৎকর্ণ মূর্তিগুলি অতি প্রাচীন ভাস্কর্যের পরিচয় বহন করে আছে।" ত্রিপুরার প্রসিদ্ধ ও প্রধান নদী গোমতীর উৎস ডম্বুর জলপ্রপাতও রঘুনন্দন পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। অবশ্য বর্ত্তমানে সরকারী উদ্যোগে জলাশয় তৈরী হওয়ায় এই জলপ্রপাত নেই। সূর্যবংশের এইরূপ নানা প্রভাব ত্রিপুরার নানা জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। মনে হয় ত্রিপুরার চন্দ্রবংশীয় রাজারা সূর্যবংশীয় রাজাদের পরাস্ত করে এখানে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। গোমতীতে যে গঙ্গার কল্পনা অতি প্রাচীন কালেই ছিল তার আভাস 'ময়নামতীর গানে' আছে "সত্যযুগে গঙ্গাদেবী গুমুতে আছিল"।

রাজবংশের আদি ইতিহাস 'রাজমালা' প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। এ গুলি প্রামাণ্য নয়। কিন্তু এ ছাড়া প্রামাণ্য কোন ইতিহাসও নেই। বলা হয় রাজা দ্রুহ্য ত্রিপুরার রাজবংশের আদি পুরুষ। দ্রুহ্য যযাতির পুত্র। রাজা

যযাতি একদিন একটা অপরাধ করায় দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্য তাঁকে অভিশাপ দিলেন। শুক্রাচার্যের অভিশাপে তিনি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যযাতি এই অকাল বার্ধক্যে বিপন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি ঋষির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে অনুনয় বিনয় করলে ঋষি বললেন—যদি কোন পুত্র তাঁর জরা গ্রহণ করেন তবে তিনি পাপ মুক্ত হবেন।

যযাতির পাঁচ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত আর কেউ তাঁর জরাভাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তিনি তাঁদের দূরদেশে পাঠিয়ে দেন—পুত্র দ্রুহ্যুকে সাগর দ্বীপের অধিপতি নির্বাচিত করেন, তিনি সেখানে ত্রিবেগ নামে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেন। ত্রিবেগ পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়। "দ্রুহ্যের স্থাপিত রাজ্য সীমা রাজমালায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, ইহার পূর্বে মেখলিদেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ, দক্ষিণে আচরঙ্গ নামক রাজ্য। ত্রিবেগ রাজ্যের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ দ্বারা রাজমালা লেখক আমাদের মতের সত্যতা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে পোষণ করিতেছেন। কাছাড়বাসিগণ দ্বারা 'মিতাই' অর্থাৎ মণিপুরিগণও তাহাদের বাসভূমি 'মেখলি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সেই মেখলি দেশের পশ্চিমস্থ ত্রিবেগ রাজ্য আধুনিক কাছাড় ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতে পারে না।

সেই দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর। মতান্তরে দ্রুহ্যের বংশে দৈত্য নামক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। সেই দৈত্যের ঔরসে ত্রিপুরের জন্ম। তিনি কিরাত নামের উচ্ছেদ সাধন পূর্বক স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম 'ত্রিপুরা' এবং স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে ত্রিপুরাজাতি বলিয়া প্রচার করেন। আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ত্রিপুর হইতে বংশাবলী গণনা করা সঙ্গত। তৎপূর্ববর্ত্তী যযাতি, দ্রুহ্যু প্রভৃতি নামগুলি বৌদ্ধদ্রোহি ব্রাহ্মণদিগের কল্পনাপ্রসূত। রাজমালা লেখক বলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়কালে এই ত্রিপুর নরপতি সহদেবকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণনা যে নিতান্ত কবিকল্পনা প্রসূত তাহা বারংবার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।"[২০]

ত্রিপুর খুব অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ট প্রজারা শিব আরাধনায় রত হন। শিব তাদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরকে বধ করেন।

ত্রিপুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী হীরাবতী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু হীরাবতীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী কে হবেন—এই ভেবে

প্রজারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা আবার শিবের আরাধনা শুরু করেন। শিব তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং শিবের দয়ায় বিধবা রাণী হীরাবতী গর্ভবতী হন। পরে তিনি সুসন্তান কামনায় চৌদ্দ দেবতার পূজাও করেন। চৌদ্দ দেবতার পূজা প্রচলনের একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এরূপ……

চৌদ্দ দেবতার পূজা

রাজা ত্রিপুর অত্যাচারীত প্রজাদের আহ্বানে মহাদেব কর্তৃক নিহত হলে ত্রিপুর সিংহাসন শূন্য থাকে। তখন প্রজাদের কাতর আবেদনে ও রাণী হীরাবতীর কাতর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেবের আশীর্বাদে বিধবা রাণী হীরাবতীর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম ত্রিলোচন।

ত্রিলোচনের মা হীরাবতী রাণী হলেও ঘরের কাজ নিজের হাতেই করতেন। একদিন রাণীমা জলের জন্য নদীতে গেছেন এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন কিছু আর্তকণ্ঠ তাঁকে ডাকছে। তিনি তাদের চীৎকারে সাড়া দিয়ে জানতে পারলেন তাঁরা চৌদ্দ জন দেবতা। হীরাবতী তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে তাঁরা বললেন, "রাণীমা, আমরা চৌদ্দজন দেবতা। একটা পাঁজি মোষ আমাদের তাড়া করে নিয়ে এসেছে। উপায় না দেখে প্রাণ বাঁচাতে শিমুল গাছে চড়েছি। মোষটা গাছে উঠতে পারছে না, তাই যা রক্ষে। একগুঁয়ে মোষটা গোড়া থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না। ক্লান্তিতে এখন একটু ঝিমুচ্ছে মনে হয়। গাছ থেকে নামতে গেলেই শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে। মোষটাও নড়ছে না আমরাও নামতে পারছি না। আজ সাতদিন আমরা কিছুই খাইনি। তুমি সৌভাগ্যবতী ত্রিপুরার মহারাণী সতীসাধ্বীও বটে। এ বিপদ থেকে তুমিই আমাদের বাঁচাতে পার।"

রাণীমা অবাক হয়ে বললেন—আমি মানুষ হয়ে দেবতাকে কিভাবে রক্ষা করব? দেবতারা বললেন, "রাণীমা, সতী নারীর কিছুই অসাধ্য নেই। আমরা দেবতা, কখনও মিথ্যা কথা বলি না। যা কিছু বলছি, মন দিয়ে শোন। কোন এক অভিশাপে আজ আমরা মোষটার সঙ্গে পেরে উঠছি না। আমরা যা পারিনি তুমি তা করতে পারবে বলেই এ রাজ্যে ধেয়ে এসেছি। মোষটার কবল থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও। আমরা চিরদিন তোমার কাছে বাঁধা থাকব। তুমি তোমার রিছা (বক্ষাবরণী) মোষটাকে দেখিয়ে পিঠে ফেলে দিলেই সে বাগে আসবে। তখন ওটাকে শিমুল গাছে বেঁধে বলি দিলেই আমরা নেমে আসব। এরপর তুমি আমাদের বাড়ী নিয়ে যেও।"

রাণীমা দেবতার এই নির্দেশে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক নিয়ে এসে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মোষটাকে মেরে ফেললেন এবং দেবতাদের দেবতার ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে দিনটা ছিল আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী।

তারপর প্রতিদিন দেবতার সেবা অর্চনা চলতে লাগল। ত্রিলোচনের তখন ছেলে বয়েস—ভালমন্দ ততটা জ্ঞান হয়নি। রোজ সকালে খাইয়ে দাইয়ে ছেলেকে দেবতার ঘরে পেঁছে দেন খেলা ধুলা করতে। এভাবে দিন যায়। কিন্তু ছেলে দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। হীরাবতীর চিন্তার শেষ নেই। মা একদিন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বাবু, তুমি দিন দিন এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ? অসুখ বিসুখ করেনি তো ?" ছেলে বলল—"না মা, আমার কোন অসুখ করেনি। কিন্তু সকালে যখন দেবতাদের ঘরে যাই তখন বেশ থাকি, ফিরে আসতে দুর্বল বোধ করি।" ছেলের কথায় রাণীমা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

একদিন রাণীমা কি ভেবে কি জানি দেবতাদের ঘরে গেলেন ছেলেকে দেখতে। দরজা বন্ধ, ভেতরে কোন শব্দ নেই। কিন্তু বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিতেই চক্ষু ছানাবড়া। তিনি দেখলেন দেবতারা একটা পাঁঠা বলি দিলেন এবং তার রক্ত পান করলেন। তারপর মন্ত্রপড়া জল দিতেই পাঁঠাটা জোড়া লেগে গেল এবং জোড়া লাগা পাঁঠা মানুষ হয়ে গেল। তিনি আরো অবাক হয়ে দেখলেন সেই মানুষটা ত্রিলোচন। রাগে দুঃখে রাণীমা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন এবং দেবতাদের খুব বকলেন। দেবতারা লজ্জা পেলেন। তাঁরা রাণীমাকে বললেন, "আমরা যে খুবই অন্যায় করেছি তা সত্যি। কিন্তু কি করব। এদ্দিন লজ্জায় তোমাকে কিছু বলিনি। আমরা অমৃত পান করেও ততটা খুশি হইনা যতটা হই একবিন্দু রক্তপান করতে পেলে।" রানীও ভাবলেন—সত্যি তাঁর ভুল হয়ে গেছে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে রাণীমা করজোড়ে দেবতাদের বললেন, "আপনাদের সংগে উদ্ধত ব্যবহার করেছি বলে ক্ষমা করুন। আজ থেকে আপনাদের রুধির ভোগের জন্য একটা করে পাঁঠার ব্যবস্থা থাকবে। আপনাদের সেবা পুজোয় আরো কিছু ত্রুটি থাকলে কৃপা করে খুলে বলুন। আমি তা পূরণ করব।" রাণীমার কথা শুনে দেবতারা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা প্রাণভরে রাণীমাকে আশীর্বাদ করলেন।

এইভাবে রাণী হীরাবতী চতুর্দশ দেবতাদের পুজার প্রচলন করেন এবং তা' আজো প্রচলিত আছে।[২১]

দশ বৎসর বয়সে ত্রিলোচন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চতুর্দশ

দেবতার বিধিসম্মত পূজা পদ্ধতি প্রচলন করেন এবং এই চৌদ্দদেবতাই ত্রিপুরার রাজবংশের আদিকুল দেবতা। এই দেবতার পূজা আজও 'চন্তাই' কর্ত্তৃকই করা হয়।

মহারাজ ত্রিলোচন কাছাড় রাজের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর সন্তানদের নাম—দৃক্‌পতি, দক্ষিণ, দক্ষ, দ্রুমায়ু, দ্রাবিণ, দৃষ্টঘ্নো, ভৃগু, দুর্দ্ধর, দ্রুহ, দুষ্মায়ু, দৈবিরি এবং দম্প।

ত্রিলোচন ১২০ বৎসর রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ত্রিলোচনের মৃত্যুর পর পৈত্রিক সিংহাসন নিয়ে দৃক্‌পতি ও দক্ষিণের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দৃকপতি জয়ী হন। তারপর ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে জানা যায় না। নীচে 'রাজমালা' অনুসারে ত্রিপুর রাজবংশাবলীর পরিচয় দেয়া হলো—

ত্রিপুর-রাজবংশাবলী

যযাতি
|
দ্রুহ্যু

১। ত্রিপুর

২। ত্রিলোচন

দৃকপতি   ৩। দক্ষিণ

৪। তদরক্ষিণ
৫। সুদক্ষিণ
৬। তরদক্ষিণ
৭। ধর্মতর
৮। ধর্মপাল
৯। সুধর্ম
১০। তরবঙ্গ
১১। দেবাঙ্গ
১২। নরাঙ্গিত
১৩। ধর্মাঙ্গদ
১৪। রুক্মাঙ্গক
১৫। সোমাঙ্গদ
১৬। নৌযুংরায়
১৭। তরজু রায়
১৮। তররাজ
১৯। হামরাজ
২০। বীররাজ
২১। শ্রীরাজ
২২। শ্রীমন্ত
২৩। লক্ষ্মীতর
২৪। তরলক্ষ্মী
২৫। মাইলক্ষ্মী
২৬। নাগেশ্বর
২৭। যোগেশ্বর
২৮। ঈশ্বরফা

২৯। রঙ্গখাই

৩০। ধনরাজফা

৩১। মুচুংফা

৩২। মাইচুংফা

৩৩। তত্তুরাজ

৩৪। তরফানাই ফা

৩৫। সুমন্ত

৩৬। রূপবন্ত

৩৭। তরাহাম

৩৮। খাহাম

৩৯। কতরফা

৪০। কালতরফা

৪১। চন্দ্রফা

৪২। গজেশ্বর

৪৩। বীররাজ

৪৪। নাগপতি

৪৫। শিখরাজ

৪৬। দেবরাজ

৪৭। ধুরাসা

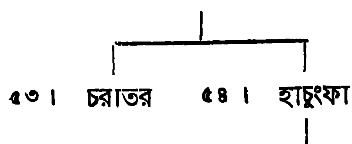
৪৮। তিররাজ

৪৯। সাগরফা

৫০। মলয়াচন্দ্র

৫১। সূর্য্য রায়

৫২। হাতুংফানাই



৫৩। চরাতর ৫৪। হাচুংফা

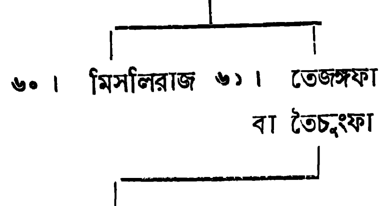
৫৫। বিমার

৫৬। কুমার

৫৭। শুকুরায়

৫৮। তছরাও

৫৯। রাজেশ্বর



৬০। মিসলিরাজ ৬১। তেজঙ্গফা বা তৈচুংফা

৬২। নরেন্দ্র

৬৩। ইন্দ্রকীর্ত্তি

৬৪। বিমানরাজ

৬৫। যশোরাজ

৬৬। নবাঙ্গ

৬৭। রাজগঙ্গা

৬৮। শুক্ররায়

৬৯। প্রতীত

৭০। মিরিছিম

৭১। গগণ

৭২। নাওরাই

৭৩। জুঝারুফা

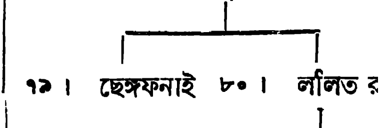
৭৪। জাঙ্গেফা

৭৫। বেবরায়

৭৬। শিবরায়

৭৭। ডুঙ্গুরফা

৭৮। খারুংফা



৭৯। ছেঙ্গফনাই ৮০। ললিত র

৮১। মুকুন্দফা

৮২। কমলরায়

৮৩। কৃষ্ণদাস

৮৪। যশোফা

৮৫। মনুচুংফা ৮৬। সাধুরায়

৮৭। প্রতাপরায়

৮৮। বিষ্ণুপ্রসাদ

৮৯। বাণেশ্বর

৯০। বীরবাহু

৯১। সম্রাট

৯২। চাম্পা

৯৩। মেঘ

৯৪। ছেংফাছাগ

৯৫। ছেংযুমফা

৯৬। আচঙ্গফা

৯৭। খিছুংফা

৯৮। ডুঙ্গুরফা

৯৯। রাজাফা ১০০। রত্নমাণিক্য

১০১। প্রতাপমাণিক্য ১০২। মুকুটমাণিক্য

১০৩। মহামাণিক্য

গগনফা

১০৪। ধর্মমাণিক্য

১০৫। প্রতাপমাণিক্য ১০৬। ধন্যমাণিক্য

১০৭। ধ্বজমাণিক্য ১০৮। দেবমাণিক্য

১০৯। ইন্দ্রমাণিকা ১১০। বিজয়মাণিক্য ১১৪। অমরমাণিক্য

১১১। অনন্তমাণিক্য

১১২। লুব্বা গোপীপ্রসাদ
বা উদয়মাণিক্য

১১৩। জয়মাণিক্য

১১৫। রাজধরমাণিক্য

১১৬। যশোধর মাণিক্য

জয়মাণিক্য

১১৮। গোবিন্দমাণিক্য

১১৯। ছত্রমাণিক্য

গগনফা

১১০। কল্যাণমাণিক্য

১২০। রামমাণিক্য

২১। রত্নমাণিক্য

১২২। নরেন্দ্রমাণিক্য

১২৩। মহেন্দ্রমাণিক্য

১২৪। ধর্ম্মমাণিক্য

১২৫। জগৎমাণিক্য

১২৬। মুকুন্দমাণিক্য

২৭। জয়মাণিক্য

২৮। বিজয়মাণিক্য

১২৯। উদয়মাণিক্য

১৩০। ইন্দ্রমাণিক্য

১৩১। লক্ষ্মণমাণিক্য

১৩২। কৃষ্ণমাণিক্য

১৩৩। বলরামমাণিক্য

১৩৪। রাজধরমাণিক্য

১৩৫। রামগঙ্গামাণিক্য

১৩৬। দুর্গামাণিক্য

১৩৭। কাশীচন্দ্রমাণিক্য

১৩৮। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য

১৩৯। ঈশানচন্দ্রমাণিক্য

১৪০। বীরচন্দ্রমাণিক্য [২২]

ত্রিপুরার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ নেই। 'রাজমালা' নির্ভরযোগ্য নয়, তবু এর থেকে কিছু সংকেত লাভ করা যায়। সে অনুযায়ী রাজাদের সংখ্যার একটা হিসাব মিললেও তাঁদের সকলেব সম্পর্কে বিস্তৃত কোন বিবরণ নেই।

নানা ভাবে অনুসন্ধানের ফলে মুদ্রা ও লিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করে মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে নির্ভরযোগ্য কিছু আলোচনার সূত্রপাত ঘটেছে। সুতরাং এর পূর্ববর্ত্তী সময়কে প্রাগৈতিহাসিক বা আদিযুগ হিসেবে চিহ্নিত

করা যেতে পারে। এই সময়ের রাজাদের রাজত্ব কালের কোন নিদর্শন ঐতিহাসিকদের হাতে নেই।

এই সময়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কারো কারো অভিমত আদি যুগে "...এ অঞ্চলে ত্রিপুরা নামে কোন স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি এজন্যে অনেকাংশে দায়ী।...সমতল ভাগের অধিবাসীরা বাঙালী, জীবিকা চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য। পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসীরা কিরাত জাতির শাখা-প্রশাখা, জীবিকা বন্য ফলমূল আহরণ, শিকার, জুমচাষ। সমতলের রাজনৈতিক চিত্র নাটকীয় ও দ্রুতগামী। পার্বত্যঅঞ্চলের রাজনৈতিক পট আদিম ও মন্থর। সমতল ভাগেই প্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পাহাড়ে তখন উপজাতীয় গোষ্ঠীপতি।...আসাম, ব্রহ্মদেশ ও আরাকাণ হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সঞ্চরণশীল কতকগুলি সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়েও বিভিন্ন দলে এসব এলাকায় বসতি বিস্তার শুরু করে। এদের মধ্যে তখনও বোঝা পড়ার একান্ত অভাব ছিল। প্রতি সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা প্রশাসন ছিল। প্রশাসনের নিম্নতর কেন্দ্র ছিল পাড়া। স্বয়ংভর অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমাজগুলো বাইরের পৃথিবীর প্রতি অনেকটা নির্বিকার থাকত, তবে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ ও লুঠতরাজ নিজেদের এবং সমতলের জীবনে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত। ..অন্যান্য উপজাতীয় গোষ্ঠীর কপালে রাজতিলক না পরে ত্রিপুর বংশেরই কপালে পরার কারণ হল এই—ত্রিপুরার উত্তর দিক থেকে প্রবেশ করে এরা অপেক্ষাকৃত সমতলে বাস করতে থাকেন, এবং পূর্বে উঁচু পাহাড়ের দিকে সংঘবদ্ধ কুকী লুসাইদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে তাঁরা সমতলমুখী হন ও সমতলবাসীদের জীবনযাত্রা ও উন্নত যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসেন। তাঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে দ্রুততর গতিতে ব্যাপক পরিবর্ত্তন এল।"[২৩]

এই সময় সমতল অংশে কারা রাজত্ব করেন সেই বিবরণও অসম্পূর্ণ। সমতট অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত শিলুয়ার আবিষ্কৃত ভগ্নমূর্ত্তিই প্রাচীনতম। এর লিপি খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর। তার পরবর্ত্তী সময়ের তাম্রশাসন কুমিল্লা জেলার গুণাইঘরে পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় মহারাজা বৈন্যগুপ্ত (খ্রীঃ ৫০৭-০৮) ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমতট অঞ্চলে খড়্গ বংশের আবির্ভাব ঘটে। "...অসরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে ঐ বংশের চারিপুরুষের নাম পাওয়া যায়,

খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ, দেবখড়্গ এবং যুবরাজ রাজরাজ ভট্ট। যে 'কর্মান্তবাসকে' লিপিদ্বয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা কুমিল্লার অনতিদূরবর্ত্তী কর্মান্তনগর বা বড়-কামতা বলিয়া আপাততঃ নির্ধারিত হইয়াছে। লিপিদ্বয়ে খড়্গগণকে 'সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তাঁহার শান্ত, ভব-বিভব-ভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সঙ্ঘের পরম ভক্তিমান উপাসক' বলিয়া দেখিতে পাই। 'পরম সৌগত উপাসক' জাতখড়্গের পুত্র নরপতি দেবখড়্গের প্রথম শাসনখানি দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি যুবরাজ রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্যবন্দ্য সঙ্ঘমিত্রের বিহারে, এবং দ্বিতীয়খানি দ্বারা তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে যুবরাজ রাজরাজ কিয়ৎ-পরিমাণ ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালিবর্দ্ধ (র্দ্ধ) কস্থিত আচার্য সঙ্ঘমিত্রের বিহারে দান করিয়াছিলেন। উভয় তাম্রশাসনে সংযুক্ত রাজমুদ্রা দেখিয়া অনুমান হয়, অর্হৎগণের বাহন বৃষ খড়্গদের লাঞ্ছন ছিল।"[২৪]

ইৎসিং-এর বিবরণ অনুযায়ী জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক সেংচি উল্লেখ ও গুরুত্বপূর্ণ। নলিনীনাথ দাশগুপ্ত ভিন্ন প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করেছেন, "...হুয়েন সাংয়ের ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ত্যাগের পর এবং ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে-ই-ৎসিংয়ের ভারতে আগমনের পূর্বে যে বহু সংখ্যক চৈনিক পটিক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ৫৬জনের উল্লেখ ই-ৎসিং করিয়া গিয়াছেন, এবং সেঙ্গ-চি নামে জনৈক শ্রমণ এই ৫৬ জনের অন্যতম। সমতটে আসিয়া সেঙ্গ-চি তথাকার যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহা সেখানকার তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে সেখানে এক ব্রহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আসিয়া সেঙ্গ-চি সেখানে এক বৌদ্ধকে রাজত্ব করিতে দেখে।...চীনাভাষা হইতে রাজার নাম উদ্ধার করা হইয়াছে 'রাজভট'। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রাজভট ...খড়্গবংশীয় তৃতীয় রাজা দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট্টের সহিত অভিন্ন। এই মত স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে, সমতটে রাজবংশের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এবং সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পাদের মধ্যে চারি পুরুষ রাজা পর পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে একা দেবখড়্গই অন্ততঃ তের বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।"[২৫] তাদের বংশগণ সমতল ত্রিপুরায় ক্ষমতা লাভ করেছিল।

কুমিল্লার লোকনাথের তাম্রশাসনেও এই শতাব্দীর কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

তাম্রশাসন দুইটির (কেশবদেবের তাম্রশাসন) অক্ষর দৃষ্টে অনুমান হয় যে, উক্ত রাজাগণ ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। কিন্তু কেহ কেহ অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর বলিয়াই মনে করেন।...যে স্থানে তাম্রশাসন দুইটি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তথাকার রাজা গৌরগোবিন্দ শাহজালাল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই ঘটনার তারিখ ১২৫৭ অব্দ। কেশবদেবের এক উপাধি ছিল রিপুরাজ গোপী গোবিন্দ। কেহ কেহ মনে করেন, এই রাজাই জনপ্রবাদের গৌরগোবিন্দ।"[২৮]

রাজমালার মতে এই সময় ছেংথুমফা গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করে কুমিল্লার কিয়দংশ (মেহের বা মেহেরকুল) জয় করে এবং এইভাবে পার্বত্য অঞ্চলের শাসকেরা তাদের ক্ষমতা সমতল পর্যন্ত প্রসারিত করেন। এবং "মহারাজ ছেংথুমফার শাসন কালে কিম্বা তাহার অল্পকাল পরে চট্টলাচলে ত্রিপুর রাজপতাকা উড্ডীন হইয়াছিল।"[২৯]

মহারাজ ছেংথুমফার পর তাঁর পুত্র আচঙ্গফা সিংহাসন লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খিচোঙ্গফা সিংহাসনে আরোহন করেন।

খিচোঙ্গফার পরবর্ত্তী সময়ের প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশেষ এই সময়কাল থেকে নানা মুদ্রা ও তাম্রশাসনের দ্বারা পরবর্ত্তী রাজাদের সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এঁরা বিশেষভাবে মাণিক্য উপাধিধারী হিসাবে পরিচিত। । নীচে বর্ত্তমানে প্রাপ্ত মুদ্রা লেখমালা ও ত্রিপুরার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যাবলীর ভিত্তিতে তৈরী মাণিক্য রাজ্যতালিকা তুলে ধরা হলো—

	নাম	শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ
১।	ধর্মমাণিক্য ওরফে ডাংগরফা	১৩৮০ i	১৪৫৮
২।	রত্নমাণিক্য	১৩৮৬-৮৯ c	১৪৬৫-৬৭
৩।	বিজয়মাণিক্য ১	১৪১০ i	১৪৮৮
৪।	মুকুটমাণিক্য	১৪১১ c	১৪৮৯
৫।	প্রতাপমাণিক্য	১৪১২ c	১৪৯০
৬।	ধন্যমাণিক্য	১৪১২-১৪৪২ ic	১৪৯০-১৫২০
৭।	দেবমাণিক্য	১৪৪২-১৪৫২ c	১৫২০-১৫৩০
৮।	ইন্দ্রমাণিক্য	—	—

নাম		শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ
৯।	বিজয়মাণিক্য ২	১৪৫৪-১৪৮৫ i c	১৫৩২-১৫৬৩
১০।	অনন্তমাণিক্য	১৪৮৭ c	১৫৬৫
১১।	উদয়মাণিক্য	১৪৮৯ c	১৫৬৭
১২।	জয়মাণিক্য	১৪৯৫ c	১৫৭৩
১৩।	অমরমাণিক্য	১৪৯৯-১৫০৮ c	১৫৭৭-১৫৮৬
১৪।	রাজধরমাণিক্য	১৫০৮-১৫২৯ c	১৫৮৬-১৫৯৯
১৫।	ঈশ্বরমাণিক্য	১৫২২c	১৬০০
১৬।	যশমাণিক্য	১৫২২ c	১৬০০
১৭।	কল্যাণমাণিক্য	১৫৪৮-৭৮ ic	১৬২৬-১৬৫৬
১৮।	গোবিন্দমাণিক্য	১৫৭৮-৮২	১৬৫৬-১৬৬০
১৯।	ছত্রমাণিক্য	১৫৮২-৮৮ c	১৬৬১-১৬৬৬
২০।	রামমাণিক্য	১৫৯৫-১৬০৭ i c	১৬৭৫-১৬১৪
২১।	রত্নমাণিক্য ২	১৬০৭-৩৪ ic	১৬৮৫-১৭১২
২২।	মহেন্দ্রমাণিক্য	১৬৩৪ c	১৭১২
২৩।	ধর্মমাণিক্য	১৬৩৬ c	১৭১৪
২৪।	মুকুন্দমাণিক্য	১৬৫১-৬১	১৭২৯-১৭৩৯
২৫।	ইন্দ্রমাণিক্য	১৬৬৬-৬৮ic	১৭৪৪-১৭৪৬
২৬।	জয়মাণিক্য	—	—
২৭।	বিজয়মাণিক্য	—	—
২৮।	কৃষ্ণমাণিক্য	১৬৮২-১৭০৫ ic	১৭৬০-১৭৮৩
২৯।	জাহ্নবী দেবী	—	১৭৮৩-৮৫
৩০।	রাজধরমাণিক্য	—	১৭৮৫-১৮০৪
৩১।	দুর্গামাণিক্য	—	১৮০৯-১৮১৩
৩২।	রামগংগামাণিক্য	—	১৮১৩-১৮২৬
৩৩।	কাশীচন্দ্রমাণিক্য	—	১৮২৬-১৮২৯
৩৪।	কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য	—	১৮২৯-১৮৪৯
৩৫।	ঈশানচন্দ্রমাণিক্য	—	১৮৪৯-১৮৬২
৩৬।	বীরচন্দ্রমাণিক্য	—	১৮৬২-৯৬
৩৭।	রাধাকিশোরমাণিক্য	—	১৮৯৬-১৯০৯

নাম	শকাব্দ	খৃষ্টাব্দ
৩৮। বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য	—	১৯০৯-২৩
৩৯। বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য	—	১৯২৩-৪৭

c = coins (মুদ্রা) i = inscriptions (লেখমালা)[৩০]

১৩৮৬ শকে প্রাপ্ত রত্নমাণিক্যের মুদ্রাই প্রাচীন মুদ্রা। রত্নমাণিক্য ডাঙ্গর ফা-র পুত্র। ডাঙ্গরফার সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ডাঙ্গর ফার ১৮ জন পুত্র। তাঁদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ হলো রত্নফা। এ সম্পর্কে রাজমালায় উল্লেখ আছে, ডাঙ্গরফা "...পুত্রগণের বুদ্ধির পরীক্ষা দ্বারা ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারত্ব স্থিরকরণ মানসে যুদ্ধের কক্কুট সকল নিরাহারে আবদ্ধ রাখিতে ভৃত্যদিগকে অনুমতি করেন, পরে যখন স্বয়ং পুত্রগণের সহিত একত্রে আহার করিতে বসিলেন, তখন একজন অনুচরকে ঐ সকল কুক্কুট আহার স্থলে আনিয়া ছাড়িয়া দিতে গোপনে আদেশ করিলেন। তদ্অনুসারে যখন ৩০ টি কুক্কুট ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা সমস্ত দিন নিরাহারের পর ভোজ্য দর্শনে রাজকীয় পাতের দিকে ধাবিত হইল; মহারাজ কুক্কুট সকল যাহাতে পাত্র স্পর্শ করিতে না পারে, তদুপায় বিধান জন্য কুমারগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু কুমারেরা সমস্ত কুক্কুট একেবারে নিবারণের বিষয় চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তাঁহারা ইতিকর্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তৎকালে সর্বকনিষ্ঠ কুমার রত্নফা সহসা পাত্র হইতে কতকগুলি অন্ন লইয়া কুক্কুটগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। নৃপতি তাঁহার আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রগণ নিতান্ত দুঃখিত ও ঈর্ষাপরবশ হইয়া নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, এবং মহারাজ ডাঙ্গরফা পরলোক গমন করিলে সমস্ত কুমারেরা একত্রিত হইয়া রত্নফাকে বহিষ্কৃত করিয়া সর্বজ্যেষ্ঠ কুমার রাজাফাকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।"[৩১]

পরবর্তী সময়ে রত্নফা গৌড়েশ্বরের সাহায্যে রাজাফাকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্য অধিকার করেন। এবং নানা উপঢৌকন দানে গৌড়েশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন ও গৌড়েশ্বর ত্রিপুরার মহারাজাকে মাণিক্য উপাধি দেন। তাঁর সময় থেকেই ত্রিপুরার রাজাগণ 'মাণিক্য' উপাধি ব্যবহার করেন।

মহারাজা ধর্মমাণিক্যের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর আমলেই 'রাজমালা'

রচনা আরম্ভ হয়। তাঁর আমলেই কোন মুদ্রা বা লেখমালা এখন পাওয়া যায় না। তাঁর শাসন কাল নিয়ে নানা মত আছে।

"Dharma Manikya, the son of Maha Manikya was a powerful ruler and his reign constitute an important land mark in the History of Tripura. Although we find no coins of Dharma Manikya, the Rajmala mentions a copper plate of Dharma Manikya dated 1458 A D. This copper plate is not available now. According to the 'Tripura Vamsavali' Dharmamanikya ruled from 1431 A. D. to 1462 A. D."[৩২] তিনিই বাংলা ভাষাকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন।

ত্রিপুরার ইতিহাসে ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকাল গৌরবময় যুগ হিসাবে চিহ্নিত। গৌড়ের অধিপতি হোসেন শাহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সাক্ষ্য-স্মৃতি আজও ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার কামানচৌমুহানীতে রক্ষিত কামান বহন করে চলেছে। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরগণ গৌড় সৈন্যকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ বিজয়মাণিক্য শ্রীহট্টের কিয়দংশ জয় করেছিলেন।

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য লাভ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' ও 'বিসর্জন' তাঁর কাহিনী নিয়েই রচিত। এই কাহিনীস্থান দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর। এখানে গোমতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছে সপ্তদশ শতাব্দীর এক করুণ ইতিহাস। গোবিন্দমাণিক্য ও নক্ষত্ররায়ের মধ্যে মর্মান্তিক ভ্রাতৃবিরোধ ও পরিশেষে মিলন এবং মানবপ্রেম ও প্রচলিত সংস্কারের দ্বন্দ্ব একদা অরণ্য-ত্রিপুরার নির্মল বায়ুকে বেদনা ঘন করে তুলেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের সময়ে। তাঁর রাজ্যলাভ ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। "তিনি একাধারে কাব্যরসিক, কবি শিল্পী ও অসাধারণ সংগীতজ্ঞ। এহেন বীরচন্দ্রকে ঘিরিয়া তখন বাংলা তথা ভারতের বহু গুণীজ্ঞানী রাজনীতি বিশারদ। তাদের প্রত্যেকের বিশিষ্টতায় ত্রিপুরা দরবার সমুজ্জ্বল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আওতা হইতে বহুদূরে বনানীকীর্ণ ত্রিপুরায় কি যে সাধনা করিয়া বীরচন্দ্র ইহাদের আকর্ষণ করিয়াছিলেন—চিন্তা করিলে অবাক হইতে

হয়। একদিকে প্রখ্যাতনামা ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বৈষ্ণবসাহিত্য রসিক ও পাশ্চাত্য দর্শনবিদ রাধারমণ ঘোষ, সুররসিক স্বভাব-কবি মদনমিত্র প্রভৃতি, অপরদিকে বীণাবাদক নিসারহোসেন, রবাব-বাদক কাশেম আলী খাঁ, সুরসিঙ্গা ও এসরাজ-বাদক হায়দার খাঁ, সেতার বাদক নবীনচন্দ্র গোস্বামী, বেহালাবাদক হরিদাস, পাখোয়াজবাদক পঞ্চানন্দ মিত্র, কেশবমিত্র ও রামকুমার বসাক, নাট্যাচার্য কুলন্দর বকস্ এবং গায়ক যদুনাথ ভট্ট, ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তির সমাবেশে বীরচন্দ্রের দরবার দেশের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিল। উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে ডাক্তার শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'Travels in Bengal: Calcutta to independent Tripura : (1887)" গ্রন্থে বীরচন্দ্রের বসিবার ঘরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহাই মহারাজের গুণগরিমা অনুধাবন করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

'প্রেমমরীচিকা', 'অকালকুসুম', 'উচ্ছ্বাস' ও 'সোহাগ' কাব্যে বীরচন্দ্রের প্রেমিক মনকে যেমন ধরা যায়—তেমনি সাধক মনকে সমহিত দেখতে পাই। 'ঝুলন' ও 'হোরি' গীতিকাব্য দুখানিতে ও অজস্র মনোহর রাগিনীতে রচিত পদাবলী সঙ্গীত লহরীতে।"[৩৩] মহারাজা উর্দু ভাষা ও সংগীত শাস্ত্রেও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্রের পুত্র মহারাজ রাধা-কিশোরমাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর যোগাযোগ ছিল। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। তাঁর রাজ্যলাভের কিছুপরেই ভূমিকম্পে বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। তিনি ধৈর্য্য ও অসাধারণ ক্ষমতাবলে ত্রিপুরায় অশেষ উন্নতি সাধন করেন। এই সময়েই বিভিন্ন সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের দেয়া নিম্নে উল্লিখিত চিঠিখানা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই চিঠির মধ্য থেকে আমরা তাঁদের ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করতে পারি।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন——

কিছুদিন হইতে আমার মনের মধ্যে একটি গ্লানি জন্মিয়াছে তাহাই দূর করিবার জন্য মহারাজকে অদ্য এই পত্র লিখিতেছি।

মহারাজের পত্রের মধ্যে...চিঠি ও টেলিগ্রাম পাইবার পর হইতেই আমার মনের মধ্যে একটি বেদনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা কিছুতেই দূর হইতেছে না।

ত্রিপুরা-রাজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে আমি অনেকদিন হইতেই আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়া থাকি একথা নিশ্চয় জানিবেন। এই উপলক্ষ্যে জনশ্রুতি ও অন্যান্য কারণে মাঝে মাঝে...প্রতি আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে। একবার দার্জিলিঙে এই সন্দেহের কথা...স্পষ্টই জানাইয়াছি।

কিন্তু এই সকল সন্দেহ দৃঢ়ভাবে মনে স্থান পায় নাই। তাহার কারণ ত্রিপুর-রাজ্য সংক্রান্ত প্রকৃত ঘটনা সকল নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা জানি না... সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ ধারণা মনে স্থান দিবার অধিকার আমার নাই—বিশেষত তাহার সহিত আমি যখন কোন কাজে লিপ্ত নহি তখন তাহার বিচার ভারও আমার উপর নাই।

আর এক কারণ,...সঙ্গে যখন রাজ্য সংক্রান্ত আলোচনা করি তখন তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রত্যেক বারেই আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি...বুদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত এবং তীক্ষ্ণ, তাহার ধারণা শক্তি প্রবল, এবং ত্রিপুররাজ্যের হিতসম্বন্ধে তাহার যে উৎসাহ নাই তাহাও নহে।

কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার দুর্ব্বলতাও আছে। সে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ একেবারে ভুলিতে পারে নাই এই আমার বিশ্বাস। এই দুর্ব্বলতা না থাকিলে সে সবলে ত্রিপুরার উন্নতি সাধন করিতে পারিত।

ত্রিপুরার উন্নতি সম্বন্ধে আমি যখন...সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি... উন্নতির পক্ষে নানা অনিবার্য্য ব্যাঘাতের কথা উত্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিয়াছে। সে উন্নতির একটা বাধা তাহার নিজের দুর্ব্বলতা একথা সে নিজেকে জানিতে দিয়াছে কিনা জানি না। বস্তুতঃ যেরূপ বুদ্ধি এবং ইচ্ছা আছে সেরূপ যদি তাহার নির্লোভ নিঃস্বার্থ স্বভাব এবং চরিত্রের দৃঢ়তা থাকিত তাহা হইলে ত্রিপুরার পক্ষে মঙ্গল হইত।

মহারাজের সহিত আমার যে একটা আন্তরিক সম্বন্ধ বিধিবশে স্থাপিত হইয়াছে তাহা উত্তরোত্তর প্রবলতরভাবে মনের মধ্যে অনুভব করি। এই সম্বন্ধের অনুসারী কর্ত্তব্যও নিশ্চয় আছে। এই কর্ত্তব্য পালন না করিলে অধর্ম্ম হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। যে কারণেই হউক এইবার স্থির করিয়াছিলাম যে ত্রিপুরার হিত সাধনের জন্য সমস্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আমাকে নিযুক্ত হইতে হইবে।

অথচ এখন আমার ঠিক ধর্ম্মের সময় নহে। এখন সংসারের সমস্ত জাল গুটাইয়া লইবার জন্য মন প্রায়ই ব্যাকুল হয়। ঠিক এই সময়ে বিবিধ চক্রান্ত সঙ্কুল জটিল রাজসভার ব্যাপার ঈশ্বর যে কেন আমাকে ক্ষণকালের জন্যও আকর্ষণ করিলেন তাহা তিনিই জানেন। এই কর্ম্মের পথ যেমন দুর্গম তেমনি কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে পা ফেলিবামাত্র চক্রান্ত কাহাকে বলে তাহার স্বাদ আমাকেও পাইতে হইল।

প্রথমত ঘোরতর সংশয়ের মধ্যে আমাকে দিশাহারা হইয়া দাঁড়াইতে হইল। মহারাজ যে কোনদিক হইতে কি সংকটে পড়িয়াছেন তাহা স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু স্পষ্টরূপে সমস্ত ব্যাপার বুঝিবার সময় ও সুযোগ আমার হাতে ছিল না—কারণ, আমি মহারাজের কর্ম্মচক্রের বাহিরে আছি—কেবল ক্ষণকালের সংশ্রবে যেটুকু আভাস পাওয়া যায় তাহার উপরে নিশ্চয় নির্ভর করা যায় না। অথচ যে যে স্থানে বিপদের আশঙ্কামাত্রও অনুমান করা যায় তাহা মহারাজের কাছে গোপন করা আমি উচিত বোধ করি নাই। ভিতরকার অবস্থা মহারাজ আমার অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন—বিচার বিবেচনা মহারাজ ঠিকমত করিবেন এই…করিয়া আমার সম্মুখে যাহা কিছু উপস্থিত হইয়াছে তাহা মহারাজের সম্মুখে নিবেদন করিয়াছি। বস্তুত কোনটা গোপনীয় কোন্‌টা প্রকাশ্য কোন্‌ জিনিস প্রয়োজনীয় কোন্‌টা তুচ্ছ, তাহার তাৎপর্য্য কি তাহা আমার সম্পূর্ণ বিচার করিবার সাধ্য ছিল না। এই অক্ষমতাবশতই মহারাজের সম্মুখে সমস্তই উপনীত করিয়াছি।

কিন্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত কাজ আমাকে অন্যায়-পূর্ব্বক করিতে হইয়াছে তাহার গ্লানি আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

…র ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে আমার বারম্বার সন্দেহ জন্মিলেও তাহাকে বন্ধু হিসাবে আমি পরিত্যাগ করি নাই। সুতরাং তাহার সহিত আমার বিশ্বাসের সম্বন্ধ আছে। গোপনে এই বিশ্বাসকে ভঙ্গ করা আমার পক্ষে নিরতিশয় গর্হিত কার্য্য হইয়াছে—সেজন্য আমি অন্তর্য্যামীর নিকটে দণ্ডভোগ করিতেছি। অতএব মহারাজ দয়া করিয়া আমার এই পত্রখানি…দেখাইবেন। আমি যদি অবসর পাইতাম তবে…সম্মুখেই কোনো না কোনোদিন আমি আমার মনের সমস্ত খেদ ও সংশয় স্পষ্ট করিয়া জানাইতাম কিন্তু সেরূপ অবকাশ আমি পাই নাই। আমার যা বক্তব্য তাহা আমি আজ পরিষ্কার করিয়া বলি।

আমি স্যাণ্ড্‌স্ সাহেবকে তিলমাত্র বিশ্বাস করি না। আমি নানাস্থান হইতেই শুনিয়াছি যে স্যাণ্ড্‌স্ নানা কৌশলে মহারাজের অর্থ শোষণ করে।

যখন হইতে দেখিয়াছি…স্যাণ্ড্‌স্ সাহেবের সহিত নিজকে জড়িত করিয়া রাখে তখন আমি বুঝিয়াছি…দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে মহারাজের রাজ্যেরহিত সাধন হইবে না।

মহারাজের দশলক্ষ টাকার ঋণ একযোগে পরিশোধ করার অত্যাবশ্যকতা যখন আমি বুঝিতে পারি নাই অথচ যখন এই বিষয়ে…স্যাণ্ড্‌স্ প্রভৃতি আগ্রহ দেখা গেল তখন স্বভাবতই আমার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল একথা…নিকট গোপন করা আমার পক্ষে অন্যায়।

…নিজেকে এইরূপে ভুলাইতে পারে সে, যখন ঋণশোধ করিতেই হইবে তখন রাজ্যের হিতের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুবিধা সাধন করিতে দোষ কি?

কিন্তু এই উপলক্ষে মহারাজকে পরের অধীন করিবার চেষ্টা আমার ভাল লাগে নাই।

সে সম্বন্ধেও…নিজেকে এরূপ হয়ত ভুলাইয়া থাকিবে যে, কিছুদিন দায়ে পড়িয়া এই রূপে কর্তৃপক্ষের জবাবদিহির অধীনে থাকিলে তাহাতে মহারাজের ও রাজ্যের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি এই পলিসির পক্ষপাতী নহি। নিজে যদি সম্পূর্ণ খাঁটি ও সবল হইত এবং ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিত তাহা হইলে এসমস্ত কৌশলের প্রয়োজন হইত না।

ত্রিপুরায় গিয়া আমি ইহা দেখিলাম যে সেখানে দলাদলি খুব প্রবল হইয়াছে—এরূপ অবস্থায় মহারাজের তরফে তাকানো কোনো দলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না—অপর দলকে ব্যর্থ করা ও নিজের দলের জন্য বলসংগ্রহ করা ইহাই প্রত্যেক পক্ষের প্রধান চিন্তনীয় হয়। এমন স্থলে মহারাজের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। আমি অল্পদিনে কোনোমতেই বুঝিতে পারি নাই—কাহারা মহারাজের যথার্থ সুহৃদ। আমার মনে কেবলি এই কথা জাগিয়েছে যে, মহারাজ সংকট জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। এই সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য আমি…প্রতি নির্ভর করিতে সাহস করি নাই—কারণ, আমি নিশ্চয় জানি না…কি ইচ্ছা করিতেছে। ইহা হয়ত ভালই করিতে পারে কিন্তু দুর্বলতাবশত সে নিজেই বা কোন্ চক্রের সহিত কতদূর জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।[৩৪]

পরবর্ত্তী সময়ে মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের পুত্র মহারাজ

কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "...আমি ত্রিপুরা রাজ্যের আর কোন হিত যদি না করে থাকি, কেবলমাত্র যদি ব্রজেন্দ্রকিশোরের চরিত্রকে কর্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাকি, তবে তাঁর দ্বারা ত্রিপুরার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করেছি বলে গৌবর করতে পারবো..."[৩৫]

প্রকৃতপক্ষে 'ভগ্নহৃদয়ের'কবিকে বীরচন্দ্রমাণিক্য 'প্রথম কবিরূপে অভিনন্দিত করতে ইচ্ছা করেন।' এ ঘটনার পর ধীরে ধীরে ত্রিপুরার ইতিহাস কবিকে নানাভাবে আলোড়িত করে। 'রাজর্ষি', 'মুকুট' ও 'বিসর্জন' রচনা করে কবিগুরু ত্রিপুরার ইতিহাসকে অমর করেন। এই সময় থেকেই তিনি ত্রিপুরার ইতিহাস জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত পত্রখানাই মহারাজ বীরচন্দ্রকে লিখিত তাঁর প্রথমপত্র বলে চিহ্নিত।

"মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকিবেন যে, আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি" নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই। এজন্য আপনাদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা বিহিত বিবেচনা করিতেছি। এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করিতে অনুমিত করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিব। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার নির্বাসনদশায় চট্টগ্রামের কোনস্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যদি জানতে পাই, তবে আমার যথেষ্ট সাহায্য হয়। প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের এবং ঐতিহাসিক ত্রিপুরার অন্যান্য স্থানের ফটোগ্রাফ যদি পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার হয়।..."[৩৬]

মহারাজ উত্তর দিলেন ও 'রাজরত্নাকর' নামক ত্রিপুরার অন্যতম সংস্কৃতি ইতিহাস গ্রন্থ থেকে গোবিন্দমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্য সম্পর্কে ইতিহাস লিখে পাঠান। 'রাজর্ষি" ও 'বিসর্জনে' "গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র অংকন সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে এক সার্থক সৃষ্টি।"[৩৭]

প্রসঙ্গতঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে যা লিখেছেন তাও উল্লেখযোগ্য--"আমার প্রথম গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এবং (সম্ভবতঃ) এই শেষ গ্রন্থ 'বৃহৎবঙ্গ' ত্রিপুরেশ দ্বয়ের (মাহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য ও রাধাকিশোর-মাণিক্য) নামের সঙ্গে সংযোজিত করিতে পারিয়া ধন্য হইলাম।"

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন "এই মৃত্যুতে রাজবংশের

সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা হয়নি। কবিবালকের প্রতি তাঁর পিতার যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা, মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল।"[৩৮]

রাধাকিশোরের রাজত্বকাল মাত্র বারবৎসর স্থায়ী ছিল। তিনি সগৌরবে তাঁর দিন অতিবাহিত করেন। রাধাকিশোর একস্থলে এরূপ উল্লেখ করেন যে "তাঁর লোক চিনবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। আমি তা দেখে অবাক হয়ে যেতাম।···রাধাকিশোরমাণিক্যের মতো এত বড় নীরব দাতা পাওয়া বড়ই কঠিন।"[৩৯]

১৩০৬ সন শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে বসন্ত উৎসবে রাধাকিশোরমাণিক্যবাহাদুর কবি সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। "ইহারই স্মৃতি মহারাজ রাধাকিশোরকে 'কাহিনী' কাব্য উৎসর্গ পত্র (২০শে ফাল্গুন ১৩০৬) বহন করে বলিয়া রবীন্দ্র জীবনীকার মনে করেন।"[৪০]

রাধাকিশোরের আমলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে তাঁর সঙ্গে তথা ত্রিপুরার সঙ্গে বঙ্গের জ্ঞানীগুণীদের অভূতপূর্ব মিলন সাধিত হয়েছিল।

১৩৩৭ সালের শীতকালে মহারাজ কোলকাতা গেলে কোলকাতার অভিজাত সমাজ তাঁকে বিপুলভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন।

রাধাকিশোরের পুত্র মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরও পিতার ন্যায় প্রজাবৎসল ছিলেন। "Like his Father Birendrakishore Manikya who an enlighted and benevolent ruler."[৪১]

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে বীরেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বীর বিক্রম কিশোরমাণিক্য রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু তিনি নাবালক হওয়াতে তাঁর পক্ষে রাজ্য পরিচালনার জন্য ত্রিপুরার 'শাসন পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর ছিলেন পরিষদের সদস্য। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের রাজত্বকালেই ১৩৩২ (১৯২৬) সালে কবি শেষবারের মতো ত্রিপুরায় এসেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হলো ১৩৪৮ সালের ২৫শে বৈশাখ। কবি রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ ও অসুস্থ। তাঁর ত্রিপুরায় আগমন সম্ভব নয়। এদিন আগরতলায় উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের খাস দরবার মহলে "রবীন্দ্র জয়ন্তী বিশেষ দরবার" অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান থেকে মহারাজ বীর বিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুর কবিকে 'ভারতভাষ্কর' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। এই উপাধির দ্বারা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গ বিশ্বের সকল

অংশের বিদ্বৎ সমাজের প্রশংসা কুড়ালেন। এই দিনটি ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল দিন। ত্রিপুরায় মহারাজাদের এই প্রীতি ও সৌজন্যের বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে স্থান করে দেন—তাঁর 'বিসর্জন' ও 'রাজর্ষির' মধ্য দিয়ে। এর স্থান কাল পাত্র ত্রিপুরার অন্যতম মহকুমা (দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত) উদয়পুরকে কেন্দ্র করে।

উদয়পুর বহুদিন ধরে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। কোন রাজার আমলে উদয়পুর ত্রিপুরার রাজধানী হলো—সে সম্পর্কে ইতিহাসের বক্তব্য সুস্পষ্ট নয় তবে কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে সমশের গাজীর আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে রাজধানী উদয়পুর থেকে বর্ত্তমান পুরানো আগরতলায় স্থানান্তরিত হয়। বহুদিন রাজধানী থাকার ফলে উদয়পুর ত্রিপুরার পুরাকীর্ত্তির আলোচনায় মুখ্য স্থান অধিকার করে।

উদয়পুরের পূর্বনাম ছিল রাঙামাটি। (সম্ভবতঃ রক্তমৃত্তিকায়>রাঙামাটি) পরবর্ত্তী সময়ে মহারাজ উদয়মাণিক্যের নামঅনুসারে এই নাম হয়। বহুকাল পরে পরিত্যক্ত রাজধানী জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গেলে মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য একে সংস্কার করেন বলে উদয়পুরের শহর এলাকা রাধা কিশোরপুর নামে পরিচিত হয়। ত্রিপুরার অন্যতম প্রাচীন রাজধানীর গৌরব ধর্মনগর মহকুমা (উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত) ও বহন করছে। ধর্মনগর অতি প্রাচীন স্থান। রাজমালায় উল্লেখ আছে—

"রাজা ফা নামেতে পুত্র রাজার প্রধান।
রাজা করিল তাকে রাজনগর স্থান ।।

*　　*　　*

আর পুত্র ধর্মনগরেতে রাজা বৈল।"

রাজা ধর্মমাণিক্যের কীর্তি রাজমালায় উল্লেখ আছে। কিন্তু ধর্মমাণিক্য একাধিক থাকায় কোন রাজার আমলে ধর্মনগর স্থাপিত —তা নিরূপণ করা কঠিন।

ধর্মনগরের প্রাচীনত্ব ও কীর্তিকলাপ সম্পর্কে গবেষক ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্তের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। "১৩১৮ ত্রিং সনে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত টেংরা মৌজা নিবাসী বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট জানা গিয়াছিল যে, পঞ্চখণ্ড নামক পরগণা ত্রৈপুর নরপতি ব্রাহ্মণগণকে দান করার পুরাতন দলিল শ্রীহট্টে আছে। কিন্তু অনুসন্ধানে তাহা পাওয়া

যায় নাই। বর্ণিত ব্রাহ্মণগণের এক জনের নাম শ্রীপতি ও অপরের নাম নিধি পতি ছিল বলিয়াও তিনি জানাইয়াছিলেন। টেংরা মৌজায় এখনও বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান আছে। ত্রিপুরেশ আদি ধর্ম ফা এক বিশেষ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত একটি স্থানে ষোড়শ হস্ত পরিমিত ইস্টক নির্মিত একটি যজ্ঞকুণ্ডকে সেই হোমের স্থান বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই সময় ব্রাহ্মণদিগকে ঊনকোটি পর্বতের সমীপবর্ত্তী কতকভূমি তাম্রশাসনদ্বারা দান করার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন।...বর্ত্তমান ধর্মনগর বিভাগে 'রাজ বাড়ী' নামে একটি পুরাতন মৌজা আছে। এই মৌজায় এবং বিভাগের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি পুরাতন বসতি, ইষ্টকালয় ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নূতন অধিবাসীদিগের নিকট পুরাতন স্থানগুলির পরিচয় পাওয়া যায় না। উদয়পুর বিভাগের ন্যায় বর্ত্তমান ধর্মনগর বিভাগের কোন স্থানে প্রাচীন অধিবাসীদের বংশধরগণের অস্তিত্ব দেখা যায় না।"[৪২]

মহকুমা হিসাবে ধর্মনগর কৈলাসহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে আলাদা মহকুমা হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এছাড়া প্রাচীন রাজধানী হিসাবে অমরপুর (দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা), কসবার (পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা) নাম ও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া 'রাজমালা'য় (কালীপ্রসন্ন সেনসম্পাদিত) উল্লিখিত ডাঙ্গরফার সপ্তদশ পুত্রকে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রাজ্য বণ্টনের যে ব্যবস্থা করেন—সে হিসাবেও একটা বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন—

"নিজ রাজ্য ভ্রমি রাজা সকল দেখিল।
সপ্তদশ পুত্রে রাজ্য ভাগ করি দিল॥
রাজা ফা নামেতে পুত্র রাজার প্রধান।
রাজা করিল তাকে রাজনগর স্থান॥
কাইচরঙ্গ রাজ্যে রাজা করে আর পুত্র।
আর পুত্র রাজা হৈল আচরঙ্গ যত্র॥
আর পুত্র ধর্মনগরেতে রাজা ছিল।
আর সুত তারক স্থানেতে রাজা হৈল॥
বিশাল গড়েতে রাজা হৈল একজন।
খুড়িমুড়া ছিল এক নৃপতি নন্দন॥

নাসিকা দেখিয়া খর্ব্ব আর যে কোঙর ।
নাকিবাড়ী তাকে দিল ত্রিপুর ঈশ্বর ।।
আগর ফা পুত্রে রাজা আগরতলা দিল ।
মধুগ্রামে আর সুত ভূপতি হইল ।
থানাংচি স্থানেতে রাজা হৈল একজন ।।
না মানিল লোকে তাকে অন্যায় কারণ ।।
লোমাই নামেতে পুত্র বড় শিষ্ট ছিল ।...
আচোঙ্গ ফা নামেতে যে আর পুত্র ছিল ।।
বরাক নদী সীমা করি—তাকে রাজা কৈল ।
তৈলারুঙ্গ স্থলে রাজা হৈল আর একজন ।।
আর এক পুত্র দিল মণিপুর স্থানে ।
সতের পুত্রের রাজ্য দিলেক প্রমাণে ।।[৪৩]

মহারাজ বীরবিক্রমের মৃত্যুর (১৯৪৭) পর দুই বৎসর কাল ত্রিপুরা রাজন্য-শাসিত রাজ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। তারপর গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত হয় ।

ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

দক্ষিণ ত্রিপুরার পিলাক প্রাচীন সভ্যতার একটি উদাহরণস্থল। বিলনীয়া শহর থেকে ৫০ কি.মি এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে ১১০ কি.মি. দূরে পিলাক অবস্থিত। এর প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে গবেষণার উল্লেখযোগ্য সুযোগ রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "সেদিন একজন প্রসিদ্ধ আইকোনগ্রাফিস্ট এক সভায় বলিয়াছেন যে, মূর্ত্তিবিদ্যা শিখিবার একমাত্র জায়গা বাংলা। বাস্তবিক হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্ত্তিই যে ছিল, আর কত মূর্ত্তিই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি' অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদেও অনেক মূর্ত্তি সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে জঙ্গলে পুরানো গ্রামে, পুরানো নগরে—এখনও গাড়ি গাড়ি মূর্ত্তি পাওয়া যাইতে পাবে। যে ভাবে ভাবুকের মন মুগ্ধ করে সেভাব কেবল বাংলাতেই ছিল, কতক কতক এখনও আছে। অনেক সময় মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় যে, উহা কথা কহিতেছে। অনেক সময় মনে হয়, যেন উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল।...শিল্পের উন্নতি অল্প সাধনার ফল নয়।

বাঙালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে।[৪৪] তার এই উক্তি শুধু বাংলাদেশ সম্পর্কে নয়, ত্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কেও সত্য। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য স্থান পিলাক, ঊনকোটি পাহাড়, উদয়পুর, অমরপুর।

পিলাক দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলনীয়া মহকুমায় অবস্থিত। এই অঞ্চল দু'ভাগে বিভক্ত—পূর্ব পিলাক ও পশ্চিম পিলাক। পশ্চিম পিলাক 'সাগরডেপা' নামেও পরিচিত। একদা এই অঞ্চলে বিশাল জলাভূমি ছিল। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বেও এখানে জলাভূমি ছিল প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মন লিখেছেন—"পিলাক পাথর নামক এই জনপদ দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব দিকের অংশ পূর্ব পিলাক, এবং অপরাংশ পশ্চিম পিলাক নামে জনসাধারণ-কর্ত্তৃক অভিহিত হয়। ঐ দুই স্থান ব্যাপী যে এক সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে, তন্মধ্যবর্ত্তী পূর্বপিলাকের পশ্চিম প্রান্ত-দেশস্থ 'দেবদারু' বা 'দেবারু' নামে খ্যাত এক অরণ্যাকীর্ণ বিশাল মৃন্ময় স্তূপোপরি একটা অষ্টভুজা শক্তি দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আজানু ভূমিতে প্রোথিত আছে। ইহার আয়তন জানু হইতে মস্তক পর্যন্ত প্রায় দুই হাত হইবে।

উক্ত জলাভূমির অন্তর্ব্বর্ত্তী 'ঠাকরাণী বাড়ী' নামে খ্যাত পশ্চিম পিলাকের এক মৃত্তিকা স্তূপের পৃষ্ঠদেশস্থ অরণ্য মধ্যে, একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত চতুর্ভুজ ভগ্ন নৃসিংহ মূর্ত্তি উত্তানভাবে ভূলণ্ঠিত আছে।" (ত্রিপুরার স্মৃতিঃ পৃঃ ৭১)

এই আলোচনায় পিলাকে বিস্তীর্ণ জলাশয়ের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এই জলাশয় শস্যশ্যামল মাঠে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলতঃ বাঙালী। কিন্তু বাঙালী অধ্যুষিত পিলাকের ইতিহাস ইদানীংকালের ইতিহাস। একদা এ অঞ্চল আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল।

এই অঞ্চলে প্রাপ্ত অধিকাংশ মূর্ত্তিরই এখন আর পূজা হয় না। কিন্তু পূজা হোক বা না হোক সকল মূর্ত্তির প্রতিই এ অঞ্চলের লোকের টান লক্ষ্য করেছি।

বাংলাদেশের মতো ত্রিপুরার দেবদেবীরও বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য যে কত তা' আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। বৌদ্ধমহাযান, বজ্রযান ও তন্ত্রযানের প্রভাবে কত নূতন নূতন বুদ্ধমূর্ত্তি ও নূতন নূতন দেবদেবীর যে আবির্ভাব হয়েছিল—তার ঠিক নেই। প্রসঙ্গতঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। "মহাযান হইতে যতই নূতন নূতন ধর্ম বাহির হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও

যতই তন্ত্রের মত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন বুদ্ধ, নূতন নূতন বোধিসত্ত্ব পূজা আরম্ভ হইল। এক এক দেবতারাই নানা মূর্ত্তি হইতে লাগিল। কখনও ক্রোধ মূর্ত্তি কখনও শান্তমূর্ত্তি, কখনও করুণামূর্ত্তি—নানারূপ মুদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে সকল মূর্ত্তির সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য। বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় ২৫৬ রূপ মূর্ত্তির সাধনের কথা বলা আছে। নেপালের চিত্রকর জাতির লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্ত্তি আঁকিতে পারে।"[৪৫] পিলাকে প্রাপ্ত বিচিত্র দেবদেবীর প্রসঙ্গে এই উক্তিই স্মরণ হয়। কিন্তু সারা ত্রিপুরায় এই প্রভাব সমান ছিল না। তবে "একদা…প্রবল পরাক্রান্ত যোগীজাতি বঙ্গদেশে ও পূর্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইহারা রাজাদের গুরু। সন্ন্যাসী হইলেও ধর্মযুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পদ্যাদি রচনা করিতেন। রংপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও লক্ষাধিক যোগীর বাস থাকিলেও তাহাদের পূর্বগৌরব অক্ষুন্ন নহে। এক্ষণে এই সকল যোগীর উপাস্য দেবতা ধর্মঠাকুর…যোগীদের স্বজাতীয় পুরোহিত ধর্মপূজা করেন। ধর্মঠাকুরের নামান্তর নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্মল।…পালরাজাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে এই ধর্মপূজার প্রচলন হয়। রামাইপণ্ডিত জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। (বল্লাল চরিত্রে যোগীগণের পুরোহিত-দিগকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে) কিন্তু রামাই জাতি জাতিবর্ণ বিরোধী ধর্মপূজায় রত ছিলেন বলিয়া সমাজচ্যুত হন। রামাই সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর লোক।"[৪৬] প্রসঙ্গতঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্য, "আমাদের দেশে এখন যে সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধি নাথ। তাঁহারা বলেন, "আমরা এদেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা আমাদের গুরুগিরি কাড়িয়া লইয়াছে।" তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টায় আছেন। নাথেদের আচার ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয়। এই জাতি কোথা হইতে আসিল, অনেক বৎসর ধরিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের পুরাণ-পর্যায়ে ষোড়শ খণ্ডে হজ্সন সাহেবের মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমার প্রথম ধারণা হয় যে, নাথ পন্থ নামে এক প্রবল ধর্মসম্প্রদায় বহু শত বৎসর ধরিয়া বাংলায় এবং পূর্বভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে। পূর্বে সকলেরই ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের 'হঠযোগ প্রদীপিকা'য় যে চৌদ্দজন নাথের নাম

করা আছে, তাঁহারাই সকলেই কবীরের সময়ের লোক। কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের কথাবার্তা লইয়া কবীরপন্থীদিগের একখানি বই আছে, সুতরাং গোরক্ষনাথ ও কবীর এক কালের লোক। কিন্তু বাসিলীফ তিব্বতীয় গ্রন্থমালা হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন যে গোরক্ষনাথ খৃষ্টের আটশ বছর পরের লোক। নেপালে বৌদ্ধদিগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়িয়া শৈব হন। বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল রমনবজ্র কি অনঙ্গবজ্র। ক্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে 'কৌলজ্ঞান বিনিশ্চয়' নামে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মচ্ছগ্ন পাদের 'অবতারিত' একখানি তন্ত্র পাইলাম। উহা যে অক্ষরে লেখা, সে অক্ষর খ্রীষ্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের নাম গন্ধও নাই। একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে মীননাথের একটি বাংলা পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মত। আরও অনেক কারণ আছে, যাহাতে বেশ মনে হয় যে নাথেরা না-হিন্দু না-বৌদ্ধ এমন একটি ধর্মমত প্রচার করেন।...ক্রমে নাথপন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা ও হিন্দুরা নাথদের উপাসনা করিত। মৎস্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের নামগন্ধ না থাকিলেও তিনিই এখন নেপালে বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতা।"[৪৭] নাথ পন্থের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের নিকট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মূর্ত্তি বিদ্যায় যে বৈচিত্র্য আছে তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পিলাকে প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্মাণকুশলতা দেখলে বুঝা যায়—দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ভাস্কর্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। "...ইতিহাসে বর্ণিত আছে...গোপীচন্দ্রের রাজধানী ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত পটিকানগরে ছিল।"[৪৮] এই পটিকানগরের সঙ্গে পিলাকের সম্পর্ক যদি আবিষ্কৃত হয় তবে নাপন্থীদের এই এলাকায় বিশেষ প্রভাব সম্পর্কে আগে নানা তথ্য প্রকাশিত হবে।

এই অঞ্চল সম্পর্কে 'রাজমালা'য় (কালীপ্রসন্ন সেন) ভিন্ন ইতিহাসও আছে। ত্রিপুরায় ডাঙ্গরফা নামে এক রাজা ছিলেন। তখন ত্রিপুরার রাজধানী ছিল, রাঙ্গামাটিতে বা উদয়পুরে। ডাঙ্গরফার আঠার পুত্র ছিল। তিনি একদিন পুত্রদের এক উপায়ে বুদ্ধির পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন যে কনিষ্ঠ পুত্র রত্নফাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং ভবিষ্যতে তিনিই রাজা হবেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠই সিংহাসনে বসবেন এরূপ নিয়ম ছিল। এজন্য তিনি কনিষ্ঠকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের জন্য শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের

অধিকারী না করে রত্নফা ব্যতীত অন্য সকলের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিলেন—

> "নিজ রাজ্য ভ্রমি রাজা সকল দেখিল।
> সপ্তদশ পুত্রে র‍্যাজ্য ভাগ করি দিল।...
> লোমাই নামেতে পুত্র বড় শিষ্ট ছিল।
> মুহুরী নদীর তীরে নৃপতি করিল।
> লাউ গঙ্গা মুহুরী গঙ্গা তথায় নদী বসে।
> আর ভ্রাতৃ সঙ্গে রাজা বসে সেই দেশে।"[৪৯]

পিলাকের নাম এ স্থলে না থাকলেও মুহুরী নদী তীরবর্ত্তী রাজ্য হিসাবে পিলাক এবং তার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল এর অন্তর্গত হতে পারে—পিলাক হয়তো রাজধানী ছিল।

লোমাই ভ্রাতৃদ্বয় এখানে কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস থেকে কিছু জানা যায় না। ইতিমধ্যে ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেন রত্নফা। সব ভাইকে বন্দী করে রত্নমাণিক্য উপাধি ধারণ করে উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন এবং ত্রিপুরার ভাগ্যবিধাতা হন।

বাংলাদেশের ময়নামতী খননের ফলে যে সব পুরকীর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—পিলাকে প্রাপ্ত ভগ্নাবশেষ ঠিক তাদেরই মতো। বরং এখানকার মূর্ত্তিগুলির বিশাল রূপ দেখে মনে হয় পিলাকে আরো বড় ধর্মকেন্দ্র ছিল। ময়নামতীতে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে আরম্ভ করে একাদশ শতক পর্যন্ত তিনটি রাজবংশের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া গেছে। পিলাকেও পুরানো রাজবাড়ী বলে একটি স্থান আছে। এখানে একটা ভাঙ্গা মন্দির রয়েছে। সমরেন্দ্র দেববর্মার মতে "প্রাগুক্ত 'ঠাকুরাণী বাড়ী' নামক এই জনপদে প্রসিদ্ধ স্তূপের উত্তর দিকে অবস্থিত। তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারের আর একটি মৃত্তিকা-স্তূপোপরি বহু সংখ্যক বিকীর্ণ ও পুঞ্জীভূত ইষ্টকরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জনশ্রুতি এই—তৎসমুদয় জনৈক নৃপাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নিকেতনাদির ধ্বংসাবশেষ এবং সেই কারণে এই স্থান "পুরাণ রাজবাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।...বলিভীম নারায়ণের নাম সমন্বিত 'বলিনারায়ণ দীঘী' নামে প্রসিদ্ধ যে সরোবরের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একদা বহু প্রস্তর মূর্ত্তি ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।...এই জনপদে অবস্থিত মূর্ত্তি নিচয়ের স্থাপন কর্তার নাম এবং স্থাপন সময়ের সম্বন্ধে কোন তথ্যই নির্ণয় করা যায় না।

ত্রিপুরা রাজ্যের পরাক্রান্ত সেনাপতি রায়ভীম কর্তৃকই মূর্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভাবনা অধিক। যাহা হউক ঐ সমস্ত মূর্ত্তি যে…এই প্রদেশ নিবাসী… লোককর্ত্তৃক নির্মিত হইয়াছিল—মূর্ত্তিনিচয় পর্যবেক্ষণ করিয়া এবংবিধ অনুভূত হয়।"৫০

যতদূর জানা যায়, ১৯৬৬ সনেই ভারতের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের অধিকর্তা এ. কে. ঘোষ পিলাকে প্রথম এসেছেন। তিনি সেখান থেকে ছোট একটি মূর্ত্তি সংগ্রহ করেন। মূর্ত্তিটি অবলোকিতেশ্বরের। ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে আগরতলা যাদুঘরে আছে। অনুমান করা হয় এটি নবম-শতাব্দীর নিদর্শন।

পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাপকভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ হয় গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮৫ ইং থেকে ২০শে মার্চ ১৯৮৫ ইং-তে। এই সময় ভারতের ভূতত্ত্ব-বিভাগের উদ্যোগে পরীক্ষামূলক খনন কাজ হয়। এই "খনন কার্য শুধু ১৫'×১৫" মাটিতে নিষ্পন্ন হয়েছে। বলা বাহুল্য পরীক্ষামূলকভাবে। এ ধরণের খনন সাধারণ খনন কার্যের মত হয় না। ধীরে ধীরে ব্রাস, ওয়াশ নানা পদ্ধতিতে হয়। আপাত দৃষ্টিতে এল প্যাটার্ণের একটি অট্টালিকা সম্প্রতি খননে পরিস্ফুট হয়েছে। এ যাবৎ প্রাপ্ত দেয়ালগুলো কোনটি ১০' দীর্ঘ, কোনটি আবার ৪' কোনটি ৬' এর কাছাকাছি। দেয়ালের উচ্চতা ৭'। ভগ্নদশায় একটি ব্রোঞ্জে নির্মিত চূড়া, দুই ইঞ্চি উঁচু বুদ্ধ‥ মাটির পাত্র, কমণ্ডুলু, জগ, সিঙ্গা, পিলসুজ আরো বৈদিক ঔষধ তৈরীর প্রয়োজনীয় শিল-পাত্র পাওয়া গেছে। এসবই সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর বলে অনুমিত হয়। টেরিকোটার কাজ হিসাবে এখানে মিলেছে গন্ধর্ব, কিন্নর, হংস, হাতির উপর সিংহ, পুষ্প। ধূসর মাটিতে তৈরী। লাল রং করা হয়েছে। কি আশ্চর্য রং। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভূ-গর্ভে থেকেও এই রং বদলে যায় না। বিনষ্ট হয় না। পশ্চিম পিলাকের মাঠ থেকে যে টেরিকোটার কাজ পাওয়া গেছে তার গড় মাপ ২·৭ সে. মি.। একটি টেরিকোটায় স্কোললাইনের লেখা থাকলেও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি আজো। পশ্চিমবঙ্গের টেরিকোটার সঙ্গে এর তফাৎ হলো, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া মাটির কাজের মান কিছুটা উন্নত। কাহিনী নির্ভর। রামায়ণ মহাভারতের নানা কাহিনীকে মনে রেখে কাজ করা হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা তথা পিলাকের কাজে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয় (Self style)। পিলাকের এই মৃৎশিল্পের উৎস হয়তো বাংলা। পিলাকের এই কাজের সঙ্গে

মিল আছে পাহাড়পুর, কুমিল্লা ময়নামতীর টেরিকোটার সঙ্গে। তবে পিলাকের টেরিকোটা ধূসর···। ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা শ্রীমতি দেবলামিত্র এটিকে একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলে অভিমত পোষণ করেছেন। এই টিপির আংশিক প্রোথিত বোধিসত্ত্বা...লম্বা পাতলা গড়ন।··· বোধিসত্ত্বের প্রভামণ্ডলসহ উচ্চতা ২ মিঃ ৮৮ সে. মি. প্রস্থ সর্বাধিক ১ মিঃ ৩৭ সেমি ···নবম শতকের মূর্ত্তি। একই স্থান থেকে পাওয়া গেছে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। আছে যাদুঘরে। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দক্ষিণ হস্তে বরাভয় মুদ্রায় পদ্মাসনে দণ্ডায়মান। ডান পায়ের কাছে সম্ভবতঃ তারাদেবী। তারাদেবীর ডান হাত খোয়া গেছে। বাঁ হাতে শতদল। বোধিসত্ত্বের দোপাশে প্রভামণ্ডলীতে উড়ন্ত বিদ্যাধরদ্বয়ের হাতে ঝুলন্ত মালা। মূর্ত্তির উচ্চতা ১ মিঃ ৭৬ সে. মি. পাশে সর্বাধিক ৯৫ সে. মি.।"[৫১]

মনে হয়, এরূপ কাজ আরো চললে—ময়নামতীর মতই বৃহৎ কোন রাজনৈতিক পটভূমির সন্ধান লাভ অস্বাভাবিক হবে না। এতে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ইতিহাস এক সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।

এ অঞ্চলে যে সব মূর্ত্তি পাওয়া গেছে, লক্ষ্য করা গেছে, এগুলি পিলাক ছড়ার দু'পাশেই ছড়ানো। এর সীমারেখা মোটামুটি ঠাকুরামাটিলা বাজারেই অধিক। মূর্ত্তিগুলি এখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। আগরতলা যাদুঘর ছাড়াও অনেক বাড়ীতে পূজামণ্ডপে এরা স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়া নানা ভাবে বাইরে পাচার হয়েছে বলেও অনেকের অনুমান।

এখানে বিভিন্ন সময়ে অবলোকিতেশ্বর, কিন্নর মূর্ত্তি, গণেশমূর্ত্তি, আটহাত বিশিষ্ট দুর্গামূর্ত্তি, সূর্যমূর্ত্তি, আঠারহাত বিশিষ্ট চণ্ডামূর্ত্তি। এছাড়াও নানারকম ছোট ছোট মূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলি হয়তো আগরতলা যাদুঘরে নতুবা পিলাকের চারপাশে গ্রামে বিভিন্ন বাড়ীতে ভক্তদের দ্বারা নানাভাবে অর্চিত হচ্ছে। এছাড়া এখনও পিলাকে নানা অবহেলায় প্রচুর মূর্ত্তি ছড়ানো আছে। আশা করা যায়—এ বিষয় কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি দিল্লী গিয়েছিলাম C C. R. T-এর একটি প্রোগ্রামে। সেখানে দিল্লী মিউজিয়ামেও আমাদের নেয়া হয়। আমি মিউজিয়ামের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম তাঁদের সংগ্রহে ত্রিপুরা থেকে কিছু নেই—ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পিলাক বা ঊনকোটি সম্পর্কে তাঁদের

জানাও নেই। বিভিন্ন ছোট ছোট ব্রোঞ্জ বা ঐ জাতীয় ধাতু নির্মিত ছোট মূর্ত্তিগুলিতে শিব পার্বতী বা রামসীতার প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে। পোড়া মাটির কিছু সীলমোহরও পাওয়া গেছে যেগুলি নবম শতাব্দীর মনে হয়।

পিলাকে পাঁচটি সূর্যমূর্ত্তি পাওয়া যায়। সূর্যমূর্ত্তির প্রভাব দেখে মনে হয় এখানে একটি সৌর উপাসনা কেন্দ্র ছিল। উদয়পুরের নিকটে বাগমাতেও এরূপ একটি সৌর উপাসনা কেন্দ্র ছিল বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ উড়িষ্যার মত এখানেও সূর্যপূজা খুব ব্যাপকতা লাভ করে। এর কারণ সম্ভবতঃ এখানে কুষ্ঠরোগের আক্রমণ। এখনও বিশেষভাবে উপজাতি জনগোষ্ঠী কুষ্ঠ রোগে খুব আক্রান্ত।

পিলাকে প্রাপ্ত কিছু স্বর্ণমুদ্রার উপস্থিতিও লক্ষণীয়। এ ধরণের স্বর্ণমুদ্রা এ স্থানের এককালের উন্নত অবস্থার প্রতিই ইঙ্গিত করে। অবশ্য এগুলি বাইরে থেকেও এখানে আসতে পারে। তাতে মনে হয় এ অঞ্চলের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের উন্নত ধরণের যোগাযোগ ছিল এবং এ অঞ্চলের অর্থনীতি ছিল স্বচ্ছল।

কিছুদিন পূর্বে (নভেম্বর ১৯৭৯) ধাতুনির্মিত একপাত্র মুদ্রা পিলাকে পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে এই মুদ্রাগুলি দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর। কোন রাজা এই মুদ্রা ছেড়েছিলেন তা' মুদ্রার বুকে লেখা নেই। কিন্তু মুদ্রা বিশেষজ্ঞদের অভিমত এ ধরণের মুদ্রা 'হরিকেলা' মুদ্রা নামে পরিচিত। রূপার তৈরী মুদ্রাগুলি গোলাকৃতি ধাঁচে ফেলা। বাংলাদেশের শ্রীহট্ট এবং ময়নামতীতে যে ধরণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা' থেকে এগুলি হাল্কা, বড়, একদিকে ষাঁড়ের প্রতিকৃতি, অন্যদিকে চিহ্ন অস্পষ্ট। অনুমান করা হয় খৃষ্টীয় নবম থেকে দশম শতাব্দীতে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় 'হরিকেলা' নামে এক রাজ্য ছিল। 'হরিকেলা' মুদ্রায় কুমিল্লা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এই রকম বিভিন্ন অঞ্চলের নাম লেখা থাকত। সেই এলাকায় মুদ্রার ব্যবহার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে হওয়ায় এটাই ধারণা করা হয় যে, হরিকেলা রাজত্ব একসময় বিলনীয়া মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[২২] অবশ্য কোন কোন গবেষক পিলাক শব্দকে পারস্য শব্দের বিকৃত রূপ মনে করেন। তাঁদের ধারণা খৃষ্টের জন্মের প্রায় একশ বৎসর পূর্বে আর্যজন-স্রোতের একটা অংশ নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে বিক্ষিপ্ত হয়ে এই অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। কালক্রমে সেই জনগোষ্ঠী এখানকার মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অবশ্য এই অভিমত এখনও কোন প্রবলযুক্তির মাধ্যমে সমর্থন লাভ করেনি। তবে এই সম্পর্কে আরো গবেষণা চলতে পারে।

বস্তুতঃ, সাধারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যুক্ত হলে পিলাকে এক প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাস মিলতে পারে।

ঊনকোটি তীর্থ

ত্রিপুরার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন হলো উত্তরত্রিপুরা জেলার কৈলাসহর মহকুমায় অবস্থিত ঊনকোটি তীর্থ। ঊনকোটি শুধু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন নয়—তীর্থের মহিমায়ও সমুদ্ভাসিত।

কৈলাসহর মহকুমা ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ২০০ কি.মি. দূরে। কৈলাসহরের প্রায় তিনদিকেই বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলা। আগরতলার সঙ্গে স্থলপথেই প্রধান যোগাযোগ। কিছুদিন পূর্বেও আকাশপথে যোগাযোগ ছিল। ঊনকোটি কৈলাসহর শহর থেকে প্রায় ৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ঊনকোটি সূর্যবংশীয়দের মহিমাবেই প্রকাশ করছে। এ সম্পর্কে উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান শিক্ষক প্রয়াত শীতল চক্রবর্ত্তী (জন্ম ১৮৬৮ খ্রীঃ) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "ঊনকোটি অন্যতম একটি প্রাচীনতম নিদর্শন।

বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা ত্রিপুরায় প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন সকলকে যে সূর্য্যবংশের সগর সন্তানদিগের ধ্বংসকারী কপিলমুনির সহিতই এখানে অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন নিদর্শন ঊনকোটি তীর্থের বিশেষ যোগ দেখিতে পাইতেছি।……বর্ণনাটি হইতে ঊনকোটি শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান থাকাতেই যে ঊনকোটী নাম হইয়াছিল, এই ঐতিহাসিক তথ্যই লাভ করা যায়। ইহা হইতে মহর্ষি কপিলদেবও এখানে এক কাশী (বারাহী তন্ত্রে আছে "তন্ত্রোন-কোটী-সলিঙ্গা লিঙ্গ কাশী বিরাজতে") নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। তাহাতেই ইহার এইরূপ পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে এখনও ঊনকোটিতে প্রতি বৎসর অশোকা অষ্টমীতে মেলা হয় এবং এই মেলার আকর্ষণ জাতি উপজাতির সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে বিদ্যমান।

এই সুপ্রাচীন কৃর্ত্তি সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন তথ্য এখনও গবেষকদের জানা নেই। এই সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের দুটি অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমত, এক সময় বারাণসী ভ্রমণের জন্য কৈলাসনাথ শম্ভু দেবগণ:

সহ হিমাচল থেকে অবতরণ করে বারাণসী যাওয়ার পথে সন্ধ্যায় ঊনকোটিতে এসে উপস্থিত হন। সে সময় সকলেই পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় এই স্থানে রাত্রি-যাপন করেন এবং সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালেই বারাণসীতে পৌঁছবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বে মহাদেব ব্যতীত আর কারো ঘুম ভাঙ্গেনি। এই অবস্থায় মহাদেব সমস্ত দেবতাদের নিদ্রামগ্ন রেখে চলে যান। এর কিছুক্ষণ পরেই রাতের অবসান ঘটে এবং 'বায়স-রব' হলে দেবগণ পাষাণে পরিণত হন। এক মহাদেবের অভাবে কোটি দেবতা পূর্ণ না হওয়ায় এই স্থান ঊনকোটি নামে পরিচিত হয়, নতুবা ইহা বারাণসীতে পরিণত হতো।

দ্বিতীয় ধারণা এই যে, কোন এক সময় কোন একজন মহাত্মা এই স্থানে কোটি দেবমূর্ত্তি স্থাপনপূর্বক একে দ্বিতীয় বারাণসী ক্ষেত্রে পরিণত করার সংকল্প করেন। সেইজন্য তাঁর দ্বারা এই স্থানে বহু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐব্যক্তি কোটি দেবমূর্ত্তি স্থাপন করতে পারেননি, একটি মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এইজন্য এই স্থান বারাণসীর পরিবর্ত্তে ঊন-কোটিতে পরিণত হয়।[৫২]

রাজমালায়ও এই সম্পর্কে আলোচনা আছে—

"গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি॥
মনু নদীতীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনু নদী পুণ্য নদী হৈল॥"

ত্রিপুরাব্দ প্রবর্ত্তনকারী নৃপতি ঘুঝারফার পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী 'কুমার' নামে খ্যাত শিবভক্ত ত্রিপুরেশ এতদ্ঞ্চলে আগমন পূর্বক শিবোপাসনা করিয়াছিলেন—এইরূপ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা রাজমালায় লিপিবদ্ধ আছে।

'বিমারস্য সুতোজাতঃ কুমারঃ পৃথিবী পতিঃ।
স রাজা ভুবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ॥
কিরাতরাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুল নগরান্তরে।
শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতে মঠে॥'

(সংস্কৃত রাজমালা বা রাজরত্নাকর)

'বিমার হইল রাজা তাহার তনয়।
তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয়।
কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুল নগর।

সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর।
সুবড়াই খণ্ড নামে মহাদেব স্থান।
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান ।।

*　　*　　*

গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি ।।
মনু নদীতীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনু নদী পুণ্য নদী হৈল ।।'

(বাঙ্গালা রাজমালা)

যে ছাম্বুল নগরের বিষয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ আছে, তাহা কোন স্থানে অবস্থিত ছিল এই বিষয় নির্ণয় করা দুরূহ। ত্রিপুরারাজ্যের উত্তরদিগ্বর্ত্তী 'মনু নদী' অধুনা ঊনকোটি পর্ব্বত হইতে দূরে প্রবাহিত হইলেও একদা উহা উক্ত পর্ব্বত-সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব। কারণ বর্ত্তমান কালে নদীটি যে স্থানে প্রবাহিত হইতেছে তদ্ব্যতীত ইহার প্রাচীন অস্তিত্বের চিহ্ন অন্যত্রও লক্ষিত হয়। এই হেতুমূলে অনুমিত হয় যে 'ছাম্বুল' নগর ঊনকোটি পর্ব্বত প্রান্তেই অবস্থিত ছিল এবং কুমার নামে খ্যাত ত্রিপুরেশ উক্ত পর্ব্বতে সংস্থাপিত কোন শিবমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াছিলেন।

গ্রন্থদ্বয়ে যে 'সুরডাই' নাম পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচনের অপর একটী আখ্যা। উল্লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ঊনকোটি পর্ব্বতোপরি তৎকর্ত্তৃক একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে এই স্থানের প্রাচীনত্ব আরো বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করে।

সুপ্রাচীনকালে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে প্রাগুক্ত প্রদেশে এবং শ্রীহট্টে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কৈলাশহর নামক জনপদের সমীপবর্ত্তী কতিপয় ইষ্টক নির্ম্মিত ভবনাদির ভগ্নাবশেষ ত্রিপুরাধিপতি 'কিরীট' বা 'আদি ধর্ম্মফা'র রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির বিধ্বস্ত অংশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

কথিত আছে—আদি ধর্ম্মফা নামক উক্ত ত্রিপুরেশ যজ্ঞবিশেষ সম্পাদন মানসে একপঞ্চাশৎ ত্রিপুরাজে কতিপয় বেদজ্ঞ মৈথিলি ব্রাহ্মণকে এতৎ প্রদেশে আনয়ণ পূর্ব্বক এইস্থানে তাঁহাদিগের দ্বারা সেই যজ্ঞের কার্য্য আড়ম্বরের সহিত নির্বাহ করাইয়াছিলেন। দীর্ঘে প্রস্থে ষোড়শ হস্ত যে এক ইষ্টকনির্ম্মিত কুণ্ড

এই স্থানে পরিলক্ষত হয়, তাহাতেই উক্ত হোম সংসাধিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে পর ত্রিপুরেশ আদি ধর্ম্মফা সন্তুষ্ট হইয়া ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণকে ঊনকোটির সমীপবর্ত্তী ভূমিদান করিয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধীয় দুইটি তাম্রশাসন উক্ত ব্রাহ্মণগণের বংশধিগের নিকট অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উল্লিখিত যজ্ঞ সম্পাদনকালেই ত্রিপুরেশ আদি ধর্ম্মফা কর্ত্তৃক এতৎ প্রদেশের 'কৈলাস-হর' নাম প্রদত্ত হইয়া থাকা বিচিত্র নহে।

ঊনকোটি নামে প্রসিদ্ধ উক্ত পর্ব্বতটি শতাধিক হস্ত উচ্চ হইবে। ইহার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিবার জন্য প্রাচীনকালে নির্ম্মিত কতিপয় ক্ষয়প্রাপ্ত সোপান স্তরের চিহ্ন তদ্গাত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই গিরিশিখরস্থ একটি নির্ঝরিণীর বারি তন্নিম্নদেশস্থ তিনটি পাষাণকুণ্ডে একাধিক্রমে পতিত হইয়া সর্ব্বনিম্নকুণ্ড হইতে এক ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী-রূপে পর্ব্বতনিম্নে প্রবাহিত হইতেছে।"৫৩

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, কালুকামার কর্ত্তৃকও এইসব মূর্ত্তি তৈরীর কথা বলা হয়।

ঊনকোটি সম্পর্কে ত্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে বীরচন্দ্রমাণিক্যই প্রথম সচেতন হন। তিনি জঙ্গলে ঢাকা এই প্রাচীন স্মৃতিকে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় সেজন্য মন্ত্রী ধনঞ্জয় দেববর্মাকে সেখানে পাঠান। তিনি সে স্থান পরিদর্শন সংস্কারের জন্য নানাবিধ সুপারিশ সহ স্থানের নাম সম্পর্কেও একটি বিবরণ দেন। বিবরণটি তাঁর ভাষাতেই তুলে ধরা হলো—

'কৈলাসেশ্বর ভূতভাবন ভবানীপতি স্থানে স্থানে খোদিত ও অঙ্কিত দেবদেবীর মূর্ত্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমানথাকা হেতুই ঐ তীর্থের নাম ঊনকোটী ও তদধিপতির নাম ঊনকোটীশ্বর এবং তদসংলগ্ন পরগণার নাম কৈলাস হর হইয়াছে। বস্তুতঃ "কৈলাসের হর তৎসহিত এই অর্থেই 'কৈলাস্ হর' হইয়াছে কেবল—সময়ের স্রোতে উচ্চারণের তারতম্য হইয়াই সেই কৈলাস শব্দের 'স' হর শব্দের সহিত পরে মিলিত হইয়া শহর শব্দ সম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তন্মূলেই 'কৈলাস' 'হর' উচ্চারণ না হইয়া তৎস্থলে 'কৈলাশহর' উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে উপলব্ধি হয়। ফলতঃ এতদ্ভিন্ন এই নাম সৃষ্টি হইবার আর কোন বিশেষ কারণ খুঁজিয়া পান নাই।"

তিনি বনাকীর্ণ পথঘাট পরিষ্কার করার জন্য এবং মূর্ত্তিগুলির সংস্কারের কথা বলেছিলেন। এছাড়া একটি নাটমন্দির এবং একটি ভোগরান্নার জন্য ঘর নির্মাণ করার কথা বলেছিলেন। এছাড়া নিয়মিত পূজাপার্বণের ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলি কাজে পরিণত হয়নি।

তারপর মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য ঊনকোটি দর্শনে যান। "শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত জানা যায়। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে মহারাজকুমার সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এবং মহারাজা বীরবিক্রম ঊনকোটি পরিদর্শনে যান।

মন্ত্রী ধনঞ্জয় দেববর্মার পর এই বিষয়ে ভারতসরকারের উদ্যোগ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ত্রিপুরার তৎকালীন পোলিটি ক্যাল এজেণ্ট এল্. এভ. মোরসেদ, আই. সি এস ত্রিপুরারাজ্যের দেওয়ানকে এক বিস্তৃত চিঠি লেখেন (১৯০১ সাল)। এতে বলা হয়েছে ভারতসরকার দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়গুলোকে সংরক্ষণের জন্য গোটা ভারতকে পাঁচটি বিভাগে ভাগ করেছেন। ত্রিপুরাকে বাংলা ও আসামের বিভাগের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তারপরও অনেকদিন রাজকোষ কিংবা ভারতসরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে অর্থ খরচের বিবরণ পাওয়া যায় না! এই বিষয়ে ত্রিপুরারাজ্যে বৃটিশ নিযুক্ত পলিটিক্যাল এজেণ্ট Captain R. C. B. Williams এর উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ সালে ঊনকোটি পরিদর্শন করে তিনি Archeological Survey of India-র পূর্বাঞ্চলীয় সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে ১৯১৩ সালের ১৫ই আগষ্ট এক বিশদ বিবরণ তৈরী করে পাঠান। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ঊনকোটি পাহাড়ের কিছু ক্ষতি হয়েছিল। তারপরও তিনি যে বিবরণ দেন, তা' নিম্নরূপ—"I made notes of the following sculptures.

(1) A rock cut with following patterns many times repeated

(2) The figure of a woman with a naked breast.

The figure is about 15 feet high and is much broken. A sort of crown of 3 points on the head. The face is obliterated. The arms are broken and entangled with roots of creepers.

The legs are broken and ornamented with a pattern thus.

(3) Male figure—only the head and breast are visible. The remainder of the body is covered by a landslide.

(4) A large figure of (I think), Shiva and is in a very good state of preservation The left nostril is broken away. The right foot is burried in a slide of rock and one of the left arms is rather damaged···The figure is some 15′ feet high and represents a man with left foot and in the act of shooting an arrow.

The upper right arm is brandishing a heavy club. The lower right arm graps the arrow head and bow string. The upper left arm flourishes a 'TRISHUL' or triden and the lower left arm is holding the bow."

এইভাবে তিনি আরো বিস্তৃত আলোচনায় বিভিন্ন মূর্ত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

নানা ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থাকে এড়িয়ে এখনও সেখানে নানা মূর্ত্তি ও পাহাড়ের গাত্রে খোদানো ছবি আছে। পিলাকের মতই অনেক মূল্যবান মূর্ত্তি এখন সেখানে আর নেই।

মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ঊনকোটিশ্বর শিব খুব বিখ্যাত। ইহা কালভৈরব নামে প্রসিদ্ধ। এই সুবিশাল মস্তকে তিনটি চোখ এবং দন্তশ্রেণী বিকশিত। দুটি কানের ব্যবধান প্রায় চৌদ্দ হাত। এছাড়া তান্ত্রিক আচারের কয়েকটি নরমুণ্ডও পাহাড়ের গায়ে খোদাই আছে। অল্প দূরে বিষ্ণুমূর্ত্তি নামে আর একটি খোদাই মুখ আছে।

পাহাড়ের ওপরে রাবণ নামে পরিচিত একটি মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি হাঁটু পর্যন্ত পোঁতা। মূর্ত্তির পাঁচ মুখ আট হাত। হাতে তীর ধনুক। তার ওপরে রয়েছে মন্দোধরীর মূর্ত্তি। পাহাড়ের নীচের দিকে টিনের চালার ভেতর তিনমুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মূর্ত্তি আছে। এছাড়া একটি গণেশ মূর্ত্তি ও কয়েকটি পদচিহ্ন (বিষ্ণুপদ ?) দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া আরো কিছু মূর্ত্তি এখানে ওখানে ছড়ানো আছে।

'কালভৈরব' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

"অনুরূপ শিবমুণ্ড আর কোথাও দেখা গেছে বলে জানা নেই। প্রসঙ্গক্রমে কেন জানি না 'রাজমালা'র ত্রিলোচনের মুর্ত্তির কথাই মনে পড়ছে। দুরাচারী ত্রিপুর শিবের শূলাঘাতে মৃত্যুবরণ করলে ত্রিপুরা রাজ্যে মহা দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সর্বত্র। প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকে না। অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করার পর প্রজারা পাহাড়ে গিয়ে কিরাতমতে ছাগবলি দিয়ে মহাদেবের পূজা দেয়। পূজায় সন্তুষ্ট শিব আবির্ভূত হন। অনেক স্তবস্তুতির পর বলেন, ত্রিপুরাবাসী হীরাবতীর গর্ভে জন্মাবে ত্রিলোচন—যার আকৃতি ও প্রকৃতি হবে শিবতুল্য। তারপর চোদ্দ দেবতার চোদ্দটি মুণ্ডমূর্ত্তি সামনে রেখে পূজার নির্দেশ দিয়ে যান। পরে ত্রিলোচনের জন্ম হল। দেখে সবাই অবাক হয়ে বলল,

'ছালিয়া এমন হয় কেহত না কয়
বিপরীত তিন আক্ষি।'

এই বিপরীত তিন আঁখিই হল আসল লক্ষণ। ঊনকোটির বিশালতর শিবমুণ্ডেও দেখি এই বিপরীত তিন আঁখি। এই সঙ্গে শিব কর্তৃক চোদ্দ দেবতার চোদ্দটি মুণ্ড মুর্ত্তির কাহিনী মিলিয়ে নিলে শিবমুণ্ডের চারপাশে ও অন্যত্র অসংখ্য মুণ্ডমূর্ত্তি খোদাইয়ের রহস্য উন্মোচিত হতে পারে।"[৫৪]

এই মূর্ত্তিগুলি নির্মাণকাল আনুমানিক ৯ম বা ১০ম শতাব্দী। এগুলি কারা তৈরী করেছিল তাও এখনও অনাবিষ্কৃত। কথিত আছে—মহর্ষি কপিলমুনি এখানে তপস্যা করেছিলেন। তখন ঊনকোটি পর্বত বরবক্র (বরাক) আর মনু নদীর মাঝে ছিল। বর্ত্তমানে মনুনদী এই পাহাড় থেকে দূরে সরে গেলেও তখন মনুনদী এই পাহাড় থেকে কিছু দূরে ছিল। প্রবাদ আছে, মহর্ষি কপিলমুনি এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

"বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যামনু নদীস্মৃতা ।।
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটি গিরির্মহান্।
যত্র তোপ তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ ।।
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্ব্ব-সিদ্ধি প্রদং নৃণাম্ ।।"

(ঊনকোটী মাহাত্ম্য)

ঊনকোটি পাহাড়ের অজস্র মূর্তি এখনও গবেষকদের শুধু বিচার্য বিষয়।

পিলাকের মত এখানেও কোন বৃহৎ সভ্যতার আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে। তাহলে তীর্থের মহিমায় ও সভ্যতার গরিমায় এই অঞ্চল সকলের আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে—এই বিশ্বাস রাখি।

এছাড়া আরো নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছড়িয়ে আছে উদয়পুরের দেবতা-মুড়া পর্বতে গোমতী নদীর দু'তীরে, অমরপুরে, কসবা ও বক্সনগর (সোনামুড়া), ধর্মনগর প্রভৃতি অঞ্চলে। আগামী দিনে ব্যাপক অনুসন্ধানে এই সমস্ত স্থান থেকে অতীত সভ্যতার আরো নানা নিদর্শন পাওয়া যাবে।

কিংবদন্তীর দেশ ত্রিপুরা

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। বহু ঐতিহ্যের অধিকারী পাহাড় পর্বত অরণ্যসংকুল ত্রিপুরার নিভৃতে সমাশ্রিত পুষ্পের মতই ত্রিপুরার কিংবদন্তীগুলির রূপ। কিংবদন্তীর প্রকাশভঙ্গী উল্লেখযোগ্য নয়—কিন্তু এর কল্পনাভঙ্গী লক্ষণীয়। কোনটি রূপকথা, উপকথার মতো—কোনটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার মতো।

কিংবদন্তীর কতগুলি বৈশিষ্ট আছে—প্রথমতঃ, কিংবদন্তী কোন ঐতিহাসিক কিংবা অন্য কোন বাস্তবভিত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

দ্বিতীয়তঃ, এর সামগ্রিক রূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাপ্রসূত নয়—সমষ্টিগত মনের সৃষ্টি।

তৃতীয়তঃ, কিংবদন্তী সাহিত্যোচিত প্রকাশরীতি অনুযায়ী দেখা যায় না। ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ গঠন দান করেন। ত্রিপুরার বহু কাহিনী কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে।

ঘটনা অতীত হয়ে যায়—ঘটনার জের মিটে যায়। কিংবদন্তী সেই ঘটনাকে জন সমক্ষে তুলে ধরে। সর্বোপরি কিংবদন্তী মানুষের আত্মত্যাগের ঘটনাকে মহনীয় করে। সুতরাং সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনা কিংবদন্তীর অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে।

কিংবদন্তীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—পৌরাণিক কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক কিংবদন্তী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণের কোন কোন ঘটনার সাদৃশ্য অনুভব করে গড়ে উঠেছে—সীতাকুণ্ড, বশিষ্ট আশ্রম, লছমনঝোলা প্রভৃতি অঞ্চল। আবার মঙ্গলকাব্যের সাদৃশ্য অনুভব করে—বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় ত্রিপুরায়ও এই ধরনের নামকরণ পাওয়া যায়। যেমন—সাবরুম

মহকুমায় গড়ে উঠেছে—চম্পকনগর, কালিদহ প্রভৃতি অঞ্চল। সেখানে আজো বেহুলা, লখিন্দরকে স্মরণ করে পুজো দেয়া হয়। পশ্চিম বাংলারও অনেক জায়গায় মেলা বসে। এগুলো হলো পৌরাণিক কিংবদন্তী।

ঐতিহাসিক কিংবদন্তী হলো—বাস্তব নিদর্শনকে কেন্দ্র করে কল্পনার আত্মপ্রকাশ। ঘটনাগুলি অতীতকালের এক-একটি অধ্যায়ের ঘটনা—ইটপাথর, সরোবর, সমাধি তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। ত্রিপুরার সমশের গাজী ও রতনমণি রিয়াং হলেন এ ধরনের ঘটনার নায়ক।

সমশের গাজী

সমশের গাজী সম্পর্কে লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় 'রাজমালা', 'কৃষ্ণমালা' ও 'গাজীনামা'য়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গবেষক এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর চরিত্রকে বহুভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সমশের গাজী ত্রিপুরার রাজশক্তির সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'রাজমালা' প্রভৃতি লেখা হয় রাজানুকূল্যে, স্বাভাবিকভাবে এই লেখায় রাজাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁকে কেউ বলছেন 'ডাকাত' কেউ বলছেন, 'বিদ্রোহী কৃষক নেতা'। স্থানীয় লোকদের ধারণা তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী একজন জমিদার।

কৃষ্ণমালায় আছে,

"সমশের গাজী এক আছিল তস্কর,
পরগণে দক্ষিণ শিক ছিল তার ঘর।
দস্যুবৃত্তি করি ধন করিয়া সঞ্চয়,
হইবারে জমিদার তার মন লয়।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ত্রিপুরার পশ্চিমাংশে দক্ষিণ শিকে সমশের গাজীর আবির্ভাব। এই অঞ্চল এখনও দক্ষিণ শিক নামে পরিচিত। 'শিক' শব্দের দ্বারা সম্ভবতঃ রাজস্ব অঞ্চলকে বুঝায়। এ সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "বঙ্গালহ' রাজ্য অনেকগুলি রাজস্ব অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, এই অঞ্চলগুলি 'মহল' নামে পরিচিত ছিল। কয়েকটি মহল নিয়ে এক একটি 'শিক' গঠিত হয়।"

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুম মহকুমার প্রধান শহর সাবরুম থেকে ৮১ মাইল পশ্চিমদিকে আমলীঘাট, অলিনগর, সোনাপুর, চম্পকনগর প্রভৃতি

সমৃদ্ধ গ্রাম। সোনাপুরে ছিল সমশের গাজীর বসতবাটি। এই অঞ্চল বর্ত্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামগুলি ফেণী নদীর দু'তীরে অবস্থিত।

এইসব অঞ্চলে সমশের গাজীর প্রচুর কিল্লা, সরোবর এবং কাহিনী ছড়িয়ে আছে। কেউ কেউ মনে করতেন তিনি পরী বা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে তাঁর অসমসাহসিক কাজ সম্পন্ন করতেন। তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি গল্প এরূপ ঃ

সমশের গাজীর নাজীর চৌধুরী মহাশয় এক চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে সমশেরকে চিড়ামুড়ি খেতে নিমন্ত্রণ করেন। সমশের তাঁর লোক লস্কর নিয়ে সেখানে গেলেন। নাজীর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী ছিল ফেণী নদী থেকে অল্পদূরে। এ নদীর জলই চৌধুরী পরিবার ব্যবহার করতেন। সমশের আসার পথে, বাড়ীর স্ত্রীলোকদের এতদূর থেকে জল আনতে দেখে চৌধুরী মহাশয়কে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। চৌধুরী মহাশয় বললেন যে, কোন পুকুরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি—নদীর জলই ব্যবহার করতে হয়।

সমশের চিড়ামুড়ির ব্যবস্থা করতে বলে—বললেন, "তোমরা চিড়ামুড়িগুলি ধুয়ে রাখ, আমি তোমাদের জন্য একটি পুকুরের ব্যবস্থা করছি।" একথা বলে, একটু পরে অনেক লোক নিয়ে এলেন, এবং তারা কিছুক্ষণের মধ্যে বিরাটকার একটি পুকুর খনন করে দিল। এ ঘটনা চৌধুরী পরিবারে আজো বিস্ময় জাগায়। তারপর সমশের চিড়ামুড়ি খেয়ে চলে গেলেন।[৫৫]

তাঁর জীবনী সম্পর্কেও বহু মত রয়েছে। কেউ বলছেন সমশের এক পীরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে বড় দুরন্ত ছিলেন। আবার কেউ বলেন তাঁর পিতা পীর মহম্মদ, যিনি পেশায় দরিদ্র কৃষক ও নেশায় চোর ছিলেন। একবার কুমড়ো চুরির দায়ে সমশেরের পিতা জমিদার মহম্মদের নিকট নীত হন।

জমিদার নাসির মহম্মদের ছেলেদের সঙ্গেই তিনি পড়াশুনা করতেন। পড়াশুনায় শিক্ষক ও জমিদার নাসির তাঁর মেধাশক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। গাজীনামায় আছে—

"ছয়মাসে বাঙ্গালার শিখিল বৃত্তান্ত।
পাঠুক সকলে কেহ নাই সমবস্ত ॥
যাহারে বাড়াইবে প্রভু তার নাই ঊন।

দিনে দিনে তাহার বাড়য়ে যশগুণ ॥
লেখাপড়া গুণবন্ত পীরের নন্দন ।
দেখি গুরু হইলেক আনন্দিত মন ॥
জমিদার দুই পুত্র না হয়ে সমান ।
তাহা দেখি আওলজীর দিল পেরাসান ॥"

এরপর জমিদার তাঁকে বাঁশপাড়া কাছারির তহশীলদার পদে নিযুক্ত করেন। গাজী এখানে এসে দেখলেন ("It was here he saw) the poverty of the peasents and oppressive nature of the zaminder।"[৫৬] জমিদারের ব্যবহার সমশেরের মনে খুব বিরক্ত ভাব সৃষ্টি করল।

এ সময় গদাহোসেন খোন্দকার নামে এক বিখ্যাত ফকিরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ফকির তাঁকে বললেন—"সমশের তুমি অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। তোমাকে একটা দৈবশক্তি সম্পন্ন ঘোড়া ও তলোয়ার দিলাম। জমিদার নাসিরের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার জয় হবে ও নাসিরের মৃত্যু হবে। আর ত্রিপুরার মহারাজের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ হবে এবং সে যুদ্ধে তোমার জয় হবে।" এ বলে ফকির বিদায় নিলেন—

"পির বলে মন দিয়া শুন পিরসুত ।
এ সুভর্ণ ঘোড়ার জান কির্মৎ বহুৎ ॥
* * *
নাছির যাইব মারা পাইবা জমিদারী ।
রাজবংশ ভঙ্গ হৈব হৈবা অধিকারী ॥
কিন্তু রাজার সঙ্গে তোমার হৈব মহারণ ।
আল্লাহে করিলে হৈবা রাজ্যের ভাজন ॥
এহি সুভর্ণ অশ্ব দিলাম তে কারণ ।
মল্লুক বিজএ হৈব জানিয়া আপন ॥"

(গাজীনামা)

ফকিরের কথায় তাঁর মনে উচ্চাভিলাষ জেগে উঠল। জমিদারের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করতে চান। এ সংবাদে নাসির মহম্মদ খুব রেগে গেলেন, এবং সমশেরকে শাস্তি দেবার মানসে বন্দী করার নির্দেশ দিলেন। সমশের এই আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত হলেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন জমিদারকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেন ও তার

কন্যাকে বিবাহ করেন। সমশেরের এই ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের বিপুল শক্তি অর্জন সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হচ্ছে—

"সমশের শৈশবে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকতেন। তিনি ব্রাহ্মণের গরু বাছুর চরাতেন। একদিন দুপুরবেলা সমশের গরু চরাতে এসে এক গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়েন। তার সারা মুখে দুপুরের উত্তপ্ত রৌদ্রের কিরণ পড়ছিল। সে সময় সেই ব্রাহ্মণ সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ দেখলেন, একটি সাপ ফণা তুলে সমশেরকে রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করছেন। এই ঘটনায় ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন—ভবিষ্যতে সমশের রাজা হবেন। তিনি সমশেরকে এই ঘটনা জানালেন এবং বিদায় দিলেন।

এই সময় ত্রিপুরার মহারাজ ছিলেন বিজয়মাণিক্য। তার কিছুদিন পরেই ইন্দ্রমাণিক্য রাজা হন। অন্যায়ভাবে সমশের দক্ষিণ শিক দখল করেছেন শুনে মহারাজ বিজয়মাণিক্য একদল সৈন্য পাঠালেন তাঁকে দমন করার জন্য। বেগতিক দেখে সমশের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সমশের রাজদরবারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করেন—এবং মহারাজ পরাজিত হন। সমশের নিজে রাজা না হয়ে ধর্মমাণিক্যের পৌত্র বনমালীকে লক্ষ্মণমাণিক্য নামে সিংহাসনে বসান।

তাঁর আমলে সর্বত্র জিনিসপত্রের সমান মূল্য ছিল। তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যে চোর ডাকাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই ছিলেন একজন ডাকাত। সুতরাং কোন ডাকাতের দল এ রাজ্যে ডাকাতি করার সাহস পেত না। তাঁর ডাকাতি সম্পর্কে এরূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, তিনি একবার চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ মন্দির লুঠ করতে যান। সেখানে অনেক সোনা ও টাকা কড়ি ছিল। সমশের গভীর রাতে সেখানে গিয়ে দেখেন—অনেক অস্ত্রধারী লোক মন্দির পাহারা দিচ্ছে। তিনি পরপর কয়েকবার এভাবে চেষ্টা করে একই ফললাভ করেন। তারপর তিনি মন্দির লুঠ করতে আর যান নি। শুনা যায়, তিনি ডাকাতি করে পাওয়া অর্থের অধিকাংশই গরীব মানুষদের বিলিয়ে দিতেন। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় অরাজক অবস্থায় অনেক প্রজাহিতৈষী লোকের মতই সমশের গাজীও অন্যতম ছিলেন। এর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী পাঠকের তুলনা করা যেতে পারে।

এদিকে যুবরাজ কৃষ্ণমাণি সমশেরের নিকট পরাজিত হয়ে পুরানো আগর-

সাধারণ রিয়াং প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।...উদয়পুর অঞ্চলে ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও লুণ্ঠন চলছিল। বেসরকারী মতে সে সময় গ্রেপ্তারের সংখ্যা হয়েছিল, ২০,৪২৫ জন, এর মধ্যে ২০০ জন নারী ও ১২ জন শিশু ছিল।

নির্যাতনের মুখে রিয়াং বিদ্রোহ প্রায় ভেঙ্গে পড়ছিল। তাঁরা প্রতিবেশী বৃটিশ বাংলায় কৃষক নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ...তখনও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর চোখে রিয়াং বিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়েনি। তাই ত্রিপুরা ও জমাতিয়া উপজাতি যুবকদের স্বাধীনতা রক্ষার আওয়াজ তুলে রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো সম্ভব হয়েছিল। এই দমন নীতির মূলে শান্তির বাজারের নিকট লক্ষ্মীছড়ায় শেষ সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহী নেতারা সীমান্ত অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিলেন। এই প্রবেশের মুখেই তাঁদের নেতা রতনমুনী ধৃত হয়েছিলেন। তাঁকে বৃটিশ গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে ত্রিপুরা মহারাজার হাতে তুলে দিয়েছিল।...রিয়াং বিদ্রোহের উপর কমিউনিস্টদের উত্থাপিত তদন্ত কমিশন গঠন দাবী স্বীকৃত হওয়ার পর বিদ্রোহীরা মুক্তি পেতে থাকেন। বিদ্রোহীদের নেতা রতনমুনীকে আগরতলা রাজপ্রাসাদের নীচুতলায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার এই বিদ্রোহীদের বিপ্লবী সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন প্রদান করেছেন।"[৬৩]

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের পরিধিও সংকুচিত হচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অরণ্যের মহিমাকে খর্ব করতে বাধ্য হচ্ছে।

ত্রিপুরার আরণ্যক সম্পদও মানুষের আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়নি। মানুষের মুনাফার লোভ এবং প্রয়োজনের তাগিদে—এই সম্পদকে আইন ভেঙ্গে হরণ করার চেষ্টা হয়। তবু, আজো ত্রিপুরা প্রাকৃতির সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড় যেন ত্রিপুরায় হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অরণ্যত্রিপুরা তার বিপুল সম্পদ ও সৌন্দর্য নিয়ে মানুষকে দুর্নিবার ভাবে আজো আকর্ষণ করে।

ছোট বড় নানা নদ নদী ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। উত্তরে জুরি নদী, দক্ষিণে ফেণী নদী এই রাজ্যের প্রান্তসীমা নির্দেশ করছে। এছাড়া

গোমতী, ধলাই, খোয়াই, হাওড়া, মনু, মহুরী, লাউগাঙ প্রভৃতি নদী এইরাজ্যের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পাদন করছে এবং প্রাচীন ত্রিপুরার সাক্ষ্য বহন করছে।

অমরপুরের রাইমাশর্মা উপত্যকা থেকে গোমতী বেরিয়ে দেবতামুড়ার পাদদেশ ধৌত করে উদয়পুর শহরের বুক চিরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গোমতী ত্রিপুরার প্রধান নদী এবং অতীত ত্রিপুরার এক গৌরবময় ইতিহাস। এর বুকে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ হয়। এর দুইতীরে কত জনপদ, রাজ্যপাট ভেঙ্গেছে, গড়েছে !

ফেণীনদী সাবরুমের পূর্বপ্রান্ত থেকে ত্রিপুরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়ে চম্পকনগরের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

ফেণীনদীই এই রাজ্যের একমাত্র নদী, যেখানে জোয়ার ভাটার খেলা চলে। সমশের গাজীর কিল্লার পাশে দাঁড়িয়ে এর ঢেউ খেলানো রূপ মানুষের মন সহজে কেড়ে নেয়।

মুহুরী ও লাউগাঙ দেবতামুড়ার পা ছুঁয়ে বেরিয়ে পড়েছে—তারপর বিলনীয়া শহরের পাশ দিয়ে এক হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

হাওড়া নদী ত্রিপুরার একমাত্র গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র বড়মুড়া পাহাড় থেকে বেরিয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার বুক চিরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

খোয়াইনদী আঠারমুড়া পাহাড় থেকে বেরিয়ে শম্বুক গতিতে খোয়াই শহর ঘিরে শ্রীহট্টের পাশ দিয়ে ক্রমশঃ বিস্তৃত রূপ নিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে।

ধলাই নদী ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান পাহাড় লংতরাই থেকে বেরিয়ে কমলপুর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে।

ত্রিপুরার অন্যতম বিখ্যাত ও সূর্যবংশীয় রাজাদের স্মৃতিবাহী মনুনদী জামপুইটাং পাহাড় থেকে বেরিয়ে ধর্মনগর শহরের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এছাড়া এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নালা ছরা।

পৃথিবীর দেশে দেশে সভ্যতার প্রথম প্রকাশ নদীকে ঘিরে—নদী উপত্যকায়। যোগাযোগ, পরিবহন এবং শেষ উৎপাদনে নদীর ভূমিকাই ছিল প্রধান। তাই নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা বিশ্বাস, সংস্কার।

এই রাজ্যেও নদনদীকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে, ত্রিপুরার উৎসব, অনুষ্ঠান ও মেলা—রাজ্যের মানুষের ব্রত পার্বণ, মানুষের ইহকাল, পরকালের কৃত্যাদি। এই নদনদীর তীরেই সর্বপ্রথম গড়ে উঠে জনবসতি—এই নদনদীকে ঘিরেই তার কৃষি-বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি। কখনও উদ্দাম বন্যার তাণ্ডবে মানুষের ঘরবাড়ী

ভেঙ্গে যায়—মানুষ গৃহহীন হয়, সম্পদহীন হয়ে পড়ে—আবার এই বন্যাই মানুষকে যোগায় শক্তি—বেড়ে উঠে ফুল ও ফল। প্রবল বারিপাতে পাহাড়ী নালা, ছরাগুলি বন্য অজগরের মতই ফুলে ফেঁপে উঠে মানুষের জীবনে উপদ্রব সৃষ্টি করে, আবার বৃষ্টি থেমে গেলে এরা হয়ে পড়ে ক্ষীণতনু চঞ্চলা বালিকার মতো—আপন বেগে চলতে থাকে।

তাই এই ত্রিপুরার আদিবাসীদের প্রধান পূজা গঙ্গা পূজা—নদীউৎসব, বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসব বা পূজা। তাদের আরেকটি পূজা মকর সংক্রান্তির স্নান অন্যতম নদী উৎসব। মাতা গোমতী এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র।

এখানে সভ্যতা বিকাশের ঊষাকালে, মুহুরী নদী ও লাউগাঙ-এর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন জনপদ—ডাঙ্গরফার পুত্রদের পরিচালনায়। ফেণীনদীর তীরে গড়ে উঠেছিল চাকমাজাতির প্রাচীন রাজ্য। গোমতী যে অংশে দেবতা-মুড়াকে বিদীর্ণ করেছে তার দু'পাশে রয়েছে বহু দেবতার চিত্র। প্রাচীনকালে ত্রিপুরার কোন রাজা এসব চিত্র এঁকে থাকতে পারেন অথবা এ রাজ্য আক্রমণ-কারীদের কেউ হতে পারে। কঠিন পাথরের বুকে এসব চিত্র আজো অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে। গোমতীর নির্জন পরিক্রমায় কলকল শব্দের যাদুকরী মন্ত্রে এসব দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য। প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী, উদয়পুর ও অমর-পুর এবং প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র সোনামুড়া এই গোমতীর তীরেই গড়ে উঠেছে। জুরি নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল প্রাচীনরাজ্য—ধর্মফা সেখানে রাজত্ব করেন। মনুনদীর তীরের ঊনকোটি পাহাড়ের মহিমা আজো মানুষকে শ্রদ্ধায় অবনত করে—শিল্পের চাতুর্যে মুগ্ধ করে।

এই রাজ্যের পর্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। এই পর্বতশ্রেণীগুলির মধ্যে প্রায় ২০ কিলোমিটার চওড়া সমভূমি আছে। রাজ্যের দক্ষিণে দেবতামুড়া ও উত্তরে জম্পুই পর্বতশ্রেণী অবস্থিত। জম্পুইর বেতলিং শিব সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, উচ্চতা প্রায় ৯০০ মিটার। লংতরাই অন্যতম উচ্চ পর্বতশ্রেণী। এর উচ্চতা প্রায় ৫০০ মিটার। অনান্য পর্বতশ্রেণীগুলি হলো—বড়মুড়া, আঠারমুড়া, সাকানটাং প্রভৃতি। সমস্ত রাজ্য জুড়ে রয়েছে ছোটবড় অনেক টিলাভূমি। এগুলি পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশের সমতল ভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশে রয়েছে নানা জলাভূমি। প্রচুর লুঙ্গাভূমি প্রাকৃতিক জলাশয় হিসেবে এই রাজ্যের সৌন্দর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

পাহাড় পর্বতময় এই রাজ্যের বিস্তৃত অংশে কংকরময় ভূমিসহ কাদা, পলি

বা বেলে-দোঁয়াশ শ্রেণীর মাটিও আছে। মাটিতে লোহার ভাগ লক্ষ্য করা যায়। উপত্যকাভূমিতে আর্দ্রতার ভাব অধিক।

রাজ্যে বিশেষভাবে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু গরমও বেশী। ডিসেম্বর থেকে প্রায় ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শীতকাল। রাজ্যের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অধিক। রাজ্যের বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় ২১০০ মিলিমিটার। রাজের অবস্থান হলো—২৩ অক্ষাংশ হতে ২৪½ অক্ষাংশের মধ্যে।

রাজ্যের বিভিন্ন অংশে খনিজ পদার্থও আছে। আগরতলা শহরের অনতিদূরে বড়মুড়া পাহাড়ে Oil & Natural Gas Company-র উদ্যোগে প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে। এ ছাড়া রাজ্যের দক্ষিণে দেবতামুড়ার প্রান্তে গজারিয়াতেও এ বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ চলেছে। বিভিন্ন অংশে বাদামী কয়লা ও চুনাপাথরের সন্ধান আছে। আগামীদিনে ত্রিপুরার লাল মাটিতে আরো সম্পদ সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ বহির্রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগহীন এই রাজ্যে অনুসন্ধান কাজ এখনও সীমিত।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁশবন, নীচু অঞ্চলে ঘন ঘাস। লালমাটির কোলে কোলে, আকাশ ছোঁয়া বনরাজির বুকে প্রকৃতির বিচিত্র বিস্ময়ের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে নানা পশুপাখী। "বেশী দিনের কথা নয়। আজ থেকে ৫০-৬০ বৎসর আগে ত্রিপুরার লংগাই ও দমছড়া উপত্যকায় গণ্ডার দেখা যেত। হাতী, বাঘ, কালেম্বর, হরিণ, ভল্লুক, বন্যমহিষ, গরু ইত্যাদি বন্যপ্রাণী প্রচুর সংখ্যায় ত্রিপুরার বনে দেখা যেত। আমাদের বিচিত্র বন্য পক্ষীর সংখ্যাও কম ছিল না।...২০-২৫ বৎসর পূর্বে ত্রিপুরাতে প্রচুর বাঘ ছিল। কিন্তু গত বৎসরের গণনায় পাওয়া যায় মাত্র সাতটি।"[৬৪] গরু, ছাগল, মহিষ, শূকর, ঘোড়া, গাধা, মেষ, মোরগ, পায়রা, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপাখী তো রয়েছেই। এ ছাড়া এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে—কুকুর, বিড়াল, বনবিড়াল, শিয়াল, খরগোস, বানর, বেজী, কাঠবেড়ালী, ধনেশ, দোয়েল, শালিক, কোকিল, ফিঙ্গে, বুলবুলি, বাজ, টিয়া, ময়না, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, প্রজাপতি, ফড়িং, চাতক, ডাহুক, বিলহাঁস, কাক, মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতা প্রভৃতি। বনে অজস্র বকমের ফুলের সমারোহ—টগর, শিউলী, রক্তকরবী, গন্ধরাজ, অপরাজিতা, জবা, বকুল, মালতী, চাঁপা ও নানারকম লতাফুল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু রাজ্যের বৃক্ষ, লতা যেমন কমছে, তেমনি পশুপাখীও কমছে। তবু বন থেকে লোকালয় পর্যন্ত অনেক গাছ দেখা যায়।

বলা বাহুল্য, এই রাজ্যটি অরণ্যময়। ত্রিপুরা সরকারও রাজ্যের ৬০% বনাঞ্চল হিসাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করছে। সভ্যতার বিকাশের পরিমাণ হিসাবে —বনেরও ধ্বংস প্রক্রিয়া অব্যাহত। তবু এখনও যে বিশাল বনভূমি রয়েছে, একে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—চিরহরিৎ বনভূমি ও আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অঞ্চল। এ ছাড়াও আছে জলাভূমি, বেতবন, বাঁশ ও চনবন প্রভৃতি তৃণভূমি। রাজ্যের সাবরুম, সদর, কমলপুর, বিলনীয়া, ধর্মনগর ও কৈলাসহর মহকুমায় চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়। আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অঞ্চল দেখা যায় সদর, উদয়পুর, সোনামুড়া, বিলনীয়া প্রভৃতি মহকুমার শাল গাছের অরণ্যে।

চিরহরিৎ-এর অরণ্যে দেখা যায়—চামল, গর্জন, বুনোজাম, মাকুরীশাল, বয়রা প্রভৃতি। এছাড়া আছে—বাঁশ, চাঁপা, আগর, ছাতিম, নাগকেশর, নারকেল, তুণ, ঘিলা, গজ পিপুল প্রভৃতি। ফার্ণ, কচু জাতীয় গাছ, ছোট ছোট পাম জাতীয় গাছও বিস্তৃত পরিমাণে দেখা যায়।

পর্ণমোচীর বনাঞ্চলে শাল গাছের সংখ্যাই অধিক। শাল গাছ ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান বনজ সম্পদ। এছাড়া রয়েছে—গামাইর জারুল, গর্জন, দেবদারু, তেঁতুল, খেঁজুর, কাঁঠাল, সজিনা, লিচু, ছেবদা, ডালিম, কুম্ভীরা, বহেড়া, আমলকী, হরিতকী, উদাল, বুনোজাম, কুরচি, বেল, পিছলা, বনমালা, বট, অশত্থ, বেত, মুচকুন্দ, মাকুরী শাল, হাড়গাজা, জিওল, করই, তুন, ভেলা, সোনাল, বার্মা, শেওড়া, গনিয়ারী, আলু, লতানে পলাশ, মুচিকানী, বুটেনেরিয়া, কুপরী, কুমারিকা প্রভৃতি। এছাড়া নানা ঝোপঝাড় যেমন—ঘেটু, মেলাষ্টোমা প্রভৃতি। আর আছে শটি জাতীয় গাছ। এছাড়া "লতানে গাছের মধ্যে রয়েছে পলাশ, বুটেনেরিয়া, কমব্রিটাম, চুপরী আলু, কুমারিকা, তেলাচুবা এ তেলাকুচা গোত্রীয় অন্যান্য বুনোলতা, মুচিকানী, গুলঞ্চ, হংসলতা, বনপিপুল, থুনবর্জিয়া, দুধিয়া কল্মী, গজ পিপুল, মাইকেনিয়া প্রভৃতি লতা। মাটিতে বিভিন্ন কোমল জাতের গাছের মধ্যে রয়েছে ডেসমেডিয়ামের বিভিন্ন প্রজাতি। কেউই, শাটী, তোকমা, মরিচা প্রভৃতি গাছের ঝোপঝাড়।...বিভিন্ন জলাভূমির গাছপালা, বনভূমির গাছপালা হতে একেবারে আলাদা। এখানকার গাছপালা প্রায় সবই কোমল কাণ্ড বিশিষ্ট। গুল্ম ও বৃক্ষের সংখ্যা এখানে খুবই কম, যার মধ্যে রয়েছে, হিজল, সিধাজারুল,

নলখাগড়া ও অন্যান্য বহুবর্ষজীবী লম্বা ঘাস জাতীয় গাছ, কাদামাটি ও জলে রয়েছে মেলাষ্টেমা, লংগুটিবন, চাঁদমালা, পানিকলা, পানিফল, বড়পানা, ক্ষুদিপানা, পাতাশেওলা, হাইড্রিনা, পাতা ঝাঁঝি, করচী, পানমরিচ, গিমাশাক আরো নানা শ্রেণীর জলজ গাছপালা।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে অনেক বাঁশবন।...বাঁশের মধ্যে মুলিবাঁশের প্রাধান্যই সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য বাঁশের মধ্যে রয়েছে কালীবাঁশ, মৃত্তিঙ্গা, মাকাল, বরাক, রুপাই, পেচবাঁশ, ডলুবাঁশ প্রভৃতি।...অধিকাংশ বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদে গ্রীষ্মকালেই ফুল ফোটে, কোমল কাণ্ডের গাছে বর্ষার পরেই ফুল ফুটতে দেখা যায়। বর্ষার শেষে বনে দেখা যায় বিভিন্ন পরগাছা অর্কিড ফুলের বাহার। যে সকল কোমল কাণ্ডের গাছ নিম্নস্থ কাণ্ড দ্বারা শীতে তাদের জীবনধারা বজায় রাখে বর্ষায় এদের ভূমিনিম্নস্থ কাণ্ড হতে সুন্দর ফুল ফুটতে দেখা যায়।...তৃণভূমিতে রয়েছে দুর্বাঘাস, চোরকাঁটা ও অন্যান্য ঘাস জাতীয় গাছ, বিভিন্ন প্রজাতির ডেস্‌মোডিয়াম, থানকুনি, দ্রোন, ক্ষেত পাপড়া, দুধিলতা, আমরা, বনওক্‌রা, লজ্জাবতী প্রভৃতি গাছ।...সম্প্রতি এ রাজ্যে রবার চাষ আরম্ভ হয়েছে এবং যতদূর দেখা গেছে এখানকার মাটি ও জলবায়ু রবার চাষের উপযোগী, কাজুবাদাম, সিট্রোনেলা, ঘাস প্রভৃতির চাষও সম্ভাবনাপূর্ণ। এছাড়া পরীক্ষামূলক ভাবে কফি, গোলমরিচ, হলুদ, সর্পগন্ধা প্রভৃতির চাষেও সুফল দেখা গেছে।...এখানকার সমতলভূমিতে ধান, পাট, তিল, সরিষা, আখ জন্মে। টিলাজমিতে ধান, তুলা, মেস্তাপাটও নানা প্রকার সব্জী জন্মে। জম্পুই পাহাড়ে বেশ ভালো জাতের কমলালেবু হয়। এই রজ্যের ৫৫টি চা বাগানে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়।

প্রায় ২000 বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা রয়েছে এ রাজ্যে। যে সব গোত্রীয় গাছপালা অন্যদের তুলনায় অধিক তারা হল শিবি গোত্রীয়, ধান্য গোত্রীয়, বঙ্গণ গোত্রীয়, ইউফরবিয়া গোত্রীয়, সূর্যমূলী গোত্রীয় প্রভৃতি।... ফার্ণ জাতীয় গাছ রয়েছে প্রায় ৭0টি প্রজাতির। এছাড়া ছত্রাক ও শেওলা জাতীয় গাছের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।" (নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঃ ত্রিপুরার গাছপালা)।

আবার এই সব গাছপালাকে বন্দনা করে পূজা দেওয়ারও সুপ্রাচীন রীতি রয়েছে। উপজাতিদের বিশেষভাবে বাঁশ পূজা বা নানাপূজায় বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। অন্য অংশের মানুষের মধ্যে বটগাছ, অশ্বত্থগাছ, সিজমনসা

প্রভৃতি গাছকে দেবতা কল্পনায় পূজা করা হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন ধ্যান ধারণায় সর্বপ্রাণবাদ ও আরণ্যক জীবন থেকেই এই ধরণের বৃক্ষ পূজার প্রচলন। অরণ্যচারী মানুষ গাছের আশ্রয়ে গাছের উপর অবলম্বন করেই বেঁচে থাকত। এখনও উপজাতি জীবনে বাঁশ ব্যাপক ভাবে ঘিরে আছে। বাঁশ খায়, বাঁশ দিয়ে বাসস্থান তৈরী করে, বাঁশ হাতিয়ার হিসাবে বন্যজন্তু আহরণ ও আক্রমণে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নানাভাবেই উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। মহাকবি মধুসূদনও তার 'বট বৃক্ষ' নামক চতুর্দশপদাবলীতে বৃক্ষে দেবত্ব অনুভবের কারণ উল্লেখ করেছেন—

"দেব অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে।
নাহি চাহে মন ; মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ। প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে।
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি।
জীবকুল হিতৈষিণী, ছায়া সু সুন্দরী ;
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর-অতিথি—ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে ;
মৃদুভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত ;
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে।
দেব নহ, কিন্তু গুণে দেবতার মত।"

এই কবিতার মধ্যেই মানুষ কেন বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দেবতা মনে করে, তার ব্যাখ্যা রয়েছে।

এই রাজ্যের সর্বত্র এই ভাবে বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বৃক্ষ বন্দনার প্রচলন দেখা যায়। এইভাবে বৃক্ষ এই রাজ্যের সৌন্দর্য, আশ্রয় দাতা ও সম্পদ।

বনে ও জলায় নানা প্রকার সাপ দেখা যায়, যেমন—চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড়, ঢোঁড়া, ফানক, অজগর প্রভৃতি। নদী পুকুর নালায় আছে কই, মাগুর, সিঙ্গি, রুই, কাতলা, পাবদা, গজাল, শোল, খলিসা, পুঁটি, মৃগেল, কালো ভাঁওস, ভেটকি প্রভৃতি নানা প্রকার মাছ। আর ফেণীনদী, মহুরী নদীতে আছে

প্রসিদ্ধ চিংড়ী, যা সারা ত্রিপুরার মানুষের কাছে লোভনীয়। এই খালবিল আর পাহাড়ের গায়ে আছে নানা প্রকার জোঁক, ঝিঁ ঝিঁ, জোনাকী প্রভৃতি। কোন কোন স্থানে মানুষ অন্ধকার জলায় দেখতে পায় ভূতের আলেয়া—সংস্কার গড়ে উঠে কবরস্থান এবং ত্যক্ত জলাশয়কে ঘিরে ভূতের আবাসস্থান হিসেবে।

এই ভাবে গড়ে উঠেছে এই রাজ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশ। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। এদের ঘিরেই ত্রিপুরার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

বিভিন্ন জাতির (বাঙালী ও উপজাতি) সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

বিশাল ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতি উপজাতির বাস। দীর্ঘকাল ধরে উপজাতি-দের ভারতবর্ষে অবস্থান। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়—আদিম অধিবাসী হিসাবে নানা সম্প্রদায় দেশের নানা অংশে ছড়িয়ে আছে। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় এদের আদিবাসী বলে। শস্যশ্যামল সমতল ভূমিতে এদের দেখা যায় না। আর্যসভ্যতায় লালিত ও গর্বিত মানুষের সাথে এরা এখনও সমান ভাবে চলতে পারছেনা। আধুনিক ভারতের শহরে, নগরে, বন্দরে এদের দেখা যায় না। তাদের জীবনচর্যার পথ এখন আদিম সংস্কারে বেড়াজালে আবদ্ধ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকার বেদনা ভারতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে।

> হায় ছায়াবৃতা,
> কালো ঘোমটার নীচে
> অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
> উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।

আফ্রিকার কালো ছেলের হৃদয়ের সত্যিকার পরিচয় তারা পেতে পারেনি, যাদের দৃষ্টি উপেক্ষায় আবিল হয়েছিল। সভ্য ভারতবর্ষও তার গিরিকুমার ও অরণ্য দুলাল কালো ছেলেকে ঠিক প্রজা বলে চিনতে পারেনি, ভারতের আদি বাসীকে 'কালোপ্রজা' আখ্যা দিয়ে সত্য ভারতবর্ষ অবহেলা করেছে।···ভারতবর্ষ বহু বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় ভূমি, বহু বিভিন্ন নরগোষ্ঠী, বহু শক হুণ দল এখানে এক দেহে লীন হয়েছে। একথা সত্য! কিন্তু আংশিক সত্য। আমরা বোধহয় একটা শ্রুতিমধুর থিয়োরী হিসাবে এই আংশিক সত্যটাকে বড় বেশী জোর গলায় প্রচার করেছি। কারণ চোখের সামনেই এই থিয়োরীর বিরুদ্ধে

সাক্ষী রয়েছে, ভারতের আড়াইকোটি আদিবাসী। হাজার হাজার বছর ধরে আর্য ভারত এবং আদি ভারত একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থেকেও একসঙ্গে মিশতে পারেনি। না হয়েছে শোণিত-সমন্বয়, না হয়েছে সংস্কৃতির সমন্বয়। অবশ্য বিরাট হিন্দুসমাজের সুবিস্তৃত জাতের সিঁড়িতে কয়েকটি ধাপে কোন কোন গোষ্ঠীর আদিবাসী নিজের আগ্রহে এসে ঠাঁই গ্রহণ করে হিন্দু হয়েছে। হিন্দু সমাজের এরা অনাহূত অতিথি। আধুনিক সভ্য ভারতীয়ের টাটানগরে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাত সভ্যতা তপ্ত জ্যোতির গর্বে জ্বল জ্বল করছে, কিন্তু তারই চারপাশে সিংহভূমির শালের বনে আজও আদিবাসী বিরহের পাথরের কুঠার কাঁধে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কুটির নির্মাণের পদ্ধতি পর্যন্ত জানে না। ইস্পাত সভ্যতার পাশেই মূর্তিমান প্রস্তর সভ্যতা।

ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সংঘটন হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা ঐতিহাসিক প্রমাণের সাক্ষাৎ আমরা পাই না, যাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ভারতের আদিবাসীকে আর্য ভারতবর্ষ আপন করে নেবার চেষ্টা করেছে। বীর পার্থ আদিবাসী দুহিতা উলুপীকে এবং মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর হিড়িম্বাকে সাময়িক-ভাবে সহচরীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করেননি। ইন্দ্রপ্রস্থে বা হস্তিনাপুরের আর্যগরিমায় ফিরে এসে তাঁরা নির্বাসিত জীবনের সুখ সহচরীকে ভুলে গিয়েছিলেন। আর্য ভারত যে আভিজাত্যের গর্বে আদিবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, আজও সেই ব্যবধান দূর হয়নি। আর্যয়ানার মধ্যে একরকম জাতিগত ঔদ্ধত্য আছে। আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসী বুদ্ধির দিক দিয়ে উদারনীতিক হলেও এই বনিয়াদী জাতিগঠন (Race-pride) তার রুচিকে অজ্ঞাতসারে গ্রাস করে আছে। উনিশ ও বিশ শতকের ভারতবর্ষ নতুন সাহিত্য শিল্প ও সমাজ-সংস্কারের ভারতবর্ষ। কিন্তু এর মধ্যেও বিশেষভাবে একটা বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজকে আপন সমাজ বলে মনে করতে পেরেছেন, আধুনিক ভারতীয় তাঁর সাহিত্যের দর্পণে এমন প্রমাণ প্রতিফলিত করতে পারেনি। ভারতে এত সমাজ সংস্কারের অন্দোলন হয়ে গেল, কিন্তু আদিবাসী সমাজকে নিয়ে নয়। এ বিষয়ে যে কিছু কিছু করণীয় দায়িত্ব আছে, তা মাত্র সম্প্রতি রাজনৈতিক উদারতাবাদের জন্য কিছু কিছু দেখা দিয়েছে।

"কাককৃষ্ণ হ্রস্বাঙ্গ হ্রস্ববাহু মহামনু হ্রস্বপাণি নিম্ননাসাগ্র রক্তাক্ষ·

তাম্রমুখেজ”—ভাগবত পুরাণ ভারতের আদিম অধিবাসীকে সব দিক দিয়ে হ্রস্ব করে ছেড়েছেন। বলা বাহুল্য এ ধরণের উক্তি সেই প্রাচীনকালের আর্য ভারতীয়ের জাতিগর্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই গাত্রবর্ণের গর্ব অথবা শোণিতের ঔদ্ধত্য পৃথিবীর সভ্যতাকে বহুভাবে বিড়ম্বিত করেছে। নিগ্রোর প্রতি ইয়াঙ্কির মনোভাব, প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার দো-আঁসলা বুয়র ও ইংরাজের মনোভাব আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের মন থেকে জাতিগর্বের প্রাচীন বিষ এখনো দূরীভূত হয়নি। মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষকে প্রবল করবার একটা বড় উপায় এই জাতি-গর্ববাদ। হিটলার তাঁর স্বজাতিকে জাতি গর্বের দীক্ষা দেবার জন্য আর্যামিকে কূটনীতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন আর্যের কাছে প্রতিপক্ষ মাত্রেই যেমন ‘দস্যু’ ছিল, হিটলারের কাছে প্রতিপক্ষ মাত্রই ‘ইহুদী’। ভারতীয় শাস্ত্রকারেরাও ‘শ্বপচাধম’ বলে যে একটা গালাগালি তৈরী করেছিলেন, সেটাও বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে তাঁদের মনের গভীরে জাতি গর্ববাদের একটা ভয়ানক সংস্কার ছিল।

ভারতের আদিবাসী সমাজকেও চলতি কথায় পাহাড়িয়া বুনো জংলী ইত্যাদি আখ্যা আজও দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের আদিবাসীদেরও যে একটা সংস্কৃতি আছে, সে সম্বন্ধে কোন সশ্রদ্ধ ধারণা সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয়েরা পোষণ করেন না, কারণ সে সম্বন্ধে কোন খোঁজও তাঁরা রাখেন না। কিন্তু খোজ নিলে দেখা যাবে যে ঠিক আধুনিক ভারতীয়ের মতই আদিবাসী সমাজের মধ্যেও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন ও পরিবর্ত্তন হয়ে চলেছে। কোথাও অনড় প্রাচীন ব্যবস্থা ও বিধানের মধ্যে এরা অচল হয়ে আছে, কোথাও নিজস্ব সংস্কৃতির ঐশ্বর্যকে হারিয়ে এরা আগের তুলনায় দীন হয়ে পড়েছে এবং কোথাও বা আধুনিক যুগের রীতিনীতির সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা পরিবর্ত্তনকে বরণ করে নেবার চেষ্টা চলেছে।

আর্য আগমনের বহু পূর্ব্বেই এরা ভারতের প্রস্তর-সভ্যতার প্রথমবেদিকা রচনা করেছিল। কিন্তু আদিবাসী বলতে কি বুঝায়? আর্যেরা বহিরাগত কিন্তু আদিবাসীরা কি ভারতেই উদ্ভূত? না, ঠিক এভাবে বললে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ হবে। নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন, আদিবাসীরাও বহিরাগত। আর্য আগমনের বহু পূর্বেই ভারতে এঁরা এসেছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিকেরাও এই তত্ত্ব সমর্থন করেন। সুতরাং ভারতের একেবারে খাঁটি ভূমিজ (Antochthones) সন্তান যে কে, তা বলা দুষ্কর।

অতিদূর অতীতে ভারতভূমি কি একেবারেই নরহীন ছিল? সবই বাইরে থেকে এসেছে? বিজ্ঞানী গবেষক মহল বলেন, হ্যাঁ, আদিবাসী নামে আখ্যাত মুণ্ডারী জাতিও ভারতের বাইরে থেকে এসেছে। অতিদূর অতীতে অন্যান্য ভূখণ্ডের মত ভারতের মাটিতেও হয়তো একশ্রেণীর দ্বিপদ বৃক্ষচর প্রাণী নিতান্ত জন্তুদশা থেকে কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে নরদশা লাভ করেছিল। কিন্তু তার কোন বিশিষ্ট নিদর্শন আজ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়; যুগব্যাপী এক একটি বিরাট বংশপ্লাবনের ইতিহাসে সেই যথার্থ আদি ভারতীয়ের শোণিত একেবারে ধারা হারিয়ে ফেলেছে; সুতরাং আদিবাসী বলতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বরং বোঝায় বনিয়াদী অধিবাসী।

আর্যেরা পরে এলেও তাঁরাই ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাতা। পঞ্চসিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা ও নর্মদা, কাবেরীর উপত্যকা আর্য অভিযাত্রীর কাছে ছেড়ে দিয়ে আদি-বাসী দুর্গম গিরিকন্দরে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সুপ্রাচীনকালে আর্য ও অনার্যের রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষের পরিচয় পুরাণকারের লেখায় অবশ্যই কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সমন্বয়ের বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। রাজা রামচন্দ্রের কাহিনী থেকে নজীর তুলে অনেকে বলতে পারেন যে, সেই বিখ্যাত আর্য রাজা গুহক চণ্ডালকেও মিত্র করেছিলেন এবং হনুমানকেও একনিষ্ঠ সহায়ক বন্ধুরূপে আপন করে নিতে পেরেছিলেন কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায় যে, এক আর্য রাজা রাবণশাসিত এক অনার্য রাষ্ট্রশক্তিকে দমন করবার জন্যে হনুমান গুহক প্রভৃতি কয়েকটি অনার্য দলপতিকে মাত্র যুদ্ধ বন্ধুরূপে (Ally) গ্রহণ করেছিলেন। সেটা রাজনৈতিক সৌহার্দ্যমাত্র ছিল, সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য নয়। আর্যেরা সে দিনের অনার্যকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের মত সমান স্তরে টেনে তুলবার জন্য মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না, বরং এ বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট মনোবলের অভাব ও উদারতার কার্পণ্য ছিল। তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত একলব্যের কাহিনীর মধ্যে মর্মান্তিক ট্র্যাজিডিরূপে কীর্তিত হয়ে রয়েছে। ধনুর্বিদ আচার্য দ্রোণ একলব্যকে বিদ্যাদান করতে রাজী হননি। তবু একলব্য নিজের নিষ্ঠার জোরে এবং মনে মনে দ্রোণকেই গুরু বলে মেনে নিয়ে দ্রোণশিষ্য অর্জুনের চেয়ে দক্ষতর ধানুকী হয়ে উঠে। আর্য দ্রোণ তাঁর আর্যশিষ্য অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অটুট রাখার জন্য অনার্য একলব্যের কাছে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আদায় করে নিলেন। আর্য কূটনীতির জঘন্যতম দৃষ্টান্ত। এককথায়

বলতে পারা যায়, আচার্য দ্রোণ কৌশলে একলব্যকে চিরতরে পঙ্গু করে দিলেন।

একলব্যের বেদনা আজও আড়াই কোটি আদিবাসীর চিত্তের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে। আর্য ভারতের উপেক্ষায় ধিক্কৃত হয়ে ছায়াবৃত অরণ্যের আড়ালে আজও তারা বিদ্যাহীন নিঃস্ব জীবনের ভার বহন করে চলেছে। হাজার হাজার বছর পরে খৃস্টীয় বিংশ শতাব্দীতে আর্য ভারতের সৌহার্দ্যের আহ্বান মাত্র ক্ষীণস্বরে ঘোষিত হয়ে আদিবাসীদের কানে পৌছতে আরম্ভ করেছে। আদি-বাসীরা কেউ এ ডাকের অর্থ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না। অনেকেই সংশয় করে। কিন্তু বোধ হয়, ঠিক ডাকার মত ডাকতে পারা যাচ্ছে না। কেমন করে ডাকলে আড়াই কোটি বনিয়াদী ভারত-সন্তান সাড়া দিয়ে যুগব্যাপী সঙ্গোপনের বেড়া অতিক্রম করে বৃহৎ ভারতের জনতার উৎসব-অঙ্গনে মিলিত হতে পারবে, সেটাই আজকের দিনের সমস্যা। এটা হলো আদিবাসী-সমস্যা। ...এ পর্যন্ত যে সমস্ত মন্তব্য করা হলো, তার মধ্যে আর্য-ভারতের নিন্দার দিকটার কথা বেশী করে বলা হয়েছে। কিন্তু আর্য-ভারতের একটা বিশিষ্ট প্রশংসনীয় চরিত্রের কথা বলা হয়নি। আজ হাজার হাজার বছর ধরে আর্য ভারত ও আদিবাসী ভারত পাশাপাশিই। আর্য ভারত আভিজাত্যের কারণে আদিবাসীদের সংস্রব থেকে দূরে সরে আছে, কিন্তু এর মধ্যে হিংস্রতা নেই। আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় সভ্যের দল যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন, সেখানে আদিবাসী সমাজকে পাইকারী সংহারের দ্বারা ধ্বংস করতে তাঁরা একটুও দ্বিধা করেননি।...কিন্তু ভারতে একটা সভ্যতার পত্তন হবার পর অন্ততঃ বিগত পাঁচ ছয় হাজার বছরের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতি ঠিক এই ধরনের জহ্লাদী......হয়নি। এটা অবশ্যই ভারতীয় সভ্যতার একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। [৬৫] উধৃতি একটু দীর্ঘ হলেও, তুলে ধরলাম কারণ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষ ধারণা এর মধ্যে রয়েছে।

জাতি উপজাতিদের এই পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ অবস্থানের গৌরবের অধিকারী পার্বত্য ত্রিপুরাও। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য। ইহা অন্যতম উন্নয়নশীল পার্বত্যরাজ্য। বহুশত বৎসর ধরে এখানে বহুদলে বিভক্ত উপজাতি ও বাঙালীরা বসবাস করে আসছে। ঐতিহাসিক কারণে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর এ রাজ্যে পূর্ববাংলার বাঙালী জলস্রোতের মতো প্রবেশ করতে থাকে।

এরাজ্যের আদিবাসীদের সম্পর্কে গবেষকদের ধারণা "The various groups and sub-groups of tribals spread over the terrritorry have near identity in culture and social treats. Besides having similar ethnological featu es who are infact, extending from the northern spurs of patri to the southern tips of the china, hills of Burma, forms a single ethnical unit closely nit in race and culture The tribe that occupai it are the Kukies, the Chinees, the Luchis, the Lukhess, the hill Tiperas, the Chakmas and the Uogs' ৬৬

স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারি বিভিন্ন ধরণের উপজাতিরা একে অন্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরীরাই অধিক গুরুত্বের অধিকারী। অন্যদের পরবর্তী সময়ে আগত হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়।

এই রাজ্যের উপজাতিরা সরল ও শান্তিপ্রিয়। ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে বিভিন্নজাতির এরূপ সহ-অবস্থান দেখা যায় না। এই সম্পর্কে নীরা চ্যাটার্জীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "The uniquness of the situation here however lies in the fact that unlike in other contiguas hill areas in eastern India the tribal pupil of Tripura have come to be submerged in the jing mass of non-tribals leading to acculturation in a manner and on a scale which has few paralals in the country."৬৭

তবে উপজাতিদের শান্ত জীবনে কখনও কখনও বিদ্রোহের ঝড় ত্রিপুরার লালমাটিকে আরও লাল করেছে। এই বিদ্রোহ মূলতঃ রাজ্যলাভ ও সীমানা সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে। আবার উপজাতিদের নিজেদের অধিকার অর্জন ও বঞ্চনা অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দেয়।

*** উপজাতি জীবনে বিদ্রোহ ***

উপজাতিদের বিদ্রোহ—খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ। সমতল অঞ্চলের মানুষের কোন সাহায্য এর পেছনে ছিল না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী বিদ্রোহগুলিও এইরূপ।

কোল বিদ্রোহ

সিংভূমে কোলহান অঞ্চলে হো-রা বসবাস করে। হো-সমাজের অপর নাম লড়কা কোল। তারা কোন অঞ্চলের লোককেই তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে দেয় না। এই মানসিকতার বিরুদ্ধে ইংরেজ ১৮১৯ সালে প্রথম তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু হো-রা সম্পূর্ণ পরাজিত হয় নি। পরবর্ত্তী ১৮৩১ সালে আদিবাসী সমাজে বিদ্রোহের ঝড় দশদিক কম্পিত করে। এই বিদ্রোহ—কোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত। তীরধনু এবং কুঠারে সজ্জিত আদিবাসিরা অবশ্য বৃটিশের আধুনিক অস্ত্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

সাওতালদের শান্ত নিরাপদ ও সরল জীবনে ইংরেজ সৃষ্ট নূতন অর্থনৈতিক পন্থা ও শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য পরিণাম অনুসারে মহাজন ব্যবসায়ী ও মুদ্রার প্রচলন ঘটে। "মুদ্রা জিনিসটার রীতিনীতি ও চরিত্র সাঁওতালী মনের কাছে তখনও সম্পূর্ণ তাৎপর্য নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। দাদন বন্ধক নিলাম ঠিকা মজুরী ও সুদ তেজারতির জটিল অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পড়ে সাঁওতাল চাষীর শষ্য ও জমি ধীরে ধীরে পরহস্তগত হতে আরম্ভ করে। মহাজনী কারবারের লেনদেনের পরিণাম তারা বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু একদিন বুঝলো। একদিন দেখা গেল, তাদের সর্বস্ব পরের দখলে চলে গেছে। সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয় এবং সাঁওতালেরা মহাজনদের কাছে দাদন নেওয়া ঠিকা মজুর হিসাবে বাঁধা হয়ে থাকায়, রেলপথ তৈরীর কাজে নগদ মজুরী অর্জনটুকও ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৮৫৫ সালে বিদ্রোহ জেগে উঠে। সমস্ত সাঁওতাল একসঙ্গে বিদ্রোহ করে, ঘৃণ্য দিকু অর্থাৎ বিদেশীর যেকোন চিহ্ন লোপাট করে দেবার জন্য দিকে দিকে আক্রমণ করে। শুধু হিন্দুকে হত্যা নয়, কুঠিওয়ালা ও প্ল্যাণ্টার ইংরাজ নরনারীকেও হত্যা করা হতে থাকে। এরপর বৃটিশ ফৌজ আসে। ধনুর্ধর সাঁওতাল যোদ্ধার দল কামান ও রাইফেলের অগ্নিবর্ষণে ছিন্নভিন্ন হয়। এই সঙ্ঘর্ষে ১০ হাজার সাঁওতাল নিহত হয়।"
[সুবোধ ঘোষ ঃ ভারতের আদিবাসী ঃ পৃঃ ৪৪]

বৃটিশ রাজত্বের সূত্রপাতে এই সমস্ত আদিবাসী বা উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। রাজমহলের পাহাড়িয়াদের বিদ্রোহ

(১৭৭২ খ্রীঃ) ও এর অন্যতম। এছাড়া আসামের নাগাদের এবং মিজো বিদ্রোহ স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্ত্তী সময়ের বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

স্বাধীনতা আন্দোলনেও এদের ভূমিকা রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে স্বদেশ চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশীদার হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে—"১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রথম রাঁচীতে আসেন। হাজার হাজার 'টানা ভগত' আদিবাসী দূর দুর্গম গিরি উপত্যকার পল্লী থেকে অহিংস মহাপুরুষের দর্শনের জন্য উপস্থিত হয়। গান্ধীজীর বাণীর তাৎপর্য বুঝতে তাদের একটুও দেরী হয় নি, কারণ যাত্রাভগতের আদর্শ তাদের মন আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। গান্ধীবাণী শোনার পর টানা ভগতেরা আরও নৈষ্ঠিক অহিংস হয়ে উঠে। চরকার সুতো ও হাতে বোনা খদ্দর ছাড়া অন্য কোন বস্ত্র এরা আজও পরে না। অসহযোগ আন্দোলনে হাজার হাজার টানা ভগত আদিবাসী কারাবরণ করে। এদের শাস্তির মেয়াদও অন্যের তুলনায় দীর্ঘতর হয়েছিল। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে টানা ভগত আদিবাসীরা চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করে। গভর্নমেণ্ট হাজার হাজার টানা ভগতের জমিও অস্থাবর নিলামে চড়িয়ে দেয়, তবু এদের সংগ্রামী উৎসাহ নিষ্প্রভ হয়নি।

হাজারিবাগের গুমিয়া থানা ও পরেশনাথ পাহাড় এলাকায় সাঁওতালদের মধ্যে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন খুব প্রসার লাভ করে। বহু সত্যাগ্রহে সাঁওতালরা কারাবরণ করে।

ভীলেরা এবং মধ্যপ্রদেশের গন্ধ সমাজও জাতীয় সংগ্রামে ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করে। নাগপুরের 'পতাকা সত্যাগ্রহে' বহু আদিবাসী যোগ দিয়েছিল।.. ভারতের প্রায় সমস্ত বিশিষ্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের সাড়া কিছু না কিছু উদ্যম সঞ্চার করেছিল।"[৬৮]

ত্রিপুরার ইতিহাস তার ঘন সবুজ বন আর পাহাড়ের মতই আমাদের কাছে আজও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থে গতানুগতিক ধারায় রাজাদের কাহিনীই বিবৃত। জনগণের জীবন স্বরূপ নিয়ে যে আলোচনা—যে ইতিহাস তা সেখানে নেই। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, তার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা ও সমাধানের পদ্ধতি আমাদের অজানা। জনমনের পরিচয় না পেলে—গণচেতনার রূপটি পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় না। 'রাজমালা' ইত্যাদি গ্রন্থে সিংহাসন কেন্দ্রিক ইতিহাস, সেখানে জনগণের রাজভক্তি

এবং অন্যথায় কঠোর শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু রাজভক্তি বেন ভক্তের মনে স্থায়ী হয় না—কেন বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে, তার উত্তর নেই।

ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের ইতিহাস আছে। ছোট ছোট অনেক বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় দেশে চরমভক্তির যুগেও গণ-বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের মধ্যে রিয়াং অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী। কোন কোন গবেষক মনে করেন রিয়াং নামের মধ্যেই বিদ্রোহের সুর আছে। রিয়াংদের মধ্যে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী অনুসারে দেখা যায় তারা চট্টগ্রামের মায়াথ্লাং গ্রামে বাস করত। তাদের পৃথক রাজা ছিল। সম্ভবতঃ তারা ত্রিপুরার মহারাজার অধীনে বসবাস করত। রাজা ত্রিপুর খুব অত্যাচারী ছিলেন। রাজমালাতেও উল্লেখ আছে তিনি প্রজাপালন অপেক্ষা নিজের বিলাসের প্রতি অধিক আসক্ত ছিলেন। "রাজার এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রামে বসবাসকারী দলের প্রধান যদি নিজের দলের লোকদের নিয়ে পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা করে নিজেকে রাজা বলে প্রচার করে তাতে অসম্ভবের কিছু নেই। রাজা ত্রিপুরের লোক রাজকর আদায়ের জন্যে দলের প্রধানদের কাছে যখন উপস্থিত হল তখনই তাদের বিদ্রোহী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। তখন হয়ত দলের প্রধান বলে দিয়েছে 'আ-রিয়া' বা "রিয়া-আং' (আমি দেব না) অর্থাৎ আমি রাজকর দেব না। এ থেকে হয়ত তাদের পরিচিতি হয়েছে রিয়াং। এখন কথা রাজা ত্রিপুরের অত্যাচারে প্রজারা যেখানে ভীত সেখানে এভাবে কর দেব না বলার সাহস কি কোন দলের পক্ষে সম্ভব? অত্যাচার যখন মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে তখন কোন না কোন দলের পক্ষে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। রাজমালাতেও এ সম্পর্কে একটা ক্ষীণ আলোকপাত করা হয়েছে। রাজমালাতেও এ সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে অত্যাচারী রাজা ত্রিপুর যখন অরণ্যে শিকারে গিয়েছিলেন তখন হয়ত প্রজাদের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। এরকম যখন রাজ্যের অবস্থা তখন একটা বিদ্রোহী দলের উদ্ভব অসম্ভব নয় এবং সে দলটি রিয়াং নামে পৃথক সম্প্রদায় বা জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকলে অসম্ভবের কিছু নেই। সে সময় থেকেই হয়ত তারা রিয়াং নামে নিজেদের পৃথক সম্প্রদায় বা জাতি হিসেবে পরিচিতি বহন করে আসছে। নিজেদের সমাজ বা গোষ্ঠী থেকে পৃথক হয়ে পৃথক একটা সম্প্রদায় বা জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের মধ্যেও

একটা বিপ্লবী চেতনার আভাস পাওয়া যায়। সেই বিপ্লবী রক্তের ধারা যে তাদের মধ্যে আছে তার পরিচয় বর্ত্তমানেও বিরল নয়।[৬৯] পরবর্ত্তী সময়ের রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ তার প্রমাণ।

এছাড়া কুকিদের বিদ্রোহও উল্লেখযোগ্য। এদের বিদ্রোহ শুধু রাজশক্তির বিরুদ্ধে নয়। কখনও কখনও এরা সমতলবাসীদের উপরও অত্যাচার করেছিল।

"ত্রিপুরারাজ্যের প্রজাদের মধ্যে কুকিরাই সবচেয়ে বেশী দুর্দান্ত ও সমরপ্রিয় উপজাতি। তাদের সমাজব্যবস্থাও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী। তাদের মধ্যে খুচুং, লুচি (লুসাই), কবরঙ্গ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় আছে।...ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কুকি প্রদেশের থানাংচি দুর্গ জয় করেন। তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যভুক্ত অধিকাংশ কুকিরা ত্রিপুরার জঠরে এক দুষ্পাচ্য বস্তুর মতো নানা সময়ে গোলযোগের সৃষ্টি করেছে।...১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ কৃষ্ণমণি মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও রাজধানী উদয়পুর থেকে আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন। সে সময়েও আবার কয়েক সম্প্রদায়ের কুকিরা বিদ্রোহ করে। গোবর্ধন ঠাকুর ও ভদ্রমণি সেনাপতি ঐ বিদ্রোহ দমন করেন।...

...ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে বৃটিশ সাহায্য ব্যতিরেকে মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য সহ ত্রিপুর রাজবংশ ইহাদের দ্বারা নিহত হইত এবং ত্রিপুরার ইতিহাস ভিন্নধারায় প্রবাহিত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এদের দৌরাত্ম্য প্রবল ছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২১/২২ জানুয়ারী এবং ২রা মার্চ কুকিরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থান আক্রমণ করে। গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও নরহত্যা সাধন করে। অবশেষে শাসকগণ এক বৃহৎ কুকি অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে লুসাই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করেন।

...ত্রিপুরার পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায় যোদ্ধৃজাতি ছিল। এরা আগে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে কাজ করতো। এদের দিয়ে গঠিত সেনাদলকে জমাৎ বলা হোত, এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম জমাতিয়া, এরা যোদ্ধৃজাতি হলেও শান্তিপ্রিয়, কিন্তু কোনদিনই নীরবে অত্যাচার সহ্য করত না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াখিরায় হাজারী নামে একজন কর্মচারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জমাতিয়ারা বিদ্রোহী হয়। তখন বীরচন্দ্রের শাসন আরম্ভ হয়েছে। ব্রজমোহন ঠাকুর শাসন কাজ চালাচ্ছেন। প্রথমে যে সৈন্যদল

জমাতিয়াদের বিরুদ্ধে পাঠান হয়, তারা বিদ্রোহ দমন করতে পারেনি। শেষে ডার্লং সম্প্রদায়ের কুকিদের পাঠানো হয়। তারা বহু জমাতিয়াকে হত্যা করে এই বিদ্রোহ দমন করে এবং জমাতিয়াদের সর্দার পরীক্ষিৎকে ধরে আনে। নিহত জমাতিয়াদের দু'শ'র বেশী কাটা মাথা বাঁশের মাথায় গেঁথে রাজধানী আগরতলায় প্রকাশ্য রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ..বিদ্রোহের নেতা পরীক্ষিত ক্ষমা করেছিলেন কারণ এই বিদ্রোহ রাজদ্রোহিতামূলক ছিল না, অত্যাচারী রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধেই এই অভ্যুত্থান।[৭০]

এছাড়া সমশের গাজীর বিদ্রোহও ত্রিপুরার মহারাজার বিরুদ্ধে ছিল। সেই বিদ্রোহে উপজাতিদের নেতৃত্বে না হলেও নিশ্চতই নিপীড়িত উপজাতিদের সহযোগিতায় সমশের গাজী সাফল্য অর্জন করেন। ত্রিপুরার সিংহাসনেও সমশের গাজী আরোহণ করেননি—ত্রিপুরারই অন্যতম রাজবংশধর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ১৯৪৮ সালের গণমুক্তি পরিষদের বিদ্রোহ উল্লেখের দাবী রাখে। কারণ, উপজাতি জীবনের বঞ্চনার অবসানের জন্য এই সব বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

ত্রিপুরার উপজাতিদের সর্বশেষ বিদ্রোহের ইতিহাস রচিত হলো—বেদনাদায়ক ও লজ্জাজনক ঘটনার মধ্য দিয়ে—১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা যার পরিণতি। এই দাঙ্গায় প্রায় ১৪০০ জন জাতি উপজাতির মানুষ খুন হলেন।

এর কিছুদিন আগে থেকেই উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহভাব লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু এই বিদ্রোহের রূপ ছিল বরাবরই সাম্প্রদায়িক। কোন অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিংবা কোন সুস্থ ব্যবস্থা স্থাপন নয়—Son of the Xoil প্রায় এই শ্লোগানকে অবলম্বন করেই তাদের আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। বর্ত্তমানেও T. N. V. (Tripura National Volunteers) নাম গ্রহণ করে ওরা যথেচ্ছ খুন, লুটপাট করছে। বর্ত্তমান এই ধরণের কার্যকলাপ উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদ ছাড়া কিছু নয়। ত্রিপুরায় এই ধরণের উগ্রপন্থী কার্যকলাপেরও কিছু পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে।

ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতে বিশেষ করে নাগা, মিজো ও বর্ত্তমান আসামের

কয়েকটি আদিবাসী জাতি গোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। "... ......দুই দশকের বেশী সময় ধরে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য এক যুদ্ধক্ষেত্র ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে আদিবাসীদের একটি জঙ্গী অংশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ হচ্ছে তাও আজকে গোপন নয়। সুতরাং আজকে আদিবাসীদের একটি ক্ষুদ্র জঙ্গী অংশের আন্দোলন যে জাতি সত্বা বিকাশের আন্দোলন নয়, সেটা আর কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না বরং এদের আন্দোলন আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হঠকারী আন্দোলন বলেই স্বীকৃত হচ্ছে।

বর্ত্তমানে ত্রিপুরার উপজাতিদের একটা অংশ (যাঁরা উগ্রপন্থী নামে অভিহিত হচ্ছে) কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সমগ্র উঃ পূঃ ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক আন্দোলনেরই এক অভিন্ন পরিকল্পনা।"[৭১]

ভারতের স্বাধীনতার পর তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে এ রাজ্যের পশ্চাদ্‌পদ উপজাতিদের বিশেষ জমি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে বেড়ে যায়। ক্রমশঃ জমি হারানোর আশঙ্কা থেকে এবং বাঙালী উদ্বাস্তুদের বিপুল আগমন উপজাতিদের এক অংশ উগ্রজাতীয়-তাবোধের শিকার হয়। ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (State Reorganisation Commission) গঠিত হয়। এই কমিশন ত্রিপুরা রাজ্যকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব রাখে। উগ্রজাতীয়তাবাদী অংশ যা Tribal Union নামে পরিচিত ছিল—তারা এই প্রস্তাব সমর্থন জানায়। কারণ এতে সামগ্রিক ভাবে উপজাতি অংশের মানুষ সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে উগ্র-বাঙালীরা ত্রিপুরা ও কাছাড়কে একত্র করে স্বতন্ত্র পূর্বাচলের প্রস্তাব রাখে—যাতে বাঙালীয়ানার প্রাধান্য পাবে। অন্যদিকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের আলাদা অস্তিত্বের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করে। বলা বাহুল্য ত্রিপুরার আলাদা মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। তারপর "সেংক্রাক নামে একটি গোপন উপজাতি সংগঠন সে সময়ে আত্মপ্রকাশ, করে এদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য দলিল নেই। তবে এরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী একটি হঠকারী গোপন সংগঠন যার পেছনে রয়েছিল বিভেদকারী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের গোপন হাত। এই সেংক্রাক বাহিনী ক্রমে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে

এবং ট্রাইবেল ইউনিয়নের সঙ্গে আঁতাত করে উদ্বাস্তু প্রবেশে বিরোধীতা এবং উপজাতি জনমনে বাঙালী বিদ্বেষ ছড়ানো এবং তার সঙ্গে আবশ্যিকভাবে কমিউনিজমকে বিরোধীতা করা ইত্যাদি এই সমস্ত কাজই ছিল এদের একমাত্র মুখ্য ভূমিকা। এদের প্রধান রাজনৈতিক দাবী ছিল আসামের সঙ্গে অক্ষত বর্ত্তমান মেঘালয় মিজোরাম ও অরুণাচলের (নেফা) সঙ্গে ত্রিপুরাকে যুক্ত করে একটা স্বতন্ত্র পাহাড়ী রাজ (Tribal State) গঠন করা। এ দাবী সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের (নাগাল্যাণ্ড ব্যতীত) উপজাতি নেতৃবৃন্দের সংগঠিত রাজনৈতিক যৌথ দাবী। পরে ত্রিপুরার ট্রাইবেল ইউনিয়নের সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ে।"[১২] এর বিশেষ কারণ এই সংগঠনের মুখ্যনেতা কংগ্রেসে যোগদান করেন। ইতিহাসের বিচিত্র খেলায় পরবর্ত্তী সময়ে তিনি 'আমরা বাঙালী' দলেরও নেতৃত্ব করেন।

পরবর্ত্তী সময়ে "...হতাশগ্রস্ত কিছু নেতৃবৃন্দ উপজাতি শাসকশ্রেণীর মদতে পুষ্ট কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত উপজাতিদের সঙ্গে গঠন করল ১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি। যে সময়ে উপজাতি যুব সমিতি গঠিত হল সে সময়ে উপজাতিরা শুধু সংখ্যালঘুতেই পরিণত হয়নি, বরং অসম প্রতিযোগিতার মুখে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই পিছু হটতে হচ্ছে। কংগ্রেসীদের অনুসৃত নীতি ছিল উপজাতি স্বার্থের বিরুদ্ধে। জায়গাজমি বা ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদকৃত হয়ে অসংখ্য উপজাতি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে সুদূর বিধ্বস্ত অঞ্চলে। এদের জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের সকল দাবীগুলি কংগ্রেস সরকার শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, প্রত্যক্ষভাবে এগুলোকে বিরোধীতাও করেছিল। কংগ্রেস সরকার সে সময়ে লোক দেখানোভাবে উপজাতি জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেও তার বাস্তব মূল্য ছিল না। এদিকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসিনের নামে উপজাতি এলাকায় উচ্ছেদকরণ চলতে থাকে। সংবিধানের ৫ম তফশীল চালু করার দাবী তখন উপেক্ষিত হয় এবং পরোক্ষ সম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে বাঙালী উপজাতি সম্প্রীতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চলে। ঠিক সেই নিদারুণ পরিস্থিতিতে শিক্ষিত উপজাতি যুবকদের মধ্যে দেখা দেয় নৈরাশ্য আর দারুণ বিক্ষোভ, যার থেকে এক অংশ উগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যোগদান করে উপজাতি যুবসমিতি সংগঠনে। এদের নেতৃত্বের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে খ্রীশ্চিয়ান মিশনারীদের শিক্ষা আর সংস্কৃতি, ফলে এরা আসাম, মেঘালয় ও মিজোরামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার প্রেরণা লাভ করে। মিশনারীদের

প্রচেষ্টায় উপজাতি যুবসমিতির বৃহদাংশ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে অভিযান চালাবার কর্মসূচী গ্রহণ করে। উপজাতি যুবসমিতি ৬০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ৭০ এর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত নিজেকে ব্যাপৃত করেছে নিজস্ব রাজনৈতিক গণভিত তৈরী করার কাজে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই সমিতি তার রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করার সুযোগ লাভ করে কংগ্রেসী ও অন্যান্য বিভিন্ন শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যে।"[৭৩]

১৯৭৮ সালে মার্চ মাসে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় তৈদুতে ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের কিছু পরে এই বৎসরের শেষাংশে বিজয় রাংখলের নেতৃত্বে টি. এন ভি. গঠিত হয়। বিজয় রাংখল ইতিপূর্বে যুবসমিতির স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর 'ত্রিপুর সেনার' সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর থেকে ৭৮ জনের একটা দল নিয়ে টি. এন. ভি.-র সূত্রপাত। টি. এন. ভি. সদস্যরা প্রথম আক্রমণ চালায় ১৯৭৯ এর আগস্ট মাসে। তাদের আক্রমণ স্থল ছিল অমরপুর। তারপর তারা বহু আক্রমণ চালিয়েছে। ১৯৮২ ইংরেজীর ১০ নভেম্বর বিজয় রাংখলকে 'রাষ্ট্রপতি' করে পার্বত্য চট্টগ্রামে টি. এন. ভি. সরকার গঠিত হয়। বিজয় রাংখল এখনও চট্টগ্রামে আছেন।

উপজাতিদের সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে উপজাতি সংরক্ষণ অঞ্চল (Tribal Reserve) গঠন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে (১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ) এবং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দ) দুটি পৃথক আদেশ বলে মহারাজ উপজাতি সংরক্ষিত অঞ্চল গঠন করেন। এই ব্যবস্থায় মাত্র পাঁচটি উপজাতির স্বার্থ রক্ষা হয়। এরা হলো—পুরাণ ত্রিপুরা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং এবং হালাম। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল ছিল ২৮৪ ৯ বর্গ কিলোমিটার। পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৪৩ সালে একে আরো বাড়িয়ে ৫০৫০·৫ বর্গ কিলোমিটার করা যায়। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৪৮ সালে তৎকালীন মাতা মহারাণী রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য ৭৭৭ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল উপজাতি সংরক্ষিত অঞ্চলের বাইরে নিয়ে আসেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে—উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বাধীনতা পরবর্ত্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উপজাতিদের বৃহৎ অংশ অ-উপজাতি অংশেরও সমর্থন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেন। বিশেষভাবে

সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফশীল মোতাবেক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন নিয়ে আন্দোলন চলে। কিন্তু সংশোধনের প্রশ্নে জটিলতা থাকায় প্রথমে ১৯৭৯ সালে ত্রিপুরায় ৭ম তফশীল অনুসরণে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১লা ১৯৮৫ইং তে ৬ষ্ঠ তফশীল অনুসারে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয় এবং গত ৩০শে জুন ১৯৮৫ সালে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট এই পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭৯ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য ত্রিপুরা বিধানসভায় যে বিল আনয়ণ করা হয় তার সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব পেশ করেন—সেই প্রস্তাবের কিছু অংশ প্রাসঙ্গিক মনে করে তুলে ধরলাম।"...... ঐতিহাসিক কারণে যে রাজ্যে উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তাঁরা আজকে সেখানে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। একটা সামন্ততান্ত্রিক শাসন এখানে ছিল যার ফলে এই রাজ্যের জনসাধারণ কোনরকম একটা উন্নতি করার সুযোগ পাননি। এখানে অধিকাংশ উপজাতি অত্যন্ত পেছনে পড়ে আছেন এবং তাদের উৎপাদন পদ্ধতিরও উন্নতি হয়নি। পাকিস্তানে যতটুকু রেল ছিল এই রাজ্য তার উপরই নির্ভরশীল ছিল এবং তার একমাত্র যোগাযোগ ছিল এই রেল। এই রকম একটা পশ্চাদ্‌পদ উপজাতি জনসাধারণের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা দলে দলে এখানে আসেন। তখনকার কংগ্রেস সরকারের উচিৎ ছিল এই উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া। এখানে শিল্প গড়ে, রেল এনে এটা তাঁরা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করার ফলে এখানে উপজাতিদের যে সমস্ত জমি মহারাজার আমলে ট্রাইবেল রিজার্ভ বলে ঘোষিত ছিল সেই সমস্ত জমিও উদ্বাস্তুরা দখল করে নিলেন। অনেক ক্ষেত্রেতো সেই ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডারকে লংঘন করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ১৯৬২ সনে জরিপের কাজ যখন আরম্ভ হয় তখন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী জরিপ বিভাগকে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভকে অগ্রাহ্য করে উদ্বাস্তুদের নামে সেখানে জমি রেকর্ড করতে নির্দেশ দেন। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই উপজাতিরা যাঁরা লেখাপড়া জানেন না, যাঁরা সরকারী কাজে যোগদান করতে পারেননি, ব্যবসা বাণিজ্য যাদের নেই বললেও চলে, তারা যে সমস্ত ভাল জমিতে চাষবাস করতেন, তাও উদ্বাস্তুদের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। ফলে উপজাতিরা আরো আরো গভীর জংগলে যেতে বাধ্য হয়। এইভাবে হাজার হাজার জমি বে-আইনী ভাবে অ-উপজাতিদের হাতে চলে গেছে। এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আর যাতে যেতে না হয়, সে

আওয়াজ গণতান্ত্রিক শক্তি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের পক্ষ থেকে তোলা হয়। ১৯৫৪ সালে গোবিন্দ বল্লভ যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন তখন বলেছিলেন যে, এই রাজ্যে আর বাঙালী আনা ঠিক নয়। দেবর কমিশন রায় দিয়েছিলেন যে, ত্রিপুরাতে আর উদ্বাস্তু বাঙালী আনা ঠিক হবে না। তারপরও উদ্বাস্তুরা আসতে থাকলে উপজাতিরা আরো কোনঠাসা হয়ে যান। তখন তাদের রক্ষা কবচ কি হতে পারে। তাদের যেটুকু জমি ছিল তাও উপজাতিদের হাতে যাতে বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত না হয় এবং উপজাতিগণ যাতে তাদের বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পেতে পারেন এবং যাতে তাদের জন্য একটা এলাকা সিডিউল করে দেওয়া যায় তার জন্য প্রথমে ৫ম এবং পরে ৬ষ্ঠ তপশীলের দাবী সোচ্চার হয়। হনুমন্তিয়া কমিশন তাদের রিপোর্টে বলেছিলেন যে ত্রিপুরাতে একটা ট্রাইবেল কমিটি করে দেওয়া যায়, যে কমিটির হাতে গঠনমূলক এবং অন্যান্য দায়িত্ব থাকবে এবং তাহলে পরে উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে। এই সমস্ত সুপারিশের ভিত্তিতে বামফ্রন্ট নির্বাচনের সময় যে ৪ দফা দাবী রেখেছিলেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। ১৯৭৪ সালে ইমার্জেন্সীর ঠিক আগে সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করা দূরের কথা মহারাজার আমলে যেটুকু রিজার্ভ ছিল তা' তুলে দিলেন। তার ফলে সমস্ত রিজার্ভটা যারা নন্-ট্রাইবেল তাদের কাছে বেচা বিক্রী করার জন্য তুলে দেওয়া হয়। তাতে সংখ্যালঘু উপজাতি এবং গণতান্ত্রিক জনসাধারণ যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ হয়।......আজকে যখন আমরা বিলটি উপস্থিত করেছি, তখন এটা উপস্থিত করার সময়ে আমরা প্রথমে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম—সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীল সংশোধিত করে যাতে এখানে চালু করা যায় তার জন্য।...যখন কেন্দ্রীয় সরকার ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করতে রাজী হলেন না, তখন আমরা বামফ্রন্ট বসে ঠিক করলাম যে, আমাদের বিধানসভার যতটুকু ক্ষমতা আছে সেটা আমরা ব্যবহার করে, ৬ষ্ঠ তপশীলের যে সমস্ত প্রভিশন বা ব্যবস্থা আছে সেটা একটা বিলে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব এবং বিধানসভায় আইন পাশ করে স্ব-শাসিত ট্রাইবেল জেলা গঠন করব। আমরা হাইকোর্টের যে সমস্ত এডভোকেট রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে যতখানি সম্ভব ৬ষ্ঠ তপশীলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ষ্টেট ইচ্ছা করলে লোকাল অথরিটি ক্রিয়েট করতে পারবেন, সেই প্রভিশানের ক্ষমতা নিয়ে—সংবিধানের ক্ষমতা নিয়ে আমরা বিলটি উপস্থিত করছি।...ট্রাইবেলদের জন্য

কেন আলাদা বন্দোবস্ত করতে হবে। ট্রাইবেলদের নিজস্ব জাতিস্বত্তা আছে, তাদের মাতৃভাষার অধিকার আছে, তাদের খাওয়ার আলাদা অভ্যাস আছে এবং তাদের পোষাকও আলাদা আছে। তাদের গান, তাদের নাচ এবং তাদের শিক্ষার আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। তাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ দিতে হবে। তার জীবনধারনের গতি, তাদের অর্থনীতির মধ্যে নিজেদের জীবনের বৈচিত্র্য স্বীকার করতে হবে। কারণ কোনজাতির বাস্তব সত্তাকে কেহ গ্রাস করে ফেলতে পারে না। গণতন্ত্রের নিয়ম হচ্ছে, কোন জাতি যদি অল্প হয় তাহলেও তার নিজের ভাষা এবং নিজের জীবনধারণের অধিকার আছে। অনেক বাঙালী মনে করছেন যে, উপজাতিরা আসার পর এরাজ্যের ইতিহাস তৈরী হয়েছে। আমি বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকদের অনুরোধ করছি এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর প্রচারকে কেন্দ্র করে তারা যেন বিভ্রান্ত না হোন।···আমাদের বুঝতে হবে যদি আমরা বুঝবার চেষ্টা করি তাহলে সহজেই বুঝব যে, উপজাতিরা হচ্ছেন সংখ্যালঘু এবং বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। দুর্বল বলছি এই কারণে যে তাঁরা বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল। সম্পত্তিতে দুর্বল, অর্থাৎ সমস্ত কিছুতেই দুর্বল। সেই দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য যে সুযোগ-সুবিধা অনেক আগে তাঁদের পাওয়া উচিৎ ছিল কিন্তু সেটা তাঁরা পাননি, তাই আজকে বামফ্রন্ট সরকার সেটা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাতে হিংসা করার কিছু নেই, বরং সেটাকে সাহায্য করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।"

বস্তুতঃ আরো পরবর্তী সময়ে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হওয়ার ফলে উপজাতিদের ব্যাপক অংশের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণ হয়। অন্যদিকে টি. এন. ভি-সদস্যদের আত্মসমর্পণ চললেও অনেকের এই অরণ্যের বিদ্রোহ এখনও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমক ও মৃত্যুর আতঙ্ক নিয়ে জেগে আছে।

উপজাতি জন-জীবন

এই রাজ্যে উপজাতির মোট সংখ্যা ৫,৮৩ ৯২০ জন (১৯৮১ সেন্সাস)। ত্রিপুরার উনিশটি উপজাতিকে উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে আঠারটি তালিকাভুক্ত, এরা হলেন—ত্রিপুরী, রিয়াং, চাকমা, জমাতিয়া, হালাম, মগ, নোয়াতিয়া, ভিল, ভুটিয়া, গারো, খাসিয়া, কুকি, লেপচা, লুসাই, মুণ্ডা, ওরাং, সাঁওতাল ও উচাই।

ত্রিপুরী ঃ এই রাজ্যে ত্রিপুরীরা খুব প্রভাবশালী ও সংখ্যায়ও

উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এদের সংখ্যা ২৫,০৩৮২ জন (১৯৭১ লোকগণনা)। তাঁরা দেববর্মা এবং ক্ষত্রিয় হিসাবেই বিশেষ পরিচিত।

"The puran Tripuris which include Deb Barman are numerically more predominant than the other Tribes The Tripuris sub-divided into different groups more or less according to their vocation, relaled to duties to the throne There are 12 (twelve) Hadas or Haddas as these fol'ows (1) Bachhal (2) Sink (3 Koatia (4) Daityasing (5) Hujuria (6) Silatia (7) Apiya (8) Chhatra tulya (9) Deorai or Galim (10) Subenarayan (11) Sena and (12) Julai.

Now a-days classification of the Hudas excepting perhaps Galim are disappearing due to loss of princely state.

The Julais are also sub-divided into eleven sub groups depending on their work in a household. Such as (1) Das paiya—Vendor of vegetatables (2) Manaroi—abrid catcher (3) Totarai (4) Maniplaksa (5) Maichha' plaksa (6) Golchhari (7) Chelargvai (8) Matharai (9) Ad ai (10) Jitorai (11) Suikasa."

সমতলবাসী ভিন্ন অন্যরা টংঘরে বাস করে। তারা সাধারণতঃ ৮-১০ পরিবার কিংবা আরো অধিক পরিবার একত্রে বাস করে। এই স্থানকে পাড়া বা পাঞ্জি বলে। সাধারণতঃ কোন সর্দারের নামানুসরে এই নামকরণ হয়।

পর্বতবাসীরা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। এরা ধান, পাট, তিল ও নানা শাকসব্জী উৎপাদন করে। মদ অন্যতম প্রিয় খাদ্য। (They are very fond of drink and practically each household brew their own requirement of both Arak-distilled and pachchuas fermented drinks):

তাদের মধ্যে দু' ধরনের বিবাহ রীতি আছে, যথা—হিক-না-মানি এবং কাইজাগ-মানি। প্রথম পদ্ধতিতে পাত্র পাত্রী উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পিতা-মাতার উদ্যোগেই বিবাহ কার্য নিষ্পন্ন

হয়। কিছুকাল পূর্বেও 'জামাই উঠা' পদ্ধতিতে বিবাহ নিষ্পন্ন হতো। এই পদ্ধতিতে পাত্র ভাবী শ্বশুরবাড়ীতে বিয়ের ২।৩ দিন পূর্বে এসে কৃষি কাজে সাহায্য করতো। যদি কোন কারণে বিবাহ না হতো—তবে ঐ সময়ের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হতো। বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলন আছে।

নিজেদের তাঁতে তৈরী বস্ত্রই প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়। তাদের কাপড় পাছড়া নামে পরিচিত। বক্ষাবরণীকে রিয়া বা রিছা বলা হয়। ত্রিপুরী মহিলারা খুব অলংকার প্রিয়। বনের নানারকম ফুল ছাড়াও প্রধানতঃ রূপার নানা রকম অলংকার ব্যবহার করা হয়। রূপার মুদ্রা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হার (রামকলা) অন্যতম উল্লেখযোগ্য অলংকার। তারা সাধারণত (১) ওয়াখুম (২) তৈয়া (৩) ধেরী (৪) রাংটাং (৫) হাসলি (৬) কাল্থি (৭) মালা (৮) কাসর (৯) চুরি (১০) যসিতম (১১) খাড়ু ইত্যাদি অলংকার ব্যবহার করে।

এরা মূলতঃ হিন্দু। কিন্তু অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পূজারও প্রচলন আছে। কের, খার্চি প্রভৃতি পূজা প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এছাড়া তাদের মধ্যে প্রচলিত তুইবুক মা কিংবা তুইমা পূজা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই পূজা আসলে জলদেবী বা মা গঙ্গার পূজা (Mother goddess Ganges). এই মাতৃদেবী এমন একজন দেবী যিনি সমস্ত জীব ও জগতের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ। তিনি উৎপাদন ও উর্বরতার সঙ্গেও যুক্ত। তিনি জলেস্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র আছেন। "পৃথিবীর সব আদিম সমাজের মতো টিপরাদেরও ধারণা যে পবিত্র জল থেকেই জীব জগতের উদ্ভব; অতএব জলের অন্তরালের পালয়িনী ও রক্ষায়িনী মাতৃদেবীর পূজা অতি অবশ্যই কর্ত্তব্য। টিপরাগণ হিন্দু ভাবাপন্ন হওয়ার পূর্ব্ব থেকেই তুইবুক মা বা তুই মা পূজা করে আসছে। নির্দিষ্ট দিনে নদীর ঘাটে জীববলি ও প্রার্থনার মাধ্যমে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জলদেবীর নামে যে সব জীব উৎসর্গ করা হয়, তন্মধ্যে মুরগী, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি প্রধান। তুইবুক মা পূজায় শূকর বলি দেওয়া নিষিদ্ধ। এই পূজার অন্তরালে এই বিশ্বাস নিহিত যে, এতে মা গঙ্গা তুষ্ট হয়ে থাকবেন; ফলে পানীয় জলের ঘাটতি হবে না এবং জীবজগৎ রক্ষা পাবে।

…রোগ-ব্যাধি, মহামারী ইত্যাদি থেকে রক্ষাকল্পে টিপরা সমাজ কের পূজা ও খরাংগমা-খরাংগসা পূজা প্রতিপালন করে। গ্রামের সবাই চাঁদা তুলে কের পূজা সম্পন্ন করে এবং এই পূজায় কমপক্ষে একুশটি মুরগী এবং একটি ছাগল

উৎসর্গ করতে হয়। কের পূজায় টিপরাদের সবগুলো জাতীয় দেবদেবীই শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু খরাংগমা-খরাংগসা পূজা অনুষ্ঠিত হয় 'বোরোই সিনি' বা সাত ভগ্নীর নামে। এই সাত ভগ্নী হলেন ছলংগতাই (নির্বুদ্ধিতা থেকে রক্ষাকারী দেবী), মালাংগতুই (বোকামী থেকে রক্ষাকারী দেবী) মোগজাকবী (লোভ থেকে রক্ষাকারী দেবী), সাকজাকবী (হটকারিতা থেকে রক্ষাকারী দেবী), বাইবারী (গঞ্জনা থেকে রক্ষাকারী দেবী), খাহ্মালী (সহজভাবে বোঝানোর দেবী) এবং হমালী (অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী দেবী)। এই সাত ভগ্নীর নামে অন্ততঃ সাতটি মুরগী উৎসর্গ করতে হয় এবং একটি ছাগল চোখ এবং পা বেঁধে নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করে পূজার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।"[৭৫] এছাড়া শষ্য দেবী মাইলুংমা, কার্পাস দেবী খুলুমরু, বনদেবী হাকামা ভাগ্য বা লক্ষ্মী বিশর্চিন শামুংগ-র পূজা করা হয়।

মৃত্যুর পর মৃতদেহকে ত্রিপুরীরা দাহ করে। দাহস্থান বা শ্মশানে একটি তুলসীগাছ রোপন করা হয় এবং মৃতের উদ্দেশ্যে সেখানে একটি প্রদীপ জ্বালা হয় ও সাতদিন ধরে রান্না করা ভাত ও মাংস রাখা হয়।

রিয়াং ঃ এরা সাবরুম এবং সোনামুড়া ব্যতীত ত্রিপুরার প্রায় সব মহকুমায় বসবাস করে। এদের সংখ্যা ৬৪,৭২২ জন (১৯৭১ সালে লোক গণণা)।

এরা প্রথমে চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিল, পরবর্ত্তী সময়ে মগদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ত্রিপুরায় আসে। গোমতী নদীর উৎসস্থলের নিকটে মাইনি পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় নেয়। রত্নমাণিক্যের সময় এরা ত্রিপুরার রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। সৈনিক হিসাবে এদেরও খ্যাতি আছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে রিয়াং জাতীয় রায় কাচাগ ও রায় কছম নামে সেনাপতিদ্বয় কর্ত্তৃক বাংলার শাসনকর্ত্তা হোসেন শাহ পরাজিত হন। হোসেন শাহ থেকে অধিকৃত কামান আজও আগরতলা শহরের কামান চৌমুহাণীতে দেখা যায়।

কেউ কেউ মনে করেন রিয়াংরা ত্রিপুরীদেরই একটি অংশ। কর্মভিত্তিক আলাদা নামকরণ হয়েছে। "ত্রিপুররাজ রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দলের লোকদের কর্মভিত্তিক বিভিন্নভাগে ভাগ করে সে অনুযায়ী নামও দিয়েছেন। তাহলে বলা যায় যে, এই বিভক্ত দলের একটি দল হল রিয়াং। কিন্তু 'রিয়াং' নাম কেন হল? কেউ কেউ বলেন (কর্মভিত্তিক দলের নাম-

করণের সপক্ষে) বয়ন শিল্পে রিয়াংগণ ছিল অত্যন্ত পারদর্শী সে কারণেই এ দলের দায়িত্ব ছিল রাজার কাপড় সরবরাহ করা। একদা হয়ত তারা কাপড় তৈরী করে নিয়ে এসেছে রাজার কাছে, রাজা হয়ত জানতে চেয়েছেন সে কে ? এবং কি চায় ? উত্তরে আগন্তুক হয়তো বলেছে রি-আং বা রি-ন-আং অর্থাৎ আমি কাপড়, মানে সে হয়ত বলতে চেয়েছে আমি কাপড় এনেছি বা কাপড় দিই। সে থেকেই তাদের নাম হয়েছে 'রিয়াং'। তা যদি হয় তাহলে একথা হয়ত বলা যায় বিভক্ত বিভক্ত যে দল রাজাকে কাপড় সরবরাহ করত তারাই রিয়াং নামে পরিচিতি লাভ করেছে এবং তারা ত্রিপুরীদেরই একটা শাখা।"[১৬] অবশ্য অন্য একটি কিংবদন্তী অনুসারে তারা চট্টগ্রামের মায়াথলাং গ্রামে বাস করত। এবং পরে তারা রাজা ত্রিপুরের অত্যাচারে বিদ্রোহ করায় "রিয়াং" (আমি কর দেব না) নামে পরিচিত হন।

তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। "The Riangs are divided into two major groups (1) Meska or Mechka and (2) Marchhai or Malchhai. These are again divided into several sub-groups :—

(1) Tuimaiya fak (2) Mechka (3) Masa or Muchha (4) Raichak or Rai-Kachak (5) Takh Mayakcha and (6) Waring or Wairem (7) Charki. The second group has again seven branches or sections.

(1) Marchhai (2) Apet (3) Nakhya or Nakham (4) Chamrong (5) Darbong (6) Sagrai and (7) Riang or Rai Kachak.

Each of the fourteen 'dafa' or group has its own chief who is known as 'Rai' The title is not hereditary. The following are the lower ranks of the dafa. (1) Chapia Khan (2) Chapia (3) Darkalim. They are the Heir apparent, heir presumptive and priest respectively. Other lesser but important persons are Dalai, Bhandari, Konda, Daya Kajari, Murla, Dugria, Daoa and Chhairkak. They are assigned certain duties.

…In the Riang dialect the chief is called Kachak or Kanchan. The above groups are under 26 Sardars. The chiefs are again divided into two groups—one is under the leadership of the 'Rai' and the other is under the 'Kachak'. The retinues of the latter are lakchhang, Hajra, Kangreng, Kaima, Khan Kalim and Khandal. Ordinarily family dispute and other petty crimes are settled by the Rai or the Kachak".

রিয়াং-রা মূলতঃ জুমচাষী। বর্তমানে সমতলেও চাষ করে। স্বামী স্ত্রী উভয়েই কাজকর্ম করে। তারা 'ঘরচুক্তি' খাজনা দিত। বর্তমানে অবশ্য এই খাজনা প্রাথা লুপ্ত হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট সরকার এই আইন তুলে দেয়।

মৃত ব্যক্তির সৎকার করলেও, কলেরা প্রভৃতি রোগে মৃত ব্যক্তিদের প্রথমে কবর দিয়ে পরে তার রোগ প্রশমিত হয়েছে মনে করে মৃতদেহ উঠিয়ে দাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল।

তাদের পোষাক পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন। মহিলারা পাছরা পরিধান করে এবং বক্ষাবরণী ব্যবহার করে। বক্ষাবরণীকে রিয়া বা রিম্‌া বলে। রিয়াং রমণীগণ চুলের প্রতি খুব যত্ন নেন। তারা গয়না ও ফুল ভালবাসে। সাধারণতঃ রৌপ্য নির্মিত গয়না ব্যবহার করে।

রিয়াংরাও টংঘরে বাস করে। তাদের দুই পত্নী গ্রহণ অপরাধ বলে গণ্য। পাত্রকে বিবাহের পূর্বে এক বৎসর ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে কাজ করতে হতো। শিশু বিবাহরীতি নেই এবং বিবাহবিচ্ছেদ সমাজপতিদের অনুমোদনক্রমে নিষ্পন্ন হতে পারে।

তাদের ধর্ম মূলতঃ 'এনিমিজম' বা জড়বাদী। আদিম সমাজের মানুষ প্রকৃতির হাতে বড়ো অসহায় ছিল। তাই প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করেছিল। তাদের ধারণা ছিল জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক এই অদৃশ্য শক্তির দ্বারাই পরিচালিত হতো। এই অদৃশ্য শক্তির অন্বেষণ ও তাকে তুষ্ট করার প্রক্রিয়ায় সে গোটা প্রকৃতিকেই পূজা করতে শুরু করে। এজন্য আদিম সমাজের মানুষকে প্রকৃতির পূজারী বা জড়োপাসক বলে। ইংরেজীতে একে বলে animism. Animism শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ animia থেকে। এর অর্থ breath of life বা soul কিংবা spirit অর্থাৎ জীবন বা আত্মা।

বিশ্বের প্রায় সকল আদিবাসী ধর্মেই এই প্রভাব আছে। প্রসঙ্গতঃ রবার্ট এইচ. কর্ড্রিংটনের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি মেলানেশীয় ধর্মের প্রসঙ্গে এই উক্তি করেন—"The re igion of the Melane iano consi ts, as far as belief goes in the persuasion that there is a supernatural power about belonging to the religion of the unseen and, as far as, practice goes, in the use of means of getting this power turned to their own benefit. The notion of a Supreme being is altogether foreign to them, or indeed of any being occupying a very elevated place in their world there is a relief in a force altogether distinct from physical power, which act in all kinds of ways for good and evil, and which acts in all kinds of ways for good and evil, and which it is of the greatest advantage to possess or control. This is Mana···. It is a power or influence, not physical, and in a way supernatural ; but it shows itself in physical force, or in any kind of power excellence which a man possesses. This Mana is not fixed in anything, and can be conveyed in almost anything ; but spirits, whether disembodied souls or supernatural being, have it or can impart it ; and it essentially belongs to personal beings to originate it, though it may act through the medium of water, or a bone. All Melanesians religion consists, n fact, in getting this Mana for one's self, or getting it used for one's benefit—all religion, that is, as far as releegious practices go, prayers sacrifice."[৭৮]

প্রকৃতির অন্তরালের এই শক্তির ভালোমন্দ উভয় প্রকার কাজ করার ক্ষমতা আছে। এইজন্য 'প্রার্থনা' এবং 'উৎসর্গ' উভয় প্রথা প্রচলিত আছে। মেলনেশীয়দের 'মানা'-র মতই—বিশেষ শক্তিতে আদিম সমাজগুলি বিশ্বাসী ছিল।

বর্ত্তমানে তারা হিন্দুধর্মের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত। তারা 'কালী' ও বিষ্ণুর পুজাও করে। এছাড়া, কের, তুইনা (গঙ্গা পুজা), গড়িয়া, মতাই

কতর (শিবদুর্গা), সংগ্রামা (পাহাড়ের দেবতা), বুরা-চা (ঝুমের বা জঙ্গলের দেবতা), খুলুংমা (পাটের দেবতা), মালংমা (লক্ষ্মী), লাম্প্রা (সমুদ্র ও আকাশের দেবতা) পূজা করে। নাচ ও গান এদের ধর্মের অন্যতম বিশেষ অঙ্গ।

মৃত ব্যক্তিকে প্রথমে স্নান করানো হয় এবং পরিধেয় বস্ত্র দেয়া হয়। তারপর পায়ের নিকটে ভাত ও মাংস দেয়া হয়। পরদিন সকালে দাহ করা হয়। বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় রীতি পালিত হয়।

জমাতিয়া ঃ এই রাজ্যে এদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এদের সংখ্যা ৩৪,১৯২ জন (১৯৭১ সালের গণনা)। পূর্বে এ'রা সোনামুড়া এবং উদয়পুর মহকুমাতেই ছিলেন। বর্ত্তমানে অমরপুর প্রভৃতি মহকুমাতেও উল্লেখযোগ্য ভাবে বসবাস করেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ'রা অন্যান্য অংশ থেকে উন্নত। এ'রা ঝুম চাষের সাথে সমতলভূমিতেও চাষআবাদ করেন। অন্যদের মত এদের মহিলারাও পাছড়া ও রিয়া ব্যবহার করেন। লাল এবং কালো রং বিশেষ প্রিয়। এ'রাও অলংকার প্রিয়।

ধর্মের ক্ষেত্রে লৌকিক দেবতা ছাড়াও বৈষ্ণব এবং শাক্ত ধর্মেও অনেকেই বিশ্বাসী। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বনকারীদের সাধুও বলে। এরা শিব, দুর্গা, চতুর্দ্দশদেবতার পূজা করেন।

এরা খুব জাঁকজমকভাবে গড়িয়া পূজা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে গড়িয়া পূজা সম্পর্কে বিশেষভাবে জমাতিয়া ও দেববর্মা সমাজের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। এই পূজা সাধারণতঃ দেববর্মা, জমাতিয়া, ত্রিপুরা, রিয়াং, নোয়াতিয়া ও কলই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। বর্ত্তমানে গড়িয়া উপজাতিদের জাতীয় উৎসব। গড়িয়া নৃত্য শুধু পূজা অনুষ্ঠানে নয়—ত্রিপুরার তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ ১লা বৈশাখ থেকে ৭ই বৈশাখ পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আসল গড়িয়া মূর্ত্তিটি স্বর্ণের এবং এর অধিকারী হলেন জমাতিয়া সম্প্রদায়। এই দেবতার অন্য নাম জিভ মতাই বা জিভ দেবতা। এই সম্প্রদায়ে প্রতি এক বা দুই বৎসর অন্তর এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গড়িয়া স্থানান্তরিত হয়। ১লা বৈশাখ গড়িয়া আনয়ন করা হয়। সেইদিন থেকে জমাতিয়া সমাজে আনন্দের বাণ নামে। কলা, বাতাসা

ইত্যাদি উপকরণের সঙ্গে পাঁঠা বলিও দেয়া হয়। গড়িয়ার পূজারী 'খেরফাঙ' নামে পরিচিত। গড়িয়ার সহকারীদের সুইলা বলে। জমাতিয়াদের প্রচলিত অভিমত গড়িয়া অতীতে নাগাদের ছিল। জমাতিয়ারা নাগাদের পরাজিত করে এই দেবতা নিয়ে আসেন এবং পূজারীকেও নিয়ে আসেন।

দেববর্মা সমাজে মূল বা আসল যে গড়িয়া তা' নেই। কিন্তু খুব আনন্দ উৎসাহের মধ্যেই গড়িয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গড়িয়া সমাজে 'সেনা' এবং 'গড়িয়া' বৈশাখের ৭ তারিখে একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

গড়িয়া সম্পর্কে দেববর্মা সম্প্রদায়ের মত হলো—যুদ্ধে যাওয়ার আগে সৈন্যরা গড়িয়া দেবতার পূজা করে সমতলে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল এবং বহু সময় অতিবাহিত হলেও যুদ্ধে জয়ী হয়। যুদ্ধশেষে তারা গড়িয়ার সামনে উৎসব করেছিল বলেই বৈশাখ মাসের ৭ তারিখকে অবিস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই শাসকরা গড়িয়া দেবতার সামনে প্রতি বৎসর সেনা উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐদিন থেকেই ত্রিপুরাব্দ নববর্ষ গণনা হয়ে থাকে। গড়িয়া বা 'সেনার' দিন গড়িয়া মাগনে বড় এবং ছোট ছেলেদের দল যার যার পাড়াতে ঢোল নিয়ে বের হয় এবং প্রত্যেক পরিবারের উঠানে নৃত্য করে। এই সময় যে সব কথাবার্তা বা বোল ব্যবহার করে তা প্রায় সবই বাংলা। এই মাগন গাজন নৃত্যের মত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—অতীত ত্রিপুরাতে কগবরক একমাত্র ভাষা কিংবা রাজভাষা হলেও বাংলা কিভাবে চালু হলো তা লক্ষণীয়। বর্ত্তমানে ১৩৯৫ ত্রিপুরাব্দ। সুতরাং প্রায় ১৪শ বৎসর আগের ঘটনা। প্রচলিত একটা বোল তুলে ধরা হলো—

আইলামরে—আইলামরে
আইলাম গড়িয়া—মুড়া অভাঙ্গিয়া
আগুনপানি বাইর কর।
ঘর গৃহস্থি হজাগ কর।
হাঁস পাইলে কাইট্টা খাও,
মোরগ পাইলে গড়িয়ায় দেও।
টাকা পাইলে জম জমাও।
পুঁতি মাছ খেলাইয়া…।

এই বলেই জল দেওয়া উঠানে বাজনার তালে তালে নাচ শুরু হয়। (গড়িয়া

দল কোন গৃহস্থ বাড়ীতে গেলে প্রথমেই উঠানে ভাল অংশে অল্প পরিমাণে জল ঢেলে দেওয়া হয়) এবং এই বোলগুলি গড়িয়া মাগনের সময় ব্যবহার করা হয়।

এই গড়িয়া মাগনের সময় উল্লিখিত বোল্‌গুলির সঙ্গে আর একটি লক্ষণীয় বস্তু হল "গড়িয়া আশীর্ব্বাদ।" কগবরকে বলে গড়িয়া 'বর'। এই সময়েও বাংলা বোল ব্যবহার করে, যেমন ঃ—

(১) গড়িয়ার লোক ঃ ও গড়িয়া সেংগারগ (ভক্ত)।
ঘরের লোক ঃ ঐ
গঃ লোক ঃ এই ঘরে কি ?
ঘঃ লোক ঃ মামুং (হাতি)
গঃ লোক ঃ কাহাম কুরুং দে তং আয়ুং। [তাদের ভাল রাখ, দীর্ঘায়ু হোক]

(২) গঃ লোক ঃ ও গড়িয়া সেংগারগ।
ঘঃ লোক ঃ ঐ
গঃ লোক ঃ এই ঘরে কি ?
ঘঃ লোক ঃ উম্নাথাই (বাঁশের গোটা)
গঃ লোক ঃ হাপুং হাথাই মাই থাই।

(৩) গঃ লোক ঃ ও গড়িয়া সেংগারগ।
ঘঃ লোক ঃ ঐ
গঃ লোক ঃ এই ঘরে কি ?
ঘঃ লোক ঃ মুই ছেলে।
গঃ লোক ঃ হামরা চাইয়া কটেসেলে।

(৪) গঃ লোক ঃ ও গড়িয়া সেংগারগ।
ঘঃ লোক ঃ ঐ
গঃ লোক ঃ এই ঘরে কি ?
ঘঃ লোক ঃ মুসুই কসগ।
গঃ লোক ঃ হাপুং ছাথায় মাইসগ ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ ত্রিপুরী সেনারা সমতল করার সময় দীর্ঘদিন বাঙালী প্রভাবে ছিলেন—সেই প্রভাব ভাষার ক্ষেত্রেও পড়েছে।[৭৯]

বিবাহের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সম্মতি থাকে। সাধারণতঃ পাত্র অপেক্ষা

পাত্রীর বয়স অধিক। বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ অনুমোদিত। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

মৃতের দেহ দাহ হয়। অস্থি কোন নদীতে বা গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হয়।

জমাতিয়া সম্প্রদায় শান্তিপ্রিয়। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে 'মুলুক সর্দার' বা মোড়ল মীমাংসা করে দেন। তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে।

চাকমা ঃ এদের এরাজ্যের সাবরুম, কৈলাসহর, ধর্মনগর, অমরপুর প্রভৃতি মহকুমায় দেখা যায়। এদের সংখ্যা ২৮, ৬৬২ জন (১৯৭১ সালের জনগণনা)।

বর্ত্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের বাসভূমি আরাকান। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে এরা রিয়াংদের বিতাড়িত করে প্রাধান্য স্থাপন করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের প্রভাব হ্রাস পায়। এরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত, যেমন—(১) মলিমা (Malima) (২) তোজা (Tauja) (৩) বড়ুয়া (Barua) (৪) কোড়া (Koda) (৫) ওয়াংসা (Wuangsa) (৬) বুমা (Buma) (৭) কুর্চা (Kurchya) (৮) কডুয়া (Kadua) প্রভৃতি।

"লেউইন সাহেবের মতে চাকমারা আরাকানের মুসলীম ও মগ সংস্রবজাত উপজাতি। আবার লোয়েফ্লার সাহেব মনে করেন, আরাকান ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাসকারী শাক উপজাতির এক শাখা শাক উপভাষার বদলে বাংলা ভাষার প্রভাবে আধুনিক অংশে চাকমা নামে পরিচিত। এই শাক শব্দটিকেও কেউ কেউ আবার 'শেখ' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ বলে মনে করেন। মগরা মনে করেন চাকমারা আরাকানের মোগল সংস্রবজাত শাখা।...চাকমা লোকসাহিত্য অনুসারে চম্পকনগরের রাজা সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরি ৯৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আরাকানের রোঙাং রাজ্য অধিকার করেন। এই ভাবেই নাকি আরাকান ও উত্তর ব্রহ্মে চাকমা রাজ্য গড়ে উঠে। চাকমাদের চাটিগাঙ ছড়ার পালাগানে বিজয়গিরির আরাকান অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে গাওয়া হয়,—

"অপার পাণি সাগর বেই
কুলকিনারা দেখা নেই,
জাতি পুজোত্যে (বিজয় গিরি) ঘিদিল
নোঙরা দেশ্‌তে তে কুলেল।"

অর্থাৎ চাকমা রাজকুমার অনুচরগণসহ বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিলেন।

তারপর রোডাং দেশের উপকূলে পেঁাছে ঘৃতাহুতি প্রদানে জাতীয় পূজা করলেন।"[৮০]

চাকমাদের সমাজব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত। তাদের গোষ্ঠীর নামকরণে দলপতি বা স্থানের নাম বা রাজনৈতিক ঘটনার সূত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসাবে সৈল্যা ও ডেয়া গোষ্ঠীর নামকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডাইয়া ও সৈল্যা—দুই ভাই। ডাইয়া বড় কিন্তু বুদ্ধিমান নয়। অথচ সে ডেয়া পিপড়ার মত কট্‌কট্‌ কথা বলে। তাই তার নাম ডেয়া। ছোটভাই খুব তর্ক করতে পারে তাই তার নাম ছোয়াল্যা অর্থাৎ তার্কিক। দুই ভায়ের নাম থেকে সৈল্যা ও ডেয়া গোষ্ঠীর উৎপত্তি। মৌজা ভাগ করার সময় দুই ভাই দুই দিকে যাওয়ার জন্য—বড় ভাই কার্মে গোজা আর ছোট ভাই দালিমা গোজা ভুক্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে গোজার নাম থেকে সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীর নাম থেকে পিতৃকুলের পরিচয় পাওয়া যায়। গোজা বা সম্প্রদায়ের প্রধান দেওয়ান, দেওয়ানের পর খিজরা, তালুকদার, হেডম্যান, কারবারী প্রভৃতি উপাধি।

পুরুষেরা সাধারণতঃ তাঁত বা মিলের কাপড় পরে, মহিলারা হাতে বোনা রঙীন পাছড়া ব্যবহার করে। চাকমা রমণীরা তাদের কাপড়ে নানা ধরনের আলাম (নক্‌শা) তোলে। তাদের বিভিন্ন পালাগানে ঐ সব আলামের বিবরণ পাওয়া যায়। ব্লাউজের উপর তাঁরা বক্ষ আবরণী বাঁধেন। মাথায় একটুকরা কাপড় থাকে। রুপার গয়না ব্যবহার করেন। চাকমা রমণীরা ফুলের ব্যবহার অধিক ভালবাসেন।

চাকমাদের ভাষায় বাংলা, অসমীয়া, মাগধী ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কালে অনেকেই চাকমাদের উপর শুধু বাঙলার প্রভাব নয়—বাঙালী হিসেবেই চিহ্নিত করতে চান। কেউ কেউ বলেন ব্রহ্মদেশের শাক সম্প্রদায় ও চাকমাদের ভাষার অতীত উৎস এক।

চাকমারা প্রধানতঃ জুম চাষী। অতীত ত্রিপুরায় তাদের আগমনের অন্যতম কারণও সম্ভবতঃ জুম চাষের জন্য নতুন জমির সন্ধান। তবে বর্ত্তমানে তাদের মধ্যে হালচাষীর সংখ্যাই অধিক। এছাড়া অনেকেই শিক্ষা অর্জন করে চাকুরী করেন।

তাঁদের সমাজে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হয় না। বর্ত্তমানে বাল্যবিবাহ অচল। বিয়েতে সামাজিক মতে কোন মন্ত্র পড়া হয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা-

বৌদ্ধ ধর্মমতে 'বিবাহ-মন্ত্র' নামে মন্ত্র পড়ান। বিয়ের তিন থেকে পাঁচ দিন পরে কন্যার বাপের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবসহ বর-কনে বেড়াতে যায়। এই প্রথাকে 'ব্যাসুত' বলে। ঐ সময়ে কন্যার আত্মীয় স্বজনকে এক এক বোতল করে মদ দিতে হয়। তারাও টাকা ও বখশিষ দেন। বরকন্যা এক, তিন বা পাঁচ রাত্রি কাটিয়ে বাড়ি ফেরেন।

সামাজিক বিয়ে ছাড়া এঁদের সমাজে 'পলায়ন বিবাহ' বা 'যুবক-যুবতীর মনোমিলন' বিয়ে প্রচলিত আছে। তবে পিতা মাতার আপত্তিতে এই বিয়ে অবৈধ হতে পারে, আবার তিনবার পলায়ন করলে তা বৈধ হয়। তাঁদের সমাজে একই গোত্রে বা গোজায় বিয়ে নিষিদ্ধ।

এঁদের মধ্যে গঙ্গা পূজা, চৌদ্দ দেবতা পূজা প্রভৃতির প্রচলন আছে। এছাড়া জন্মকেন্দ্রিক নানা পূজা ও মন্ত্রের প্রচলন আছে। তাদের নানা ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সৃষ্টিপথম বা লক্ষ্মীপালা চাকমাদের অন্যতম। সারারাত ধরে এই পালাগান হয়। পরে সকালে উঠানে লক্ষ্মী, কালিয়া আর বিআত্রা—এই তিন দেবদেবীর বাঁশের প্রতীক তৈরী করে লক্ষ্মীকে মাঝখানে, ডানদিকে কালিয়া ও বাঁ দিকে বিআত্রার উদ্দেশে ভোগ ও বলি উৎসর্গ করে গৃহস্বামী সবাইকে ভোজ দেন। লক্ষ্মীদেবী সম্পদের দেবী হিসেবেই পরিচিতা। কিন্তু ত্রিপুরচন্দ্র সেনের মতে "মহাযান মতের দান পারমিতার ধ্যানধারণার প্রতীক হইতে তাহাদের লক্ষ্মীমায়ের ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙালী হিন্দুদের লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে ইহার কোন মিল নাই।" তাঁদের লক্ষ্মীর বাহন শূকর। লক্ষ্মীপালার কাহিনী অনুযায়ী আদিতে কিছুই ছিল না। ওঁকার ধ্বনির মধ্যে নিরঞ্জনের বা গোজেনের জন্ম হয়। নিরঞ্জনের ঘাম থেকে সমুদ্রের উৎপত্তি হয়। সমুদ্রে বসে নিরঞ্জন নাভির ক্লেশ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি করেন। নিরঞ্জনের ছায়া থেকে জন্মায় কেগইয়া। কেগইয়া প্রথমে নপুংসক ছিল। নিরঞ্জন তাকে স্ত্রীলোকে রূপান্তরিত করেন। তার শরীরের রক্ত দিয়ে চন্দ্র সূর্য ও তারকামালার সৃষ্টি হয়। তার ডান হাতের ক্লেদ থেকে ব্রহ্মা, বাঁ হাতের ক্লেদ থেকে বিষ্ণু ও মুখের ক্লেদ থেকে শিবের জন্ম হয়। শিব কেগইয়াকে বিয়ে করেন। কেগইয়ার একশ দশবার জন্ম হয়। শেষবারের নাম দুর্গা।

এরপর নিরঞ্জনের নির্দেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সাগর মন্থন করলেন। এই মন্থনের ফলে যা পাওয়া গেল সেগুলো তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—অংকুর, শাবক ও ডিম্ব। তারপর নিরঞ্জন সাতজোড়া মানুষ তৈরী করেন।

জীবনযাপন করতে হলে কি করণীয়—লক্ষ্মীদেবীর মুখে এই পালাগানে বলা হয়েছে। এই পালার মধ্যে গৃহস্থালী ও কৃষিকাজ এবং চাকমা জীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

তাদের মহাবিশু বা বিজু উৎসব খুব উল্লেখযোগ্য। জাকজমকের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় 'বুর পারা' পূজা করা হয়। এছাড়া ধর্মকাম নামে যজ্ঞপূজা, অয়্যা পূজা, লংতরা পূজা, একরাত্যা নামে শিব পূজা করা হয়। সাধারণতঃ এই সব পূজায় শূকর, মদ বা মোরগ ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবই তাঁদের উপর অধিক।

মৃতদেহকে দাহ করা হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী ২।৩ দিন পরও সৎকার করা হয়। সৎকারের পরের দিন মৃতের অস্থি সংগ্রহ করে একটি নতুন পাতিলে নতুন কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করে নদীর জলে বিসর্জন দেয়া হয়।

তাঁদের যাদুবিশ্বাস খুব উল্লেখযোগ্য। তবে বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রভাবে তাঁদের animism বা জড়বাদ, যাদুবিশ্বাস বা মন্ত্র ইত্যাদি রূপান্তর ঘটছে।

উপজাতি জীবনে তাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তী, গান ও কথা প্রচলিত আছে। লোকসংগীতের মধ্যে বারমাস্যা খুব উল্লেখযোগ্য এবং বিরল দেখা যায়। চাকমা সমাজে বিভিন্ন পালা গানে এই বারমাস্যার ব্যবহার উল্লেখের দাবী রাখে। এখানে মেয়াবী বারমাস্যার উল্লেখ করা হলো ঃ—

মেয়াবী বারমাস্যা

প্রথম বৈশাখ মাস দেবায় গল্য কালা,
আমারে ছাড়ি মেয়া কারে দেখ ভালা।
তুমি ছাড়িলে মেয়া আমি না ছাড়িব,
রাত্রি কালে নিদ্রা গেলে স্বপনে দেখিব।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে মেয়া গাছে পাকে আম,
মন কয় গলায় কলসী বাঁধি জলে দিতাম ঝাম।
ঝম্প দিয়া তেজেদুং বন্ধুহীন জীবন,
তোমা বিনা মেয়া অন্ধকার এই তিন ভুবন।
আষাঢ় মাসেতে মেয়া ঝর হইল ভারি

এমন সুন্দর দিনে তুমি মোরে কেন গেলা ছাড়ি।
কি ব্যাধিতে ধয্যে মোরে কি দিলে পুরায়,
এখন শিমেই তুলার মত মন বাতাসে উড়ায়।
শ্রাবণ মাসেতে মেয়া ধানে হইল থুর।
কি লাগি মোরে মেয়া করহ নিঠুর।
জোয়ারে ভরিয়া গঙ্গা—পড়ি গেল ভাটা।
যৌবন ফুরাইয়া গেল তোমার নাই আর আশা।
ভাদ্র মাসেতে মেয়া ধানে ধল্য পাক।
কোথায় গেলে পাব মেয়া তোর লাক ॥
মুই যদি মেয়া তোর লাগত পেদুং।
বাহু ধরিয়া তোরে কোলে তুলি লদুং।
উরি খাদে ব্যঙ্গমা পক্ষী ব্যাধ হাতে পড়ে।
ললাটে লিখন ফল খণ্ডাইতে না পারে।
আশ্বিন মাসেতে মেয়া বরিষা অয়ে শেষ।
যেদিকে যেয়ে সেয়া করিম উদ্দেশ।
কালা কালা কাকলা বালা কালা মাথার কেশ।
খঞ্জনের বুক কালা ঘুরে নানান দেশ ॥
নানা দিকে করি আমি ভ্রমিণ ভুবন।
মেয়ার দরশণে পুরাইতং মন।
তুমি ছাড়ি গেলে মেয়া কান্দিতে থাকিব।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি উদ্দেশ করিব।
কার্ত্তিক মাসেতে মেয়া ফিরে বার্গিপাল।
তাহারে দেখিলে উঠে মনে মায়াজাল।
কলা লাগে দুবদুবা, পাগেই খেম্ মুই ছাড়া।
ভাঙ্গিলে পীরিতি মেলা, না লব জোড়া।
অগ্রহায়ণ মাসেতে মেয়া সাবাল্যা চিলে
চিজিক চিজিক করে।
এইমতে দারুণ জ্বালায় শিহরিয়া ধরে ॥
ধরফরিয়া উঠে পরাণ স্থির নাহি মন।
মদন ঘটেল জ্বালা নহে নিবারণ।

পুষ মাসেতে মেয়া শীতে কাঁপে বুক।
তুমিও ছাড়ি গেলা মেয়া আমার মনে দুক।
পথ্যা জোয়ার সময় ময়ুর ধ্বনি করে।
শুনিলে তাহার শব্দ চোখর জল ঝরে।
মাঘ মাসেতে মেয়া বনে গুজর বাঘ।
তুমি ছাড়ি গেলা মেয়া আর নাই পাইব লাগ।
চিজিপদি ডাকে মোরে ভরমিয়া ভরমিয়া।
শুনিলে তাহার শব্দ প্রাণ নেজায় হরিয়া।
ফাল্গুন মাসেতে মেয়া বসন্ত উপাল।
তাই দেখি উঠে জ্বলি বাড়ে মায়াজাল।
উগ্রসেন সুত রিপু বড় অয়ে নিঠুর।
খেলা ছাড়ি তুমি মেয়া গেলা মধুপুর।
চৈত্র মাসেতে মেয়া প্রাণ উঠে জ্বলি।
অনেক দিন প্রেম করলুম মোরে গেলা ছাড়ি ॥
এমন বয়সকালে মেয়া চিতে দিয়া কালি।
যৌবন জোয়ারে তুমি কেন দিলে ডালি।
সোনা দিব তোলা তোলা রুপা দিব মাপি।
এমন সুন্দর মেয়া তুমি মোরে কেন গেলা ছাড়ি।

[বিরাজমোহন দেওয়ান কর্ত্তৃক সংকলিত]

চাকমা সম্প্রদায়ের বিজু উৎসবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের এই বিজু উৎসব বুক ভরা অকৃত্রিম ভালবাসার আলোড়িত জীবনের একটা মেলা। ফুটে উঠে আবাল বৃদ্ধাদের মনে অতীতের ফেলে আসা স্মৃতি। নাগেশ্বর ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে যুবক যুবতীদের মন আত্মহারা হয়ে উঠে। তাদের মনে তখন জেগে উঠে কোন এক অজানা মনোবাসনা। আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করে মনের গোপন কথা, চাকমা সমাজের ইতিহাসের রাধামন দম্পতির কাহিনীও তাদের জাগিয়ে তোলে। কোকিলের কুহু কুহু সুরের রুপালি পাতায় সোনালী হরফে লেখা সেই বিজুর দিনগুলি। বিজু মানে প্রেমিকাকে খোঁজা নয়। অর্থহীন প্রলাপ করে যাওয়া নয়। হাসি মুখের মধ্যে প্রতিটি বাড়ী বাড়ী গিয়ে অফুরন্ত ভালবাসায় অতিবাহিত দিনগুলিকে বিদায় জানিয়ে দেয়। চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজু উৎসব বৎসরের শেষে চৈত্র মাসের শেষ দু'দিন

এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিন। এই তিনদিন যথাক্রমে ফুলবিজু, মূলবিজু, গচ্যা-পচ্যা দিন বলা হয়। প্রথম দিন ফুলবিজু, পাহাড় জঙ্গলে তরকারী ইত্যাদি সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিন মূলবিজু ভোরে ঘুম হতে উঠে ছেলে-মেয়েরা গঙ্গাজলে স্নান করে বাড়ীতে এসে মুরগ, শূকর, ছাগল ও গরুর ঐদিনের জন্য বন্ধনমোচন করে। ৮ বৎসর থেকে ১২ বৎসরের ছেলেরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পশুদেরকে খাবার দেয়। যুবক-যুবতীরা বৃদ্ধদেরকে স্নান করিয়ে দেয়। উৎসবের দিনে সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। কোন জিনিস চাইলে কৃপণতা করতে নেই, খাওয়ার জিনিস না থাকলে লজ্জিত হতে হয়। বৃদ্ধরা সারাদিন উপবাস পালন করে। চাকমা ভাষায় উপবাস পালনকে একাদশী বলে।

তৃতীয় দিন গচ্যা-পচ্যার দিনে মুরগ এবং শূকরের মাংস খেতে বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সামাজিক প্রথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বৎসরে প্রথম বিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ ঐ দিন তিনটি মুরগ কাটা হয়—যাকে বলে শুগলং। এই পূজা অনেকেই করে আবার অনেকেই করে না। তারপর গঙ্গাপূজা, তাকে বলা হয় 'বেরিপারা'। ঐ সময় চরাতে (ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী) গিয়ে—গঙ্গায় প্রার্থনা করে, যেন বাড়ীর সকল লোক সারা বৎসর সুস্থ থাকে। এই তিন দিন চাকমা সম্প্রদায়গণ বাড়ীতে খাবার থাকলে কোন কর্ম করে না—এবং খাবার না থাকলে অন্য কোন চাকমার নিকট থেকে চেয়ে আনে। অথবা পাড়ার কাধবারী, দেওয়ান, তালুকদাররা গরীব চাকমাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে দেয়।[৮১]

এই উৎসবের দিনে ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী মিলে গান বাজনা ও খেলাধুলা করে। নীচে কয়েকটা গান দেয়া হলো—

(১) বিঝু দিন্নুয়া লুঙোগী
উঁড়ি উঁড়ি বেড়েবঙ—
যেই যেই যেই ডেই বোন লক নাক্সফুলন পারিয়ে।
ও···ফুল বিঝুদিন ঝারত যেবং
(হরিণ শিগের গরিবং)
ফুল তুলিবং আজুল আজুল নাক্সতুলি তারুমত
বিঝু দিনত রেং কারিংব
হে রায় মদে হেবং হেবং

এ ঘরত্তুন উ ঘরত

উমরত্তুন এ ঘরত নাজি নাজি বেড়েবং ॥

[বিঝু এসে গেছে। উড়ে উড়ে বেড়াবো। চল চল ভাইবোন, নাগেশ্বর ফুল পেড়ে আনি। ফুলবিঝু দিন জঙ্গলে যাবো হরিণ শিকারের জন্য। প্রকৃতির কোলে যেখানে কেবলমাত্র নাগেশ্বর ফুলের গাছ আছে, সেই গাছের ফুল আঁচল ভরে ভরে তুলব, বিঝুদিনে আনন্দসূচক হাঁক দেবো। মদ মাংস খাবো, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নেচে নেচে বেড়াবো]

(২) ও·· এচ্যে আমা বিঝুদিন

এচ্যে আমা বিঝু

মিলে মরদ বেগে মিলি

বিঝু দিনত নাজিবং

বিনি পিধে মদ জগরা

বেগে মিলি হেবংগে

গাঝগুলো ছাবা বদি

মিলে হারা হবংগে ॥

[আজ আমাদের বিঝুদিন। আজ আমাদের বিঝু ছেলেমেয়ে সবাই মিলেমিশে নাচব। বিনি পিঠে, মদ ও জগরা সবাই মিলে খাবো। গাছের নীচে সাথীদের নিয়ে মিলে খেলা খেলব।][৮২]

জনসংখ্যা : ব্লকভিত্তিক ও শহরভিত্তিক ১৯৮১

ব্লক		শহর	
অমরপুর	৮০,৮০৯		
কাঞ্চনপুর	৭৭,১৪৯		
কুমারঘাট	১,১৪,৫৫১	অমরপুর	৭,১৫৩
খোয়াই	৭৪,৫৫০	আগরতলা	১৩২,১৮৬
ছামনু	৬৩,২৯৮	উদয়পুর	১৬,৩০৪
জিরানিয়া	১,১৪,১৩৫	কমলপুর	৩,৬৮৮
ডম্বুরনগর	২৫,৪৭২	কৈলাসহর	১২,৯৩৮
তেলিয়ামুড়া	১২৬,৫৯৬	খোয়াই	১০,৭২২
পানিসাগর	১৩১.৫২৮	ধর্মনগর	২০,৮০৬

ব্লক		শহর	
বগাফা	৯৯,৫৭৮	বিলোনীয়া	১২,০৫৪
বিশালগড়	২,৪৯,৪৩৫	সাবরুম	৩,৩৪৯
মাতারবাড়ী	১৪৩,৬৬৯		
মেলাঘর	১২৭,০৪৬	সোনামুড়া	৬,৩৮০
মোহনপুর	১৩৫,২০২		
রাজনগর	৭৯,২০৪		
সাতচাঁদ	৭৫,৯৭৮		
সালেমা	১,১৭,২৯০		

জনসংখ্যা : ধর্মভিত্তিক

ধর্মীয় বিভাগ	১৯৭১
হিন্দু	১৩,৯৩,৬৮৯
মুসলমান	১,০৩,৯৬২
বৌদ্ধ	৪২,২৮৫
খ্রীষ্টান	১৫,৭১৩
শিখ	৩১৮
অন্যান্য	৩৭৫
মোট	১৫,৬৬,৩৪২

জনসংখ্যা : মহকুমাভিত্তিক

মহকুমা	১৯৮১
অমরপুর	১,১৩,৪৩১
আগরতলা	৬,৩০,৯৫৮
উদয়পুর	১,৫৯,৯৭৩
কমলপুর	১,২০,৯৭৮
কৈলাশহর	১,৯০,৭৮৭
খোয়াই	২,১১,৮৬৮
ধর্মনগর	২,২৯,৪৮৩

মহকুমা	
বিলোনীয়া	১,৮২,৮৩৬
সাবরুম	৭৯,৩১৮
সোনামুড়া	১,৩৩,৪২৬

হালাম ঃ এরা কুকি জাতিরই একটি অংশ। কুকিরা দীর্ঘদিন ত্রিপুরার মহারাজার অধীনতা স্বীকার করেন নি। কুকিদের যে অংশ মহারাজার অধীনতা স্বীকার করেন তাঁরা হালাম নামে পরিচিত। ধর্মনগর, কৈলাসহর, অমরপুর প্রভৃতি মহকুমায় তাঁরা বসবাস করেন। এরাজ্যে এদের সংখ্যা ১৯০৭৬ জন। (১৯৭১ সালের জনগণনা) এঁরা ১৭ দফা বা শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা ঃ (১) কলই (২) কুলু (৩) কার্বং (৪) কাইপেং (৫) কাইরেং (৬) চদাই (৭) দব (৮) সকচেফ (৯) থাংচেপ (১০) নবীন (১১) বোঙার (১২) মরচুম (১৩) মুরাসিং (১৪) রাঙখল (১৫) রূপিনি (১৬) লংগাই (১৬) লংলুং।

এঁদের মধ্যে রায় কাঞ্চন গালীম নামীয় উপাধিধারী ব্যক্তিগণ সমাজপতি। এছাড়া প্রত্যেক পাড়ায় একজন খান্দল নামে কার্যভার গ্রহণ করেন। এঁরা নিষ্ঠাবান অতিথিবৎসল। অতিথির জন্য নিজেদের ঘর ছেড়ে দিতেও পারেন।

এঁরা প্রধানতঃ জুমচাষী। বর্ত্তমানে সমতলেও চাষবাস করেন। টংঘরে বসবাস করেন। বর্ত্তমানে অনেকেই শিক্ষিত এবং সমতলভূমিতে নিয়মিত চাষবাস করার জন্য টংঘর ছেড়ে দিয়েছেন।

মহিলারা রূপার অলংকার ব্যবহার করেন। এছাড়া কানের দুলের ব্যবহার লক্ষণীয়। আচার আচরণের দিক থেকে তাঁরা ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের নিকটবর্ত্তী। তাঁর শক্তিসাধক হলেও কলই এবং রূপিণী সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। বর্ত্তমানে তাঁদের ধর্ম জড়বাদ এবং হিন্দুধর্মের উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত এবং খ্রীষ্টান ধর্মেরও প্রভাব পড়ছে। তাঁদের 'বড় পূজা' খুব উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে বাল্য বিবাহ অবৈধ নয়। বিয়ের পূর্বে পাত্রকে ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে কিছুকাল কৃষিকাজে সাহায্য করার প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ বিচ্ছেদ এবং বিধবা বিবাহ সমাজ স্বীকৃত। মৃতদেহ দাহ করা হয়। মৃতের উদ্দেশ্যে খাদ্য, কাপড় এবং মদ দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

তাদের মন্ত্রাদির সারমর্ম হলো ঃ "রাজার মঙ্গল হোক, রাজ্যের মঙ্গল হোক, মানুষের মঙ্গল হোক।"

হালাম সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখা আবার বিভিন্ন শাখায় (উপশাখাও

বলা যেতে পারে) বিভক্ত। যেমন হালামের অন্যতম গোষ্ঠী কলই সম্প্রদায় ৭টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এই সাতটি শাখা হল (১) ওয়াপ্লম (২) ওয়াকবুর (৩) রুজগুই (৪) বুকাং (৫) আবেল (৬) কুছু এবং (৭) চড়াই।

হালাম নামকরণ নিয়ে জনশ্রুতি আছে। কেউ কেউ বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে কুকিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য কুকি সীমান্ত পাহারায় অনুগত কুকি ও অন্যান্য উপজাতিরা নিযুক্ত ছিল। এইসব উপজাতিদের হালাম বলা হয়। কগবরক ভাষায় হালাম শব্দ হাব ও লাম শব্দ দ্বারা গঠিত। 'হাব' শব্দের অর্থ প্রবেশ করা এবং লাম শব্দের অর্থ পথ। এইভাবে প্রবেশ পথের পাহারাদার বা নিযুক্ত ব্যক্তিরা কালক্রমে হালাম নামে পরিচিত হল।

আবার হালামদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকলের মধ্যে ভাষাগত মিল পাওয়া যায় না। বরং অন্য উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গেই তাদের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত ঃ "১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ত্রিপুরার সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ বাঙ্গালী বাকী এক তৃতীয়াংশ আদিবাসী। আদিবাসীদের মধ্যে তিপরা, রিয়াং, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রুপিনী, কলই, উলছই, মুরাসিং—এই আটটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকেরা এক অভিন্ন ভারা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এদের দ্বারা কথিত বিভিন্ন ভাষাগুলিকে এরা সচরাচর কগবরক নামে অভিহিত করেন। কগবরক তিব্বত বর্মীয় ভাষাগোষ্ঠীর জোড়া শাখার অন্তর্গত।" (**সুহাস চট্টোপাধ্যায় ঃ ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ ঃ—পৃঃ ১**)।

হালামদের মধ্যে বিভিন্ন পুজার প্রচলন আছে। এখানে নবান্ন বা মাইকাতাল চামানির উল্লেখ করা হলো।

সাধারণতঃ জুম তোলার পর ভাদ্র আশ্বিন মাসে মাইকাতাল চামানি (নবান্ন) করা হয়। এ হলো নবান্ন খাওয়া। নদীতে ওয়াথপ (ওয়া = বাঁশ, থপ = দেবতার বাসা বা বেদী) তৈরী করে এই পুজা করা হয় এবং বাড়ীতে মাইলুংমা (লক্ষ্মী) পুজা করা হয়। এই পুজা অচাই দ্বারা করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে দু বার করা হয়। কারণ তাদের চাষ সমতল ভূমিতেও চলে। ফলে অগ্রহায়ণেও ফসল উঠার পর এই উৎসব করা হয়।

মগ ঃ এরা আরাকানবাসী। এককালে পার্বত্য চট্টগ্রাম যখন রিয়াং দেশ ছিল তখন মগগণ এই দেশ আক্রমণ করেন এবং দখল করেন। পরবর্তী সময়ে জুমের সুবিধা গ্রহণের জন্য মগেরা ত্রিপুরায় চলে আসে। জনশ্রুতি আছে

মগদের ক্ষমতা এত অধিক ছিল যে, তারা একসময় শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর বা রাঙ্গামাটিও দখল করেছিল। এরা সাবরুম, বিলনীয়া, কৈলাসহর এবং ধর্মনগর মহকুমায় বসবাস করেন। ত্রিপুরায় এদের সংখ্যা ১৩,২৭৭ জন (১৯৭১ গণনা) তাদের ভাষা আরাকানী ভাষার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত।

মগ সম্প্রদায় টংঘরে বসবাস করে না। এদের মধ্যে যুবক ও যুবতীদের আলাদা আলাদা ঘরে থাকার নিয়ম আছে। এই সমাজে সামাজিক বিয়ে প্রচলিত। জামাই-খাটান বা 'লাভ-ম্যারেজ'ও প্রচলিত আছে। বিবাহবিচ্ছেদ এবং বিধবা বা পুনর্বিবাহ সমাজ অনুমোদিত। ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর ন্যায় এদেরও জীবনচর্যায় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আচার আচরণ লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদের মত এরাও গঙ্গাপুজা, চতুর্দশ পুজা প্রভৃতি করে। কিন্তু তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো—'ক্যাং পুজা'। এই অনুষ্ঠানে পূর্ণিমার বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। মগ ভাষায় 'ক্যাং' কথাটির অর্থ হচ্ছে মন্দির বা ধর্মশালা। মন্দিরে গিয়ে ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই পুজা অনুষ্ঠিত হয় বলে তার এই নাম হয়েছে। তাদের শ্রেষ্ঠ ক্যাং পুজা উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আশ্বিনী পূর্ণিমার দিনে। কিন্তু এই পুজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় মূলতঃ আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন থেকেই। এই শুভদিনে ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ফল, ফুল প্রদীপ ইত্যাদি উপাচারের মাধ্যমে শুদ্ধ চিত্তে বুদ্ধ পুজার আয়োজন করে থাকেন। সেদিন থেকে কঠোর নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরবর্তী চারমাস যাবৎ অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রতিদিন মন্দিরে রাত্রিযাপনের শুভ সংকল্প এঁরা গ্রহণ করেন। কথিত আছে—বুদ্ধের জীবিতকালে স্বয়ং বুদ্ধের নির্দেশে ভিক্ষুগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত হয়। তাদের ভাষায় এই সময়কালকে 'ওয়া' বলে, অর্থাৎ বর্ষাবাস। এই 'ওয়া' বা বর্ষাবাসের দিনগুলিতে কোন কারণেই তাঁরা মন্দিরের বাইরে রাত্রিযাপন করতে পারেন না। এই সময় তাঁরা বুদ্ধের পুজার্চ্চনা, যোগ ও ধ্যান ইত্যাদি ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করেন। তাছাড়া ভিক্ষুগণ এই সময়কালের মধ্যে বিশ্বের প্রতিটি নরনারীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নিয়ত প্রার্থনা করেন। যেদিন ওয়া বা বর্ষাবাসের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় সেদিন মগ সম্প্রদায়ের সকল

লোকেরা নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে মন্দিরে সমবেত হয়ে ক্যাং পূজার আয়োজন করে থাকে তথাগত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে। এই ক্যাং পূজাকে কেন্দ্র করে সেদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে নাচ গান ও নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই সব অনুষ্ঠানে মগ সম্প্রদায়ের সকল নরনারী ও আবালবৃদ্ধ বনিতারা অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উৎসব উপভোগ করে থাকেন। এই 'ওয়ার' দিনগুলোতে মগ গৃহস্থদেরও নানাবিধ ধর্মীয় আচার বা সামাজিক নিয়মকানুন নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালিত হয়। এইসব নিয়মকানুনগুলোর মধ্যে রয়েছে— বর্ষাবাসের দিনগুলোতে কোন সামাজিক বিবাহ হতে পারবে না, কেউ কোন নতুন গৃহ তৈরী করতে পারবে না, সকলের প্রতি মধুর ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি। এই সময় প্রতিটি গৃহস্থকে পালাক্রমে বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছুয়াং বা আহার নিবেদন করা, 'পেদেসা' অর্থাৎ কল্পতরু পূজা, প্রদীপ পূজা পঞ্চশীল গ্রহণ ইত্যাদি ধর্মীয় কৃত্যাদি অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্যাং বা মন্দিরের প্রাঙ্গণে 'আকাশ প্রদীপ' জ্বালিয়ে রাখতে হবে। তারপর চারমাস অতিক্রান্ত হলে শরতের ভরা আনন্দের দিনে আশ্বিনী পূর্ণিমায় ক্যাং পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় প্রকৃতি যেন উৎসবের সাজে সজ্জিত হয়ে উঠে। উঁচু নীচু বন্ধুর বনানী নানা ফুলের বর্ণ গরিমায় জেগে উঠে। অবিরাম বর্ষণ শেষে ক্লান্ত মেঘেরা পেঁজা তুলার মতো নীল আকাশের বুকে ভাসতে থাকে। এই অপরূপ পরিবেশে 'ক্যাং পূজা' যেন নতুন জীবনের বার্তা নিয়ে হাজির হয় পৃথিবীর বুকে। তাতে আন্দোলিত হয়ে উঠে প্রতিটি মগ যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী ও বৃদ্ধ বৃদ্ধার মন। শরতের এই পবিত্র পূর্ণিমার দিন উদ্বেল হয়ে উঠে উৎসবের আনন্দে। সেদিন ভোর না হতেই সবাই স্নান সেরে নতুন পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ক্যাং পূজার জন্য তৈরী হতে থাকে। মেয়েরা পরিধান করে তাদের 'থামি' (পাছরা) 'রাংগ্মাই' জাতীয় পোষাক এবং 'ক্যাথাং' 'রুইপ্রুসি' ইত্যাদি অলংকার। ছেলেরা পরিধান করে ধুতি, লুঙ্গি ও বিভিন্ন রঙ-বেরঙের পোষাক। এরপর সবাই মিলে ক্যাং পূজাকে উপলক্ষ্য করে শোভাযাত্রার আয়োজন করে। এই শোভাযাত্রায় সকলের হাতে হাতে থাকে ফল, ফুল ও বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় আহার্য্য বস্তু তথা পূজার অর্ঘ। এই সবই ভগবান বুদ্ধের চরণতলে নিবেদন করা হয়। বর্ণাঢ্য এই শোভাযাত্রার প্রাক্কালে যুবক যুবতীদের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে পরিবেশিত হয়

তাদের ঐতিহ্যবাহী বিখ্যাত 'ক্যাং নৃত্য ও গান।' বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে যুবক যুবতীরা নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে এগোতে থাকে মন্দিরের দিকে। তাদের গানে প্রকাশ পায় জীবনযাত্রার অনাবিল ছবি। তারা সমস্বরে গেয়ে চলে, 'আমরা কৃষিজীবী। পাখীরা জেগে উঠার আগেই ভোর-সকালে আমরা নারী পুরুষ সবাই কাজে যাই, মাঠে ধান বুনি, ফসল তুলি। আমরা গান গাই—নাচে গানে জগৎকে আনন্দময় করে তুলি।'

নৃত্যগীতে যুবতীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে যখন বসুন্ধরা রূপে রঙে ভরে উঠে' তখন আমরা যুবতীরা সৌন্দর্যের সাধনায় মেতে উঠি। আমাদের মাথায় থাকে চিরুণী, খোপায় নানা রঙের বনফুল। অঙ্গে মাখি সুরভিত প্রসাধন। আমরা তখন কোন এক সময় কলসী নিয়ে পাহাড়ের খাপে খাপে বয়ে চলা ছোট্ট স্রোতস্বিনীর জল আনতে যাই। আর এমনি সময়ে পথের বাঁকে টীলার উপর গাছের ছায়ায় বসে থাকা যুবকের সুমধুর বাঁশীর ধ্বনি আমরা শুনতে পাই। তাতে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই।" এই সমস্ত গানের মধ্য দিয়ে তাদের পারস্পরিক প্রীতি, ভালবাসা ও জীবনের ছবি ভেসে উঠে।

শোভাযাত্রার সব দলগুলো মন্দিরে পেঁাছে গেলে ক্যাং পূজা শুরু হয়। তখন সমবেত ভাবে বুদ্ধের পাদমূলে যাবতীয় ফল, মূল ও অন্যান্য অর্ঘসমূহ নিবেদন করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উচ্চারণ করেন বুদ্ধের পবিত্র মন্ত্র। দুপুরের পূর্বেই পূজা শেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় নাট্যানুষ্ঠান। বিভিন্ন নাটকগুলোর মধ্যে 'ওয়ে সান্দ্রা', 'ওইপুরা', 'ভদ্র' এবং 'মন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত ক্যাং পূজার অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। [**মানিক দেব : মগ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী ক্যাং পূজা উৎসব অনুসরণে**]

মগ সমাজে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা আছে। তাদের প্রধানকে চৌধুরী বা তহশীলদার বলা হয়। সাধারণতঃ সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদা অনুসারে এঁদের নির্বাচন হয়। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে তারাই প্রধান।মৃতদেহকে দাহ করা হয়।

নোয়াতিয়া : নোয়াতিয়াকে কেউ কেউ বলেন নতুন ত্রিপুরা। আবার কারো মতে তাঁরা অপেক্ষাকৃত পরে এ রাজ্যে এসেছেন—তাই নোয়াতিয়া। "Noatias are akin to the Tripuri and Jamatia and they are supposed mixed with Tripuri and Jamatia and migrated from

the then East Pakistan. According to observation the Noatias are divided into eleven class of (1) Keoa (2) Murshing (3) Achlong (4) Garjan (5) Khailicha (6) Tonglai (7) Leitong (8) Deildak (9) Aaokia (10) Khakta (11) Totaram out these only six clans are living in Tripura". (**The tribes of Tripura.**) এই রাজ্যে ১০২৯৭ জন নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের উপজাতি বসবাস করে (১৯৭১ গণনা) ত্রিপুরার প্রায় সব মহকুমায় এঁরা ছড়িয়ে আছেন।

এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করেন। এঁদের দৈর্ঘ্য একটু খাটো এবং গায়ের রং ও তত পরিষ্কার নয়। তাঁরা খুব সৎ ও সরল জীবন যাপন করেন। তাদের পুরানো জুম চাষ প্রথা এখন আর একমাত্র অবলম্বন নয়, সমতল ভূমিতেও চাষবাস করে এবং অনেকেই সরকারী চাকুরী করে। টংঘরেই তারা বসবাস করেন। মহিলারা স্বহস্তে বাঁশের তাঁতে নিজেদের পাছড়া, রিছা প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে বাঁশের সুন্দর সুন্দর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করেন। তাদের প্রধানকে 'দলপতি' বলা হয়। তিনিই সমাজের সমস্ত অন্যায় ও অপরাধের বিচার করেন।

তাদের সমাজে সাধারণতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ বৎসর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসরের পূর্বে বিয়ে হয় না। সাধারণতঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে নিষেধ। পর্ণবিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ অনুমোদিত। সাধারণতঃ ঘটকের মারফৎ এই বিয়ে হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে 'জামাই খাটার' প্রথা প্রচলিত আছে। বিয়ের পর খুব আনন্দ উৎসাহ হয় এবং কমপক্ষে দুই দিন মদপান এবং ভোজন চলে।

কুকি ঃ কুকিরা ত্রিপুরায় অন্যদের তুলনায় অনেকটা পশ্চাদ্‌পদ। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে তাদের সংখ্যা ৭৮২৫ জন। কারো কারো মতে তারা ত্রিপুরার প্রাচীন অধিবাসী। কেহ কেহ বলেন কুকিরা জুম কৃষিক্ষেত্রের আকর্ষণে লুসাই ও মিজো পাহাড় থেকে ত্রিপুরায় আসেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "The Cuki chin tribes present an important branch or section of the Assam Indo-Mongoloids. They have Kinsmen in Burma and appear to have settled in a fairly ancient times in Manipur and Lushai hills, as well as in the Chittagong hill tracts. From Lushai and Manipur they come in large number

to Tripura state, where they form an important section of the people. These Indo-Mongoloids are known to the Assamese and Bengalees as Kukis and to the Burmese as chin and kuki chin has been adopted as a composite and inclusive name for them" (Kirata jana kriti, VOL XVI No 2 JASB P 173). কিন্তু কুকিরা তাদের কুকি নামে পরিচয় দেয় না। যে সব নামে তারা পরিচয় দেয়, সেগুলি তাদের রাজা বা সর্দারের নাম থেকে। ত্রিপুরী ভাষায় কুকিদের বলা হয় 'ছিকাম' আর কুকিদের ভাষায় কুকির প্রতিশব্দ হলো হায়েম। তারা ডার্লং নামেও পরিচিত।

তারা ১৫টি দফা বা শাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন—(১) পাইতু, (২) বেলাঠুট (৩) খাংলুমা, (৪) লাইফং, (৫) বংখই, (৬) মিজেল, (৭) নাম্‌তে (৮) ছাল্যা, (৯) ফুন, (১০) কুনতেই, (১১) লেনতেই, (১২) জংতেই, (১৩) বাংচন (১৪) বল্‌তে, (১৫) খরেং। ১৯৫৩ সালে সরকার কুকিদের সতেরটি দফার স্বীকৃতি দিয়েছেন। সরকারের আদেশটি নিম্নরূপ ঃ

"The Constitution Scheduled Tribes (Part C states) order 1951 have been amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (modification) order, 1956, according to which the enumeration of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been conducted in 1961 Census in Tripura. The 1951 list of Schedule Tribes has been modified by inclusion of seventeen sub-tribes of Kuki" সতেরটি দফা নিম্নরূপ (১) বলতে (Balte) (২) বেলাল হুট (Belal hut) (৩) ছাল্যা (Chhalya) (৪) ফুন (Fun) (৫) হাজানগু (Hajango) (৬) জংতেই (Jangtei) (৭) খরেং (Khareng) (৮) খেপং (Khepong) (৯) কুনতেই (Kuntei) (১০) লাইফং (Laifang) (১১) লেনতেই (Lentei) (১২) মিজেল (Mizel) (১৩) নামতে (Namte) (১৪) পাইতু (Paitu) (১৫) রাংচা (Rangcha) (১৬) রাংখোলে (Rangkhole) (১৭) থাংলুয়া (Thangluya)।

তাদের সামাজিক গঠনে শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে ব্যভিচারও কম। তাদের প্রধান ব্যক্তিকে রাজা বা সর্দার বলে। তাদের সর্দারকে 'লাল'ও

বলা হয়। উত্তরাধিকারী সূত্রেই তারা এই উপাধি লাভ করে। সাধারণত তারা বহু পরিবার একত্র হয়ে গভীর বনে একটি পাহাড়ের সানুদেশে বাস করে। বাসস্থান গুলোকে পাড়া বা পুঞ্জি বলা হয়। তাদের ঘর বাসের মঞ্চ দ্বারা দ্বিতল করা হয়। ঘরের উপরের ছাউনি ছন দিয়ে দেয়া হয়। মঞ্চের উপর কুকিরা বাস করে এবং নীচে পশুপাখীরা থাকে। বহুশয্যা বিশিষ্ট ঘরটির একপাশে পায়খানা তৈরী করা হয়। অভ্যাগত ব্যক্তিদের জন্য আলাদা ঘর থাকে। তারা তাদের ঘর মেরামত করে না—যখন ঘরটি বাসের অনুপযুক্ত হয় তখন সেটাকে ফেলে রেখে নতুন স্থানে নতুনভাবে তৈরী করে। এটা তাদের যাযাবরত্বের একটি নিদর্শন। উল্লেখযোগ্য—অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু দেখা যায়। গবেষকদের মতে তাদের ভাষা কগবরক ভাষা হতে উন্নত। বহু পূর্বে এরা ত্রিপ্রাদের থেকে আলাদা ভাষা ব্যবহার করতো বলে কুকি নামে অভিহিত হয়।

কৃষি তাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। জুমচাষের জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা রিয়াং ও ত্রিপুরীদের মত কতকগুলি সংস্কার পালন করে। প্রথমে জুমিয়ারা পাহাড়ের ঢালু স্থানে জুম চাষের জন্য স্থান নির্বাচন করে। ওয়খা দিয়ে স্থান নির্বাচন করে যাতে কেহ দখল করতে না পারে। জুম রোপনের পূর্বে তাদের বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। বৃষ্টির পর মাটি নরম হলে খুরপার (টাক্কল ও বলে) মত যন্ত্রের সাহায্যে কার্পাস, ধান, মিষ্টি কুমড়ো, আলু, জোয়ার, চালকুমড়া, ভুট্টা ইত্যাদি বীজ একত্র বপন করে। জুম ক্ষেতে স্ত্রীপুরুষ একত্র হয়ে কাজ করে। জুমচাষে অনেক নিয়ম কানুন তারা পালন করে। শুনা যায়, জুমে কাজ করার সময় যুবকযুবতীদের মধ্যে বিবাহের আলাপ আলোচনার সূত্রপাত হয়। পূর্বে জুমচাষের জন্য ঘরচুক্তি খাজনা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আজকাল তা' আর নেই।

কুকিরা ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। তারা ভগবান মানে। এরা ভগবানকে 'পাথিয়েন পু' বলে। শিব পুজো এদের বড় পুজো। বাঙ্গালীদের সঙ্গে এ পুজোর কোন মিল নেই। এই পুজোয় গবর বলিদান অবশ্য করণীয়। জুম-কার্যের পূর্বে এ পুজো দিতে হয়।

তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান অনেকটা রিয়াং উপজাতিদের মত। বাল্যবিবাহ প্রায় নেই। এদের মধ্যে পণপ্রথা প্রচলিত আছে—কিন্তু বাড়াবাড়ি নেই। পাত্রপাত্রীর সম্মতি হলেই সাধারণতঃ অভিভাবকেরা সম্মতি দেয়। বহুবিবাহ

সমাজসম্মত। বিবাহে কোনরূপ ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান হয় না—সকলকে ভোজ ও মদ্যপান বিয়ের বিশেষ অঙ্গ। বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজসম্মত কিন্তু ব্যভিচারের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

সাধারণতঃ মৃতদেহ নদীর তীরে সমাধিস্থ করে। পরে মদ, ভাত ও মাংস ডালি দেয়। এসকল সমাধিতে কিছু সংখ্যক পশুপক্ষীর মস্তক প্রদান করতে হয়। কুকিদের রাজা বা সর্দারের মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ নব্বইদিন পর্যন্ত কাঠের বাক্সের চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করে রেখে দেওয়া হয়। তাদের রাজার আত্মার সদ্‌গতির ও শান্তির জন্য প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে অন্ন, মাংস ও মদ বাক্সের সম্মুখে রেখে দেওয়া হয়। তারপর নানান প্রকার নৃত্য করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। তারপর সকলে মিলে ঐগুলি পান ও ভোজন করে।

তারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ থাকে। স্নানকালে অনেকেই উলঙ্গ হয়ে স্নান করে। স্ত্রীলোকেরা সাজসজ্জা করতে ভালবাসে। নানা বর্ণের স্ফটিক নির্মিত অলংকার পরিধান করে। স্ত্রী ও পুরুষেরা দীর্ঘ চুল রাখে। স্ত্রীলোকের কর্ণলতিকার ছিদ্র যত বেশী বড় হয় ততই তাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ।

যে সব খাদ্য খেলে মৃত্যু বা রোগ হয় না সে সব ছাড়া সমস্ত খাদ্যই তারা গ্রহণ করে। অর্দ্ধদগ্ধ ও শুষ্ক মাংস ও মাছ তাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য। তারা গো মাংস খায় না। সম্ভবত এটাই তাদের হিন্দুত্বের লক্ষণ। কুকিরা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, যাকে তারা জু (২য়) বলে। তারা হিংস্র স্বভাবাপন্ন, পরিশ্রমী ও সাহসী। এরা শিকারে পারদর্শী। তারা রাজাদের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুদ্ধ করেছে। (**ডঃ এস. বি. সাহার 'কুকি' প্রবন্ধ অনুসরণে**)

গারো ঃ গারোরা গারো পাহাড়ের অধিবাসী হিসাবেই পরিচিত। তবু তাদের বাসস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। এক সময় তারা ব্রহ্মপুত্র নদীর তীর ধরে আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রাজ্যে তারা সদর কমলপুর, কৈলাসহর, উদয়পুর এবং অমরপুরে বসবাস করে। এদের সংখ্যা ৫৫৫৯ জন। (১৯৭১ লোকগণনা) তাদের বিবাহ পদ্ধতিও প্রায় অন্যান্য উপজাতিদের মত। বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ অনুমোদিত।

তারা সাধারণতঃ ভাত আহার করে। নারী পুরুষ সকলেই পরিশ্রমী। খ্রীষ্টান ধর্মে তাদের প্রবল অনুরাগ। খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী, হিন্দুরা হিন্দুধর্মের আচরণ অনুযায়ী চলে। তবু লৌকিক সংস্কার বা আচরণকেও অস্বীকার করে না। জুম প্রধান কৃষি ব্যবস্থায় তারা ওয়াংলা পূজা করে—ফসলদেবতা বা শষ্যদেবীর উদ্দেশ্যে। "এই পূজাকালে অসংতাতা নামে কোন এক অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করা হয় এবং তিনিই ফসল বৃদ্ধির সহায়ক। এমনকি পোকামাকড় এবং নানারূপ বিপদ থেকে ফসল রক্ষা করার তিনিই নায়ক। ওয়াংলা পূজার দিন ধার্য করে গ্রামের কোন স্থানে বেদী নির্ণয় করা হয়। প্রথমতঃ বাঁশ দিয়ে একটি ঘোড়া তৈরী করে বেদীতে স্থাপন করতে হবে। অতঃপর পাঁঠা বানর কিংবা ইঁদুর থেকে যে কোন একটি প্রাণীর গলায় দড়ি বেঁধে তারা গ্রামশুদ্ধ ঘোরায়। পরিশেষে দা দিয়ে এক কোপে সেই প্রাণীটিকে হত্যা করে উপরে বর্ণিত ঘোড়ার পাশে বাঁশ বিদ্ধ করে রাখে। তাদের ধারণা এতে অপদেবতা ভয় পেয়ে যাবে এবং ফসল বিনষ্ট করতে সাহস পাবে না।"[৮৩]

"অতিবৃষ্টি থামানোর জন্যও গারো সামাজে এক ধরণের ব্রত পালন করে, এবং এটাকে বলা হয় 'সালাক সুয়া' ব্রত। সালাক সু আ ব্রতে···মাটির কৃত্রিম পাহাড়ের চারপাশে গ্রামাবাসী হাতে অগ্নিপিণ্ড নিয়ে নৃত্য করে। তাদের বিশ্বাস এতে বৃষ্টি থেমে যাবে এবং খুব কড়া রোদ উঠবে। সালাক সু আ ব্রতের বাংলা নাম 'সূর্য পোড়ানো' ব্রত।"[৮৪] আবার বৃষ্টি আবাহন জানিয়ে ওয়াচিল ক্রিতা ও সালগুরুয়া ব্রত পালন করা হয়। গারোদের অন্য নাম মান্দাই। সম্ভবতঃ এই রাজ্যের রাজধানী আগরতলার সন্নিকটে অবস্থিত। মান্দাইর নাম তাদের নামানুসারে হয়।

সাঁওতাল ঃ সাঁওতাল উপজাতিদের আদি নিবাস কোথায় এ নিয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। গবেষকদের অভিমত তারা ভারতের বাইরে থেকে অষ্ট্রেলিয়া এবং তার সন্নিহিত দেশ হতে আগমন করে। গবেষকরা বলেন, "In course of time the Santals were found in the Chhotonagpur platean and in the adjoining districts of Midnapur and Singbhum and had made movements towards the north during the close of the eighteenth century···ultimately in 1836, the British Government allotted them a permanent

territory to settle in peace. This area came to be known as 'Santal Pargana'…the Santala migrated from Chhotonagpur and Santal Parganas to some districts of Bengal and plantation areas of Assam" কালক্রমে আসামের চা বাগানে কাজ করতে করতে চা বাগানে সম্প্রসারণ ঘটায় এরা ত্রিপুরায়ও প্রবেশ করে। এরা সদর, খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্মনগর, বিলোনীয়া সাবরুমে ছড়িয়ে আছে। এ রাজ্যে এদের সংখ্যা ২,২২২ জন (১৯৭১ গণনা)।

তাদের সামাজিক গঠন সুন্দর। তাদের মধ্যে আত্মকলহ প্রায় নেই, এবং এরা শান্ত, বিনম্র ও আত্মনির্ভরশীল। তাদের মধ্যে অলিখিত কতগুলি নিয়ম প্রচলিত আছে যা সাঁওতাল উপজাতির সবশ্রেণীর লোকেরা মেনে চলে।

এদের নাসিকা প্রশস্ত ও উপরিভাগ চ্যাপটা, মস্তক লম্বা ও মস্তকের খুলি গোলাকার, অক্ষি গোলকের কপিলাভাস, ঠোঁট পুরু, বর্ণ কালো ও পিঙ্গল, চুল কালো, মোটা ও কোঁকড়ানো। পুরুষরা বিরল গুম্ফ শ্মশ্রুহীন বললেও চলে। ভাত তাদের প্রধান খাদ্য। তারা নানা কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে। লাল ও সাদা পিঁপড়া খেতে খুব ভালবাসে। এরা বাঘ, শুকর, কাক, ইঁদুর, ব্যাঙ ও সাপ ইত্যাদির মাংস খায়, নানাবিধ ফুল ও বাঁশের কুরুল খায়। মদ্যপান এদের সমাজে বিশেষ প্রচলিত। তারা বাড়ীতে ছোট গামছা ব্যবহার করে এগুলিকে পাঞ্চী বলা হয়। রমণীরা অলংকার ব্যবহার করে। এদের মধ্যে উল্কি পরার অভ্যাস আছে। তাদের ভাষা সম্পর্কে গিয়ার্সন সাহেব বলেন, "Santali literally means 'the language of the Santals'… there are only two dialects and even these do not differ much from the standard form of speech …Santali has to some extent, been influenced by the neighbouring Aryan language. This influence is, however, mainly confined to the vocabulary, though we can also see how Aryan suffixes and Aryan Syntax are beginning to make themselves felt, and some of the most usual propositions are perhaps Aryan."

সাঁওতাল কতকগুলি শাখায় ও দফায় বিভক্ত, যথা ঃ (১) হানসডাক্ (২) মুরমু (৩) কিস্কু (৪) হেমব্রুম (৫) মাণ্ড্রী (৬) শোরেন (৭) টুডু (৮) বাসকি (৯) বেশরা (১০) পার্নারিয়া (১১) কনরেন (১২) গন্ধার

ইত্যাদি। তাদের সমাজব্যবস্থা গোষ্ঠীতন্ত্র অর্থাৎ যে সমাজে পরিবারের কর্তা পিতা সেই সমাজব্যবস্থা তাদের সমাজে প্রচলিত। তাদের মধ্যে তিন প্রকার বিয়ে প্রচলিত। যথা, (ক) আলোচনার মাধ্যমে (Marriage by negotiation), (খ) প্রেম করে বিয়ে (Marriage by love), (গ) কৌশলে ধরে এনে বিয়ে (Marriage by capture). বিধবা বিবাহ সমাজ অনুমোদিত।

মৃতদেহ দাহ করা হয়। প্রথমে তারা মৃতদেহকে বাইরে রেখে, তৈল ও হলুদ দিয়ে মর্দন করে, তারপর গোবর জল দিয়ে তাকে শুদ্ধ করে। মৃতদেহের ডান হাতে কিছু ধান দেওয়া হয় এবং কিছু ধান মৃতদেহের চতুর্দিকে ছড়ান হয়। তারপর মৃতদেহটিকে শেষবারের মতো স্নান করিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহ পোড়ান হয় এবং অস্থিগুলি শালবৃক্ষের নিকটে প্রোথিত করা হয়। তাকে তাদের ভাষায় জিলিং দাহার উৎসব বলা হয়।

তারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হলেও animism-এ বিশ্বাসী। ত্রিপুরায় বেশ কিছু সাঁওতাল খৃষ্টানধর্মে বিশ্বাসী। তাদের প্রধান দেবতা 'সারংবুড়ো'। এ দেবতার পুজো করার সময় একটি শ্বেত মুরগী, একটি শ্বেত ছাগ ও দেশী মদ পুজাসামগ্রী হিসাবে অবশ্যই দিতে হয়। তারা বছরে বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত দেবতার পুজো করে—(১) সারং বুড়ো (২) মনরেনকো টুরুইকো (৩) জাহের এরা (৪) গোশেনী এরা (৫) মনজিহি হারান (৬) কালাচান্দি (৭) কালামহিচান্দি (৮) নাশান কুদরা ইত্যাদি। এ ছাড়াও পাহাড়ে পর্বতে নানা অশরীরি আত্মার পুজো-অর্চনা করা হয়। যেমনঃ (১) বেড়াপাট (২) মানসর পাট (৩) বুদ্ধ পাহাড় (৪) পৌরীপাট (৫) চন্দপাট (৬ দর্শনী পাট ইত্যাদি। শিক্ষার দিক এখনও খুব পেছনে। তাদের মধ্যে ২০২ জন শিক্ষিত। (১৯৭১ লোক গণনা)[৮৫]

লুসাইঃ অনেকে মনে করেন লুসাই উপজাতি লুসাই বা মিজো পাহাড় থেকে এই রাজ্যে আগমন করেন। সম্ভবত তারা এই রাজ্যে প্রচুর পরিমাণ জুম চাষের উপযোগী জমির সন্ধান পেয়ে আগমন করে। কাছাড় বাসীরা 'মুণ্ড শিকারী'দের 'লুচাই' বলে। 'লুসাই' শব্দ সম্ভবতঃ 'লুচাই' থেকে এসেছে। বর্ত্তমানে তারা মুলতঃ জম্পুই পাহাড়ে বসবাস করে। জম্পুই পাহাড় ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। তারা খ্রীষ্টান ধর্মে বিশেষ অনুরক্ত এবং শিক্ষায় খুব অগ্রসর। বর্ত্তমানে এই রাজ্যে তাদের সংখ্যা ৩৬৭২ জন (১৯৭১ লোকগণনা)।

তারা টংঘরে বসবাস করে। বর্ত্তমানে আধুনিক জীবন যাপন করে এবং সেইরূপ পোষাক পরিচ্ছদও ব্যবহার করে। কুকিদের মত লুসাইদেরও রাজআমল থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী 'রাজা'রা সমাজপতি।

জুমচাষ ও শিকার তাদের প্রধান জীবিকা। এরা খ্রীষ্টান ধর্মে বিশেষ প্রভাবিত হলেও নিজস্ব বিশ্বাস থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তাদের মতে পাথিয়ান এই বিশ্বের স্রষ্টা। কিন্তু তারা হোয়াই নামে এক অপদেবতাকেও বিশ্বাস করে—যিনি সমাজের রোগ, জরা, দুঃখ-দারিদ্র্য এবং সকল প্রকারের অমঙ্গলের সূচনা করে। "হোয়াই-এর বিচরণক্ষেত্র পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, বন-জঙ্গল, মাঠ-ঘাট সর্বত্র। আসলে হোয়াইকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই তাদের আর কোন চিন্তা নেই। সুতরাং সর্বশক্তিমান পাথিয়ান তাদের কাছে যতটা শ্রদ্ধার পাত্র হোয়াই-এর ভূমিকা তার চেয়ে বেশী। কেননা, পাথিয়ান হলেন সব সময় মঙ্গলকামী দেবতা। তিনি কারো ক্ষতি সাধন করতে পারেন না। ফলে যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা প্রচুর সেখানেই তাদের ভক্তির অর্থ সীমাহীন। কাজেই হোয়াই-এর উদ্দেশ্যে তাদের প্রার্থনা উৎসর্গ নিয়োজিত। ভয় যে আদিম সমাজের ধর্মের অন্যতম অঙ্গ লুসাই কুকি সমাজে হোয়াইর প্রভাব তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

হোয়াই দুই প্রকারের—তুই হোয়াই এবং রাম হোয়াই। তুই হোয়াই-এর বিচরণক্ষেত্র জলজ অঞ্চল যেমন—নদী, সমুদ্র, ঝর্ণা, ঝিল ইত্যাদিতে। আর রাম হোয়াই-এর আবাসভূমি স্থল-কেন্দ্রিক পাহাড়, পর্বত, গাছ-বৃক্ষ, মাঠ, ক্ষেত ইত্যাদিতে। প্রার্থনা ও উৎসর্গের মাধ্যমে হোয়াইকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে লুসাই ও কুকি সমাজ সহজভাবে জলে ও স্থলে চলাফেরা করতে পারে না।...হোয়াই-এর নামে উৎসর্গ না করে গহীন অরণ্যে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এমনকি মেয়েদের ঋতুশ্রাবও সংঘটিত হয় রাম হোয়াই-এর জোর জবরদস্তিমূলক সঙ্গম থেকে। কাজেই যুবতী মেয়েরা একাকী অরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। এমনকি দুপুর রাত্রে একাকী জরুরী কাজে বাইরে গিয়েও মেয়েরা যে, হোয়াই-এর কবলে পড়ে পর্যুদস্ত হয় এমন নজিরও যথেষ্ট রয়েছে।...অন্যান্য আদিম সমাজের মতো লুসাই কুকিরাও বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর তাদের আত্মাবস্তু তাদের আশে-পাশেই ঘোরাফেরা করে এবং একমাত্র 'থাংচুআ' পূজার মাধ্যমেই তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। তা না হলে জীবিত ব্যক্তিদের পক্ষে অসুবিধার কারণ। এমন কি তারা আরও

বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর সব আত্মা 'মিথিখুআ' নামক স্থানে মিলিত হয়।

'মিথিখুআ' মৃত ব্যক্তিদের প্রাণ বলে কথিত। এখানে মিলিত হওয়ার পর পাপ-পুণ্য অনুযায়ী আত্মারা আবার মনুষ্য সমাজে ফিরে যায়। অসৎ লোকের আত্মা তুই হোয়াই এবং রাম হোয়াই রূপে বিচরণ করে এবং সৎ লোকের আত্মা 'পিয়ালরাল' নামক শান্তিময় স্বর্গ রাজ্যে বিচরণ করে। অসৎ লোকের আত্মা যাতে হোয়াই-এ রূপ লাভ করতে না পারে এ জন্যেই 'থাংছুআ' পূজার আয়োজন করা হয় এবং এটা পূর্বপুরুষ পূজারই নামান্তর।"[৮৬]

উছই ঃ এরা রিয়াং সম্প্রদায়েরই অংশ। বর্ত্তমানে এই রাজ্যের অমরপুর, বিলনীয়া, উদয়পুর ও ধর্মনগর মহকুমায় এরা বসবাস করে। এদের সংখ্যা ১০৬১ জন। (১৯৭১ গণনা)

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের শাসনকালে রাজকার্য পদ্ধতির বিরোধীতা করায় কতিপয় রিয়াং কারারুদ্ধ হয়। এতে সমগ্র রিয়াং জাতি স্বভাবসুলভ উগ্রতাবশে রাজদ্রোহিতা করলে এ রাজ্যের রিয়াং সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে যোগদান করার জন্য চট্টগ্রামের রিয়াংদের আহ্বান করে। তারা সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু আসার পথে কর্ণফুলি নদীতে বন্যা হওয়ায় তাদের আসতে দেরী হয়ে যায়। ফলে বিদ্রোহী রিয়াংরা রাজার কাছে পরাজিত এবং বন্দী হয়। মহারাজ তাদের শিরচ্ছেদের নির্দেশ দেন।। জনশ্রুতি আছে যে, রাজমহিষী গুণবতী প্রজাদের প্রতি করুণাবশতঃ এক নিশীথে বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেখা করতে যান। রাজমহিষীর আচরণে বিদ্রোহীরা মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাঁকে ভগবতী জ্ঞানে মা সম্বোধন করেন। গুণবতী বললেন, তোমরা মা সম্বোধন করে আমার পুত্রস্থানীয় হয়েছো। সুতরাং তোমরা আমার স্তন দুগ্ধ পান করে এই প্রতিজ্ঞা কর যে, কোনকালে তোমরা ত্রিপুরা রাজের বিরোধীতা করবে না। বিদ্রোহীরা রাণীর নির্দেশ মেনে নিলে—রাণীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা তাদের মুক্তি দেন। কর্ণফুলীর অপর পার থেকে রিয়াং-রা এলে হয়তো তারা পরাজিত হতো না। তাই রিয়াং সমাজ তাদের ওলছই (ত্রিপুরা ভাষায় ওল অর্থ পশ্চাৎ। ছই অর্থ স্বীকার হইয়া অর্থাৎ পশ্চাৎ স্বীকৃত) হয়ে আগত বলে এদের সমাজচ্যুত। এরাই বর্ত্তমানে উছই নামে পরিচিত।

এরা শাক্ত ধর্মে বিশ্বাসী। আচার ব্যবহারে রিয়াংদের মতই। তবে

চট্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে থাকায়—পূজাপার্বণে ও দেবমন্দিরাদি নির্মাণে মগদের অনুকরণ করে থাকে।[৮৭]

॥ ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী উপজাতিদের পরিসংখ্যান ॥

ক্রমিক সংখ্যা	উপজাতি সম্প্রদায়	লোকসংখ্যা	শিক্ষিত	শতকরা হিসাব
১.	ত্রিপুরা বা ত্রিপুরী	২৫০৩৮২	৪৪৫৫৮	৫৫ ৫৭%
২.	রিয়াং	৬৪ ২২	৫০৩৯	৪'৩৬%
৩	জমাতিয়া	৩৪১৯২	৫০৬৩	৭'৫ %
৪.	চাকমা	২৮৬৬১	৩৬ ৮	৬'৩৬%
৫.	হালাম	১৯ ৭৬	১৮.৩	৪'২৩%
৬.	নোয়াতিয়া	১০২৯৭	৬ ৭	২'২ %
৭.	মগ	১৩২৭৩	১৪৯৪	২'৯৪%
৮.	লুসাই	৩৬৭২	২৩৯৭	৮১%
৯.	উছই	১০৬১	৩৬	'২১%
১০.	কুকি	৭৭৭৫	১.১৩	১'৭২%
১১.	গারো	৫০৫৯	১১২৯	১'২৩%
১২.	মুণ্ডা	৫৩৪৭	২১৫	১'১৮%
১৩.	ওরাং	৩৪২৮	২০১	'৭৮%
১৪	সাঁওতাল	২২২২	২০১	'৪৯%
১৫.	খাসিয়া	৬৯১	৩৪	Negligible
১৬.	ভিল	১৬৯	২৪	Negligible
১৭.	কইমল	—	—	—
১৮.	ভূটিয়া	৩	×	Negligible
১৯.	লেপচা	১৭৫	৫	Negligible

জেলাভিত্তিক উপজাতি লোকসংখ্যা ১৯৭১

ক্রমিক সংখ্যা	উপজাতি সম্প্রদায়	পঃ জেলা	উঃ জেলা	দঃ জেলা
১	ত্রিপুরী	১৬২৫৬৫	৩৬১৫৯	৪৮৬৫৮
২	রিয়াং	৭২৩৫	৫১৬৩৮	২৫৮৪৯
৩	জমাতিয়া	৬৬৭৭	১৭১	২৭৩৭৭
৪	চাকমা	৬৪	১৮৩৭৪	১০২২৪
৫	হালাম	৫১০৯	৬৯৫২	৭০১৫
৬	নোয়াতিয়া	৩৭৮০	১২৮৯	৫২২৮
৭	মগ	১৯১	১১৩৭	১১৯৪৫
৮	লুসাই	১১৪	৩৫২৫	৩৩
৯	উছই	১	৫৬	১০০৪
১০	কুকি	১৯৩৫	৩২২৭	২৬১৩
১১	গারো	১২৮০	২০২৫	২২৫৪
১২	মুণ্ডা	৩২৯১	১৪৩২৫	৩২৪
১৩	ওরাং	১৬৭৬	১৬৭৩	৭৯
১৪	সাঁওতাল	১৫৫৪	২২১	৪৪৭
১৫	খাসিয়া	৯৪	৩৯৭	—
১৬	ভিল	—	১০২	৬৭
১৭	কইমল	—	—	—
১৮	ভুটিয়া	৩		—
১৯	লেপচা	৬	১৬৯	—

মোট উপজাতি জনশক্তি (১৯৭১ লোকগণনা অনুযায়ী)

রাজ্য/জেলা	মোট জনসংখ্যা	মোট উপজাতি জনসংখ্যা	মোট উপজাতি জনসংখ্যা অনুযায়ী জেলাভিত্তিক শতকরা হিসাব	সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় উপজাতি জনসংখ্যার শতকরা হিসাব
১	২	৩	৪	৫
ত্রিপুরা	১৫৫৬৩৪২	৪৫০৫৪৪	১০০%	২৮.৯ %
পঃ ত্রিপুরা	৭৫১৬০৫	১৯৮৮৭৮	৪০.১৪%	২৬.৪৬%
উত্তর ত্রিপুরা	৪০৫০০৯	১০৮৫৪০	২৪.১০%	২৬.৮০%
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৩৯৯৭২৮	১৪৩১১৯	৩০.৭৬%	৩৫.৮%

ত্রিপুরা উপজাতি জনসংখ্যা : মহকুমা ভিত্তিক

মহকুমা	উছই	ওরাং	কুকি	খাসিয়া	গারো	চাকমা
অমরপুর	৬৬৫	—	২০১৭	—	২৯২	৬০৫০
আগরতলা	১	৯৬	৬০৩	—	১১৫৫	৫৯
উদয়পুর	৬	২৪	৫৮৭	—	১৮১৮	২২৮
কমলপুর	—	৪৪	৪৬০	৬৩	১১৬৫	২৪৭
কৈলাসহর	—	১৩৬০	২৪০৪	২০০	৮১৮	৮৯১২
খোয়াই	—	৭০০	১৩৩২	৯৪	১১১	৫
ধর্মনগর	৫৬	২৬৯	৩৬৩	১৭৪	৪২	৯২১৪
বিলোনীয়া	৩৩৩	৩১	—	—	১৪৭	৯৫৯
সাবরুম	—	২৪	—	—	—	২০৮১
ত্রিপুরা মোট	১০৬১	৩৪২৮	৭৭৬৬	৪৯১	৫৫৫৩	২৮৬৬৫

মহকুমা	জমাতিয়া	ত্রিপুরা	নোয়াতিয়া	ভিল	ভুটিয়া	মগ
অমরপুর	১০২৮১	১০৪৪৫	২৩১৪	—	—	৭৮৫
আগরতলা	২০২০	১০৬৫১৪	২	—	৩	২৫
উদয়পুর	১৬০৫[illegible]	৩৯৬০	১৯৮৯	—	—	—
কমলপুর	২৭	১৪৭২৯	১২৮৮	৫১	—	১০৯৭
কৈলাসহর	১৪৩	১৯৬৪৪	—	—	—	৩৬
খোয়াই	৪০৬৩	৫০৭০১	১৯৯৪	—	—	১৩০
ধর্মনগর	১	১০৮৬	১	৫১	—	৪
বিলোনীয়া	১০৩৮	১৭১৬০	৯২৫	৬৭	—	৫৭৯৪
সাবরুম	—	১৭০৯৯	—	—	—	৫৩৬৬
সোনামুড়া	৫৬১	৮৩৫০	১৭৮৪	—	—	৩৬
ত্রিপুরা মোট	৩৪১৯২	২৫০৩৮৮	১০২৯৭	১৬৯	৩	১৩২৭৩

মহকুমা	মুণ্ডা	রিয়াং	লুসাই	লেপচা	সাঁওতাল	হালাম	অনির্দিষ্ট	মোট
অমরপুর	—	১৩৬৫৩	২	—	—	৩৭৬১	—	৫০৮৭৪
আগরতলা	১৩৪১	৩০০	১০২	৬	৬৩৮	২১৫৯	—	১১৫৯৪০
উদয়পুর	১৫	২৯৫৭	—	—	—	৩৫৫২	—	৩১১৯৪
কমলপুর	৩৪৭	২৭১০	১	—	৮০	৪৫৩২	—	২৫৮০১
কৈলাসহর	৭১২	৭৭২১	৭২	—	৭৮	৯৯০	—	৪৩০৯০
খোয়াই	২২৫০	৬৯১৪	১২	—	৯১৬	২৪৭৯	—	৭১৭০১
ধর্মনগর	৩৭৩	২১২০৭	৩৪৫২	১৬৯	৬৩	২৪৩০	—	৩৯৬৫৬
বিলোনীয়া	২৮২	৯২৩৯	৩১	২	৪৪৭	২	—	৩৬৪৫৪
সাবরুম	২৭	—	—	—	—	—	—	২৪৫৯৭
সোনামুড়া	—	২১	—	—	—	৪৭১	—	১১২৬৭
ত্রিপুরা মোট	৫৩৪৭	৬৪৭০২	৩৬৭২	১৭৭	২২২২	১৯০৭৬	—	৪৫০৫৪৪

ত্রিপুরার ৪০% ভাগ লোক শিক্ষিত। উপজাতির সংখ্যা হলো ১৫%। শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতিরা রাজআমল থেকে অনাদরে অবহেলায় আছে। উপজাতিদের নিজস্ব ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে, ইতিহাস আছে। কিন্তু তাদের ভাষার কোন স্বীকৃতি স্বাধীনতার পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরেও লাভ করেনি। ফলে শিক্ষার বিকাশ হয়েছে ব্যাহত। কবি বলেছেন ঃ

"নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?"

কবির এই বক্তব্য কোন প্রদেশিকতার বিষয় নয়—কারণ মাতৃভাষা মাতৃস্তন্য সমতুল (রবীন্দ্রনাথ)। সহজভাবে ভাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বা ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা অপরিহার্য। শিশুদের ক্ষেত্রে অন্য ভাষা ভাব গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবল বাধা। ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতিরা স্বাভাবিক কারণেই পশ্চাৎপদ।

ত্রিপুরায় ১৮৪জন রাজা মহারাজা রাজত্ব করেন। তারাও কগবরক ভাষার কোন উন্নতি করেননি। বরং ত্রিপুরার মহারাজারা বাংলা ভাষায় চর্চা ও বাংলা সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বাঙালীদের ঋণে আবদ্ধ করেছেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তাঁদের বাঙলা প্রীতির উল্লেখযোগ্য নমুনা বলা যেতে পারে ঃ

১. "এখানকার রাজভাষা বাঙ্গালা। বাঙ্গালাতেই সরকারী লিখাপড়া হওয়া সঙ্গত। ইদানীং কোন কোন স্থলে সরকারী কার্য্যে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার হইতেছে। ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। যাহাতে এইরূপ কার্য্য না হয় তাহার প্রতিবিধান করিয়া দিবে। অবশ্য যে কার্য্যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার অনিবার্য্য তথায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। যেমন Polittical Depth. এরূপ স্থল ব্যতীত অনর্থক ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিয়া প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না" [মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ২-৯-৮১ ইংএ লিখিত পত্র]

২. "সারকুলার নং ৩ ঃ এ রাজ্যের অফিস ও আদালত সমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্ববিধ রাজকার্যে আবহমানকাল হইতে বাঙ্গালাভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য

বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রচলন আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এ বিষয়ে স্থায়ী অভিমত বারম্বার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহাদিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্মচারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে।.........

কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কার্যকারকের বাঙ্গালা ভাষা জানা না থাকিবার দরুণ অথবা উক্ত ভাষায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরী ইত্যাদি অন্যভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গানুবাদ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।" [রাজমন্ত্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মার ১৩২৪ ত্রিপুরাব্দে অফিস ও আদালত সমূহের বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হওয়া সম্বন্ধে দেয় আদেশ]

৩. কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা বাংলা ভাষা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উৎসাহ প্রকাশ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সোনার চেনের সহিত একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তোর চেইনের ঝলমলানির সঙ্গে যে মোহর চক্ চক্ করিতেছে, ইহা কোন্ মোহর?' অমি বিনম্রবচনে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা) ইহা আমাদের রাজার মোহর। তিনি হাতে করিয়া পাঠ করিলেন 'শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণপদ শ্রীযুত মাহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, শ্রীশ্রী মহারাণী গুণবতী দেব্যা।' ইহা পাঠ করিয়াই তিনি পুলকিত হইয়া উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে বলিয়া ছিলেন, "ইহাতে যে বাঙ্গালা ভাষার ছাপা, তবে আমার বাঙ্গালা রাজভাষা?" এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া যান।" (**ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কুমিল্লা শাখার বিশেষ অধিবেশনে পঠিত**).

বাংলাভাযার প্রতি ঐতিহাসিক কারণে হোক বা প্রয়োজনে হোক এই প্রীতি বাংলাভাষার সমৃদ্ধির কারণ হয়েছে। এবং এর ফলস্বরূপ বাংলাভাষা ত্রিপুরা রাজ্যের স্থায়ী সরকারী ভাষা হয়ে যায় এবং তৎকালীন এইরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির ভাষা কগবরক অবহেলিত হয়, সেই ভাষার কথ্যরূপকে লেখ্যরূপ

দেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা নেয়া দরকার ছিল তা হল না। কগবরককে ত্রিপুরার সরকারী ভাষা করার কোন চেষ্টা হয়নি। অরণ্যময় ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা মাতৃভাষার লেখ্যরূপের অভাবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়। এর ফলে শুধু উপজাতি জীবনে অশিক্ষা নয় রাজ্যেও এর গুরুতর প্রভাব পড়ে। "বাংলা ভাষা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভের পর ত্রিপুরায় এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লেখাপড়া জানা প্রচুর সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দেয়। ত্রিপুরার মূল অধিবাসী উপজাতিদের মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া জানা লোক পাওয়া তো দূরের কথা, এমন কি বাংলাভাষা বুঝতে পারেন এমন লোকের সংখ্যাও তখন অত্যন্ত বিরল ছিল। কাজেই ত্রিপুরার সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার প্রয়োজনে প্রচুর সংখ্যক বাঙ্গালী আমলা কর্মচারী বাংলাদেশ থেকে আমদানী হতে থাকে। ফলে ত্রিপুরার জনসংখ্যা সব উপজাতি হলেও অফিস আদালতে শতকরা একশত জনই বাঙ্গালী কর্মচারীতে ভরে যায়। সিংহাসনের মালিক একমাত্র রাজাকে বাদ দিলে পিয়ন থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকল পদ বাঙ্গালীদের দখলে চলে যায়।...... ত্রিপুরার অধিবাসী উপজাতীয়রা অত্যন্ত অনগ্রসর।......কৃষিতে তখনো উপজাতীয়েরা তেমন আকৃষ্ট হন নাই। ফলে, বাংলা দেশের সীমান্তবর্ত্তী ত্রিপুরার সমতল ভূমিতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু কৃষকের আগমন ঘটে। এভাবে ত্রিপুরা ভূমণ্ডলে সমতল ভূমির একটা বিরাট অংশ তাঁদের দখলে চলে যায়। আর ব্যবসা বাণিজ্যও বাঙ্গালী হিন্দুদের একচেটিয়া হয়ে উঠে। তাই, বাংলাভাষা কেবলমাত্র ত্রিপুরার সরকারী ভাষার স্থানই দখল করে নাই, কালক্রমে ত্রিপুরার বাণিজ্যিক ভাষার স্থানও লাভ করে। ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা, বাজার সদাই করা প্রভৃতি আদান প্রদানের ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে।

...ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ভাষা ত্রিপুরার সরকারী ভাষার স্থান দখলের ফলে ত্রিপুরার উপজাতি মধ্যবিত্ত সমাজে এত নূতন ভাবধারার রূপান্তর ঘটে। ত্রিপুরার রাজারা বাংলাভাষাকে রাজপরিবারের মাতৃভাযায় পরিণত করেন। এভাবে কালক্রমে বাংলাভাষা শুধুমাত্র রাজপরিবারের মাতৃভাষাতেই পরিণত হয় নাই— আগরতলা সহরবাসী উপজাতিদেরও মাতৃভাষায় পরিণত হয়।

সামন্তবাদী সমাজে রাজা ও জমিদাররাই সমাজের নেতা। তাই রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে, সাধারণতঃ সমাজের মধ্যবিত্তরা তারই দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন। তাই রাজাদের অনুকরণে আগরতলা সহরের উপজাতিরাও রাজপুরুষের পদাংক অনুসরণ করে কগবরক ভাষায় কথা বলা বন্ধ করে দেন। বাংলা ভাষায় কথা বলা সুরু করেন। কেবল ঘরের বাইরে নহে, ঘরের ভেতরেও আগরতলা সহরবাসী উপজাতিরা বাংলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে আরম্ভ করেন। এভাবে বাংলা তাদেরও মাতৃভাষায় পরিণত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সদ্য মধ্যবিত্তরূপে উদ্ভূত একমাত্র রাজানুগ্রহ 'ও রাজবাড়ী থেকে প্রাপ্ত মাসিক চৌথা বা ধর্মাহ অর্থাৎ পারিবারিক ভাতা ভোগী আগরতলা সহরবাসী এই নয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী উপজাতিরা আধা বাংলা ও আধা কগবরক ভাষার জন্ম দেয়। এই মিশ্র ভাষায় কথা বলে তাঁরা কৃতার্থ বোধ করতে থাকেন। কগবরক ভাষা পরি-ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্য চর্চা, বাঙ্গালীদের নৃত্যগীত, ধর্ম-কর্ম, আচার অনুষ্ঠান অনুকরণে গা ভাসিয়ে দেন। বাংলা ভাষার কীর্ত্তন, সংগীত, যন্ত্রসংগীত প্রভৃতি চর্চায় মেতে উঠেন। কগররক যন্ত্রসংগীত যেমন, ছাইন্দা, চঙপ্রেঙ, ছুমুই প্রভৃতির চর্চা আগরতলার উপজাতিদের সমাজ দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নেয়। এমন কি এক সময় গেছে যখন এই আগরতলার উপজাতিরা কগবরক ভাষীদের নিজস্ব গান, বাজনা চর্চা করাটাকে নিকৃষ্ট কাজ ও লজ্জাজনক মনে করতেন। ফলে এই অংশীয় উপজাতিরা উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক-চ্যুত হয়ে আপন জাতি গোষ্ঠীর সমাজদেহ থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে নিজস্ব সব কিছু ভুলে গিয়ে একটা আত্মবিস্মৃত উপজাতি গোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কখন থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার রেকর্ড আমার হাতে নাই, কিন্তু দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই এই প্রক্রিয়ার একটা চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে।"[৮৮]

এ ছাড়াও ত্রিপুরার মহারাজারা আগরতলার উপজাতিদের 'ঠাকুর সম্প্রদায়ে' চিহ্নিত করেন। এবং এক একজনকে বড় ঠাকুর উপাধি দিয়ে 'পাহাড়ের এক এক দফা উপজাতিদের মিছিফ' (সমাজপতি) হিসেবে নিযুক্ত করেন। এর ফলে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা আপন ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলেনি। পাহাড়ের শিক্ষিত কিছু যুবক এর বিরুদ্ধে এগিয়ে এলেন এবং গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার আলো পৌছিয়ে দিতে চাইলেন। মহারাজারা শহরে ২/৪ টা স্কুল স্থাপন করেই শিক্ষার দায়িত্ব শেষ করেছিলেন। এই সমস্ত উপজাতি যুবকরা গ্রামে গঞ্জে নিজেদের চেষ্টায় বেসরকারীভাবে প্রচেষ্টা নিলেন কিভাবে গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে নেয়া যায়। 'জনশিক্ষা 'সমিতি'র নামে তাঁরা এলেন। ১৯৪৫ সালে এই সমিতি আত্মপ্রকাশ করে।

দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে জনশিক্ষা সমিতি আন্দোলন শুরু করে। "জনশিক্ষা সমিতি মূলতঃ উপজাতি সদস্যদের নিয়েই গঠিত। আর্থিক, সামাজিক এবং শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ অবস্থায় বিক্ষুব্ধ মানসিকতার তাড়নায় শিক্ষাপ্রাপ্ত উপজাতি অংশ এগিয়ে এসেছিল নিজেদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে নি। সমাজ সংস্কার মূলক কাজেও সমিতি অগ্রসর হয়েছিল। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম, পশ্চাদপদ অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তা যদি একটা বিশেষ পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জন্যও হয়ে থাকে তথাপি সেই আন্দোলন গণতন্ত্র-বিরোধী হতে পারে না। বরঞ্চ তা গণতন্ত্রের অগ্রগতির সহায়কই হয়ে থাকে। জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্য ছিল এখানেই।

একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে জনশিক্ষা সমিতি শুধু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বা উপজাতি সংখ্যা-গরিষ্ঠ জায়গায় স্কুল স্থাপন করেছিল তা নয়, যেখানেই নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হয়েছিল সেখানেই স্কুল প্রতিষ্ঠান জন্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা স্কুলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। লালসিং মুড়া ও বিশ্রামগঞ্জের স্কুল জনশিক্ষা সমিতির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, যে গুলো পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে সিনিয়র বেসিক ও হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছিল। এ প্রকার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।...জনশিক্ষা সমিতির ক্রিয়া-কলাপ সমস্ত তরফ থেকেই অকুণ্ঠ সমর্থন ও শুভেচ্ছা লাভ করেছিল। কারণ, সমিতির চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মানবসেবামূলক এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির উর্দ্ধে। গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা তার কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছিল।

অনুন্নত পেছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মুক্তির পথ বা তাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়েছে তখনই যখন সংখ্যাগুরু উন্নত অংশের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন লোকেরা

তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকার আমদানীকৃত নিগ্রোদের দাসত্ব থেকে মুক্তি সম্ভব হয়েছিল আমেরিকার উন্নত শ্বেতকায় শাসকগোষ্ঠীর মানবিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বলেই। ত্রিপুরায় জনশিক্ষা সমিতির মাধ্যমে পশ্চাদপদ, বঞ্চিত উপজাতিদের শিক্ষা-দীক্ষায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজাতিরা নিজেদের সংগঠিত করেছিল তার পেছনে কমরেড বীরেন দত্তের মত লোক এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মিঃ ব্রাউন সাহেব তার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়ে ছিলেন অ-উপজাতির মানবিকাবোধসম্পন্ন সমস্ত অংশের লোক।"[৮৯]

সমিতির উদ্যোগে ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে ৪৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বে-সরকারী ভাবে গড়ে উঠে। ঐ বিদ্যালয়গুলি অধিগ্রহণের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৬ সালের মধ্যে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর (তদানন্তীন শাসক) মাণিক্য বাহাদুর ৩০০টি বিদ্যালয় অধিগ্রহণ করেন।

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্টের পর কিছুকাল কংগ্রেস প্রভাবে থাকার পর ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভূত হয়। তারপর শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতই এখানে প্রচলিত হয়। কিন্তু কগবরক ভাষীদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তাদের ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত কগবরক ভাষায় কোন লিপি না থাকার জন্যই অগ্রসর হননি। এছাড়া কগবরক ভাষাকে লেখ্যরূপ দেওয়ার সরকারী কোন উদ্যোগও দেখা যায় না। ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগ বিভিন্ন সময় দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ দশরথ দেববর্মার বক্তব্য উল্লেখ্য, "ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে স্বর্গীয় রাধামোহন দেববর্মা মহাশয় সেই প্রচেষ্টা নেন। কিন্তু সেটা ছিল নেহাৎ ব্যক্তিগত ও সীমিত প্রচেষ্টা। তাঁর সেই প্রচেষ্টার পেছনে আগরতলা সহরবাসী লেখাপড়া জানা অন্যান্য কগবরক ভাষী উপজাতি ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগ ছিল কিনা, তাঁর সেই প্রচেষ্টার প্রতি তাদের আন্তরিক সমর্থন ছিল কিনা, তা আমার জানা নাই। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁর সেই প্রচেষ্টা কগবরক ভাষীদের মধ্যে তেমন গণউদ্যোগ বা তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। এই ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণের দিকে না গিয়েও সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে তখন ব্যাপক গণ-উদ্যোগ গড়ে উঠার মত বাতাবরণ ছিল না।

এই মহতী প্রচেষ্টার অসাফল্যের প্রথম এবং প্রধান কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, স্বর্গীয় রাধামোহন দেববর্মার সেই প্রচেষ্টার প্রতি তদানীন্তন শাসক মহারাজারা তেমন আমল দেন নাই। সম্ভবতঃ ত্রিপুরার রাজারা এটা ধরেই নিয়েছিলেন যে, নিজস্ব লিপিবিহীন কগবরক ভাষাকে কখনই লিখিতরূপে উত্তরণ করা যাবে না। একটি অলিখিত উপভাষাকে (dialect) লিখিতরূপ দিতে গেলে যে পরিমাণ আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভাষা বিজ্ঞানীদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া দরকার ছিল স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর নিশ্চয়ই তা' পান নাই। তাই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁর সেই মহতী প্রচেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নাই।" স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এ নিয়ে নানা আলোচনা হয় কিন্তু কোন ফল হয়নি। ভাষাকে লিখিতরূপে উন্নয়নের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের অবদানও উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৮ সালে ত্রিপুরায় বহু লড়াই, আন্দোলন এবং রক্তঝরা পথে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসে। এর আগের কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের শাসনের ইতিহাস। কিন্তু এই দীর্ঘ শাসনকালে শিক্ষায় সামগ্রিকভাবে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নি। গ্রাম পাহাড়ের নিরক্ষর মানুষ জ্ঞানের আলোতে সামান্যই উদ্ভাসিত হয়েছে। কগবরক ভাষা স্বীকৃতি লাভ করেনি। কংগ্রেসের ৩০ বৎসরে এই রাজ্যে প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৬৩টি (বালোয়াড়ী স্কুল) বামফ্রণ্টের সাত বছরে (১৯৮৪ পর্যন্ত) এই সংখ্যা হয় ১১৭২টি। কংগ্রেস আমলে শিশু আবাসিক ছিল ১০টি গত সাত বছরে তা বেড়ে হয়েছে ২০টি। নিরক্ষরদের সাক্ষর করার জন্য (১৫-৩৫ বয়সী) ৯০০ টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ছিল, বর্ত্তমানে ১৯০০টি কেন্দ্র চালু হয়েছে। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৫২৮টি, বর্ত্তমানে (১৯৮৪) ২০৩২ টি আছে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ২৮২টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছিল বর্ত্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৩১৮টি। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো ১৯৬টি এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২ থেকে হলো ৯২টি। সর্বোপরি রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকের অন্তর্গত নির্দিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কগবরক ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে ৫৬৪টি কগবরক স্কুল আছে এবং এইসব ছাত্রছাত্রীদের জন্য কগবরক শিক্ষকও আছেন।

এইভাবে বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কগবরক ভাষায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে এই সব উপজাতি শিশুদের সুষ্ঠু শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। যদিও ভারতীয় সংবিধানের Article 350 (A) তে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবাধ করার কথা স্পষ্টতই বলা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে সেণ্ট্রাল এডভাইজরী বোর্ড অব এডুকেশন সিদ্ধান্ত নেন, 'That the medium of instruction in the junior basic stage must be the mother tongue of the child and that where the mother tongue was different from the regional or state language, arrangements must be made for the instruction in the mother tongue by appointing at least one teacher to teach all the classes, provided that there are at least 40 such pupils in a school. The regional or state language where it is different from the mother tongue, should be introduced not earlier than class III not later than the end of the junior basic stage. In order to facilitate the switch over to the regional languages as medium of instruction in the secondary stage, children should be given the option of answering questions in the mother tongue for the first two years after the junior basic stage."

ত্রিপুরার উপজাতি শিশুরা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার এই সুযোগ লাভ করে। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষার পরই আবার এইসব ছাত্রছাত্রীদের একটি আঞ্চলিক ভাষা (এই রাজ্যে বাংলা ভাষা) আয়ত্ত করতে হবে। এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য অংশের শিক্ষার্থী থেকে তারা পিছিয়ে পড়বে। এ ছাড়া এই অবস্থায় এই দুই ধরনের ভাষায় একটা সম্পর্ক তৈরীর প্রয়োজনও আছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ 'কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে, তাহাকে অপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্যা কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই। যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বিপন্ন হইতেছে। শিক্ষাকে

এই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতীয় রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে। সমস্ত জাতীয় জীবন ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগ সাধন হয়।" (**'সাধনা' ১৩০০ আষাঢ় পৃঃ ১৯৭**)। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার কগবরক ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিয়ে একে সীমার বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। তদুপরি কয়েক বৎসরকাল বাঙালী ভাষাভাষীদের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে কগবরক ভাষী জনগোষ্ঠী প্রচণ্ড আড়ষ্ট বোধ করবে না। ফলে উপজাতি জীবনে শিক্ষার ও চেতনার রাজ্যে পেঁছানোর প্রশস্ত রাজপথ তৈরী হলো। তদুপরি শিক্ষিত উপজাতি যুবক যুবতী ও অন্যান্য অংশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কগবরক ভাষাকে অনুবাদ, মৌলিক রচনা ইত্যাদির মারফৎ সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন তবে শুধু কগবরক ভাষার উন্নতি ঘটবে না শিক্ষারও প্রসার ঘটবে।

ধর্ম

উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাস দীর্ঘ আলোচনায় নানা জটিল রূপ নিয়েছে। ভারত সরকারের লোকগণনা কালে ধর্ম অনুসারে জনসংখ্যা গণনার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। বৃটিশ আমলে ভারত সরকার লোকগণনাকালে ভারতের উপজাতি বা আদিবাসীদের ধর্মকে অ্যানিমিজম (animism) বা সর্বপ্রাণবাদী বলে অভিহিত করেন। সর্বপ্রাণবাদী সাধারণতঃ জড় উপাসনায় বিশ্বাসী। ইংরেজ আদিবাসীদের এইভাবে চিহ্নিত করায় অনেকেই এর সমালোচনা করেন। বস্তুতঃ "আদিবাসীদের অ্যানিমিস্ট বা জড়োপাসক আখ্যা দেওয়ার পেছনে একটা ব্রিটিশ কূটনীতি যে ছিল, তা অনুমান করবার কারণ আছে। ভারতের হিন্দু সমাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতভাগে ভাগ (Fragmentation) করা যায়, সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ কূটনীতিবিশারদেরা অনেক চেষ্টা করেছেন। 'তপশীলী জাতি' (Schedule Caste) নাম দিয়ে হিন্দুসমাজের একটা অংশকে পৃথক করবার চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে যে, এঁরা হিন্দু হলেও অতি 'অবনত শ্রেণীর হিন্দু' এবং এঁদের স্বার্থের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষণের প্রয়োজন এবং এঁদের উপকার করবার জন্যেই সাধারণ হিন্দুসমাজ থেকে এদের ভিন্ন করে বেছে নিয়ে একটা পৃথক নামকরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ভারতের মুসলমান ও খৃষ্টান সমাজের মধ্যেও 'অবনত শ্রেণী' আছে, কিন্তু তাদের পৃথক করা হয়নি।

কিন্তু হিন্দু সমাজ দেহকেই খণ্ডিত করবার রাজনৈতিক প্রয়াস বিশেষভাবে হয়েছে। হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে, তার মধ্যে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী থেকে আরম্ভ করে ভূতপূজক পর্যন্ত সবারই স্থান আছে! হিন্দুধর্ম কথাটা সাংস্কৃতিক অর্থেই সবচেয়ে সত্য। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নেহরু, মহর ডঃ আম্বেদকর এবং কাছাড়ী শ্রীরূপনাথ ব্রহ্ম বা ওঁরাও রায়সাহেব বন্দীরাম—হিন্দুধর্মের পরিধির মধ্যে এঁদের সবারই স্থান আছে। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট 'তপশীলী জাতি' নাম দিয়ে একটা বিভেদ আমদানী করলেন, তারপর আদিবাসীদের সম্বন্ধে এনিমিস্ট বা জড়োপাসক নাম দিয়ে আর এক দফা বিভেদ ঢুকিয়ে দিলেন। তথাকথিত তপশীলী জাতিরা যদি সামাজিক সংজ্ঞা অনুসারে 'অবনত হিন্দু' হয়ে থাকে, তবে আদিবাসীরাও 'অবনত হিন্দু'। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট আদিবাসীদের 'অবনত হিন্দু' বলতে রাজী নন, কারণ তাতেও হিন্দু সমাজের একটা ব্যাপক রূপ স্বীকৃত হয়ে যায়।

হিন্দুসমাজের কয়েকটি উচ্চবর্ণের অনুদার ও সংকীর্ণ আচরণের (দৃষ্টান্তঃ অস্পৃশ্যতা) জন্য তপশীলী জাতিদের মধ্যে অনেকের মনে মোটামুটি একটা হিন্দু সমাজবিরোধী বিক্ষোভ আজকাল দেখা দিয়েছে। কিন্তু তপশীলী জাতিরা নিজেদের হিন্দু বলতে কোন দ্বিধা করেন না এবং হিন্দু ধর্মকে তাঁরা অবজ্ঞা করেন না। বর্ণহিন্দুবিরোধী মনোভাব এঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলেও হিন্দুধর্ম বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। সমস্যাটা বস্তুত ঘরোয়া বিবাদের মত এবং বিবাদটা সামাজিক। আদিবাসীদের মনোভাবের মধ্যেও একই ধরণের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। আদিবাসীরা তাঁদের নিজস্ব উৎসব, পূজাপদ্ধতি ও বিশ্বাস নিয়ে আছেন এবং তার মধ্যে বহু হিন্দু দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতি ও হিন্দুসুলভ ধর্মবিশ্বাসকেও তাঁরা নিজস্ব করে নিয়েছেন। আদিবাসীদের মনে হিন্দুধর্ম বিরোধী কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু তথাপি, হিন্দুসমাজ বিরোধী একটা ক্ষোভ আছে। এক্ষেত্রেও বিক্ষোভের মূল কারণ হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক।

হিন্দুসমাজের এই আভ্যন্তরীণ সামাজিক শ্রেণীপার্থক্য ও বৈষম্যগুলির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ কূটনীতি হিন্দুসমাজকে তিন ভাগ করার চেষ্টা করেছে। তপশলী জাতিদের ভিন্ন করা হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সম্বন্ধে একটা নতুন ধর্ম আরোপ করার চেষ্টা সফল হয়নি, 'অবনত হিন্দু' নাম দিয়ে তাদের হিন্দুত্বকে যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়েছে;

কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধর্ম (অ্যানিমিজম বা জড়োপসনা) আরোপ করে একেবারে পৃথক করার চেষ্টা হয়েছে।

১৮৯১ সালে ভারতের সেন্সাস কমিশনার জে. এ. বেইন্‌স (J. A. Baines) বলেন, 'বহু উপজাতীয় গোষ্ঠী (Tribal People) বর্তমানে হিন্দু হয়ে গেছে। এদের ধর্মমত এবং যারা এখনও অহিন্দু উপজাতীয় রূপে আছে, তাদের ধর্মমতের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানতে পারা যায় না।'

স্যার হার্বার্ট রিজলি (Sir Herbert Risely) তাঁর ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলেছেন: 'হিন্দুধর্ম এবং জড়োপসনার (Animism) মধ্যে কোন স্পষ্ট পার্থক্য করা সম্ভব নয়.....উপজাতীয় লোকেরা (Tribal) ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে হিন্দুত্ব গ্রহণ করে চলেছে। সুতরাং ঠিক কতখানি এবং কি পরিমাণের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর একজন উপজাতীয়কে হিন্দু বলা উচিৎ সে সম্বন্ধে কোন একটা মাপ স্থির করা সম্ভব নয়।"

১৯২১ সালের বিহার ও উড়িষ্যার সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ পি. সি. ট্যালেন্টস্ (P.C. Tallents) বলেছেন: 'প্রত্যেক লোকগণনার সময় আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে—এই সকল (আদিবাসী) লোকদের অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে পৃথক করে দেখা খুবই কঠিন।"[১০]

ত্রিপুরায় উপজাতিদের ক্ষেত্রেও এইরূপ হিন্দুধর্ম অবলম্বীদের সংখ্যাই অধিক। প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার মহারাজারা দীর্ঘদিন ধরে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকায় এবং মণিপুরী সমাজও দীর্ঘকাল ধরে এই ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে উপজাতিদের মধ্যে এই ধর্মের প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তবু উপজাতিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বীও আছে। কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের পক্ষে ত্রিপুরায় যত ব্যাপক প্রচার কাজ করা হয়—অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকদের সেই ধরণের প্রচার কার্য নেই।

যাহোক, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রভাবের ক্ষেত্রে রাজপরিবারেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। "রাজারা কেবলমাত্র সহরবাসী উপজাতিদেরই নহে, পাহাড়ের কগবরক ভাষী উপজাতিদেরও গোড়া হিন্দুতে রূপান্তরের পথে পা বাড়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। প্রথমতঃ রাজারা ত্রিপুরী (কগবরক ভাষী উপজাতি গোষ্ঠী) সমাজ সংস্কারের নামে তাদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও ধর্মানোষ্ঠানের পথ পরিবর্ত্তন সাধনে ব্রতী হন। চট্টগ্রাম থেকে আগত এক গোষ্ঠীর বাঙালী ব্রাহ্মণদের

চিরস্থায়ী ম্যাদে সনদ দিয়ে কগবরক ভাষী উপজাতীয়দের (রিয়াং বাদে) কুলপুরোহিত বা যজমানী ব্রাহ্মণের আসনে বসান। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় আচার প্রবর্ত্তনের নামে কগবরক ভাষী উপজাতীয়দের মানুষ মরার ৭ দিনের পর শ্রাদ্ধ (হরাছিনি) করার প্রথা বদল করে তেরদিনে শ্রাদ্ধ করার প্রথা চালু করেন। পূর্বে শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু মহারাজারা 'ক্ষত্রিয় আচার' প্রবর্ত্তনের নামে ঐ সব অনুষ্ঠানে ত্রিপুরীদের ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা পার্বণ করানো বাধ্যতামূলক করে দেন। ঐ সব কাজে যারাই ব্রাহ্মণ নেবেন না তাদের সমাজ বঞ্চিত করার প্রথা চালু হয়। অপমৃত্যু নামক সংস্কার উপজাতিদের সমাজে অপরিচিত ছিল। কেহ জলে ডুবে মরলে বা ফাঁস খেয়ে মরলে সেই মৃত ব্যক্তির বংশধরদের ব্রাহ্মণের সাহায্যে প্রায়শ্চিত্ত করানো, আত্মশুদ্ধি বা দেহশুদ্ধি করানোর প্রথা উপ-জাতিদের সমাজে প্রচলন ছিল না, রাজারাই সেই আধ্যাত্মিক সংস্কার প্রথম কগবরকভাষীদের সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। আরো নগ্নভাবে বলতে গেলে রাজারাই উপজাতি সমাজে হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সমূহ প্রবেশ করান।

শুধু যজমানী ব্রাহ্মণ আমদানী করেই রাজারা ক্ষান্ত থাকেন নাই। মেহারী থেকে গোস্বামী বংশীয় একদল ব্রাহ্মণদের আমদানী করেন ত্রিপুরীদের দীক্ষাগুরুরূপে। এই গোস্বামীরা সনদ পেলেন কগবরকভাষীদের দীক্ষা দিতে। এরা উপজাতিদের কাছে ধর্মগুরু নামে পরিচিত। এই ধর্মগুরুরা পুরুষানুক্রমে উপজাতি শিষ্যদের কাছ থেকে প্রতিবৎসর বার্ষিক গুরু দক্ষিণা (খাজনা) আদায় করে নেন এবং সেই প্রথা প্রায় অব্যাহতই রয়েছে।

এই রাজারাই নবদ্বীপ থেকে বাঙালী বৈষ্ণব ত্রিপুরায় আমদানী করেন এবং উপজাতি জনগণকে ভেক গ্রহণ করতে অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হতে উৎসাহিত করেন। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের সময়ে ত্রিপুরী এবং জমাতিয়া উপজাতিদের মধ্যে সাধু ও বৈষ্ণব হবার প্রবণতার জোয়ার আসে। প্রচুর সংখ্যক পরিবার সাধু ও বৈষ্ণব হন। এভাবে তারা হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক সংস্কারের অক্টোপাশে আবদ্ধ হন।

ত্রিপুরার রাজাদের হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী এবং কুসংস্কার এমন স্তরে পেঁৗছে যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা বীরবিক্রম কগবরকভাষী উপজাতি সমাজে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় আচার প্রতিষ্ঠান নামে প্যারা মিলিটারী সংগঠন বৃন্দিয়াদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে ব্যাপকভাবে শূকর ও মোরগ ধ্বংস করেছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত রাজার অনুগত কুসুম দেববর্মা (কুসুম ঠাকুর নামে পরিচিত) এই শূকর মোরগ ধ্বংস অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তখন বন্দিয়াদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পাড়ায় পাড়ায় অভিযান চালিয়ে গৃহস্থদের শূকর ও মোরগ পালন ও ভক্ষণ কত ভ্রষ্টাচার ও মহাপাপ গোঁড়া হিন্দুধর্মের এই হিতোপদেশ তথাকথিত অনাচারী উপজাতিদের নিকট বর্ষণ করা। তাঁদের এই গোঁড়া হিন্দুয়ানীর বেলায় সারা ত্রিপুরায় হাজার হাজার শূকর মোরগ বধ হয় এবং গৃহস্থরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।[৯১] এর পেছনে রাজা মহারাজাদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক—এইভাবে উপজাতিদের মধ্যে হিন্দুধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে।

হিন্দুধর্মের পরেই এই রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বীদের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। এই ধর্ম বিশেষভাবে মগ ও চাকমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত।

"Our knowledge of the early history of Buddhism in the plains portion of Tippira (Comilla) has been considerably increased by the excavations in Mainamati. The area of Tripura was part of ancient samatata and there can be little doubt that ancient Pattikera was situated near Comilla. Buddhist relics in Hill Tripura however, have not been studied systematically so far, Mr. K. P Datta Deputy Director of Education of Tripura State, was kind enough to show me a number of Buddhist remains in Madhya-Pilak

There are remains of Bodhisattra and Buddha images. Other Buddhist images have been found near Bisalgar, Dharmanagar. It can be expected that systemetical search will further a great number of Buddhist remain in Tripura and enable us to trace the history of Buddhism in this part of India. This will be particularly important in view of the fact, that the chronicles of the Tripura Kings apparently avoid any reference to Buddhism in order to give the wrong impression that Tripura was a purely Hinduistic Country throughout its history.···The Census of India 1961 states the

number of Buddhists in Tripura State as 34,004 all of them except 66 in rural arear (2·95 p. c) of the population of the State. The majority of Tripura Buddhists are Marmas, but there are also some Baruas (Bengali Buddhists) and Chakmas. Buddhist activities are virtually started when the then Maharaja of Tripura established the Venuvana-Vihara in the capital Agartala in 1946 "[৯২]

উপজাতিদের মধ্যে মুসলমান ধর্মঅবলম্বী দেখা যায় না। "বহু বৈচিত্র্যে, বহু বিরোধী রীতি-নীতির সামঞ্জস্য মিশ্রণে ও সমন্বয়ে, বহু ভাষা পরিচ্ছদ আচার উৎসব ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ভূমিকার বিরাটত্বে, অতি পরিব্যাপ্ত ও অতি গভীর হিন্দুসমাজের সত্তায় পরিবর্ত্তন ও আহরণের যে শক্তি আছে, সেটা দেশী বিদেশী অনেক সমালোচকেরা সহজে দেখতে পান না। হয়তো হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই আদিবাসী সমাজ এর প্রতি আকৃষ্ট। আর যদি সমাজের কথা ছেড়েদিই, তবে বলতে হয় হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্য আদিবাসী সমাজ হিন্দুসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিন্দু সংস্কৃতিকে আদিবাসীরা বৈদেশিক সংস্কৃতি বলে মনে করতে পারে না কিন্তু জাত প্রথাহীন বিখ্যাত খৃষ্টীয় ও মুসলিম সংস্কৃতিকে আদিবাসীরা বৈদেশিক সংস্কৃতি বলে সহজেই বুঝতে পারে, কারণ এই দুই সংস্কৃতি আদিবাসীদের চিরকেলে ঐতিহাসিক রুচি, সংস্কার ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার ও আঘাত করে। সামাজিক বিষয়ে হিন্দু যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ এবং সেই অনুপাতে দুর্বল কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু তেমনি উদার।...সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দু নিজের যে দুর্বলতা ঘটিয়েছে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে শক্তি অর্জন করে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে।" (ভারতের আদিবাসী পৃঃ ৩২ (খ)) ত্রিপুরায় উপজাতিরা হিন্দু হলেও বা অন্য ধর্ম অবলম্বী হলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গোষ্ঠীগত দেবতার পূজা, উৎসব ও সামাজিক নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে।

খার্চি ও কোড় পূজা ত্রিপুরারাজ্যের প্রধান পূজা। যদিও এই পূজা গুলি ত্রিপুরার সমস্ত আদিবাসীদের পূজো, তবু এগুলো রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় রাজানুকূল্যেই সম্পন্ন হতো। বর্ত্তমানেও সরকারী নানা আনুকূল্য এসব পূজোতে আছে।

এছাড়া গড়িয়া, রন্ধক, মাইলুমা (ধানের দেবী), নকছু মতাই (গৃহদেবী),

খুলুমা (তুলার দেবী), চাওরাই (জুম ছেড়ে আসার সময় পুজো), মামিতা বা মাইকাতাল (বিন্নিচালের পুজো), মতাই কতর (বড়দেবতা), বুড়াছা (বুড়া দেবতা), তুইমা (গঙ্গাদেবী), লাম্প্রা (শুভ অনুষ্ঠানের পুজো) প্রভৃতি বহু পুজো পার্বন তাদের বারমাসের পার্বনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ওদের সরল জীবন যাত্রায় মত পুজো পদ্ধতিও সহজ সরল। প্রতিদিনের সরলজীবনে প্রাপ্ত জিনিসই পুজার উপকরণ। জাকজমক করে কোন মুর্ত্তি, মণ্ডপ বা ঢাক ঢোলের কোন ব্যবস্থা নেই। মাইকের আওয়াজেও বনভূমি কম্পিত হয় না। প্রায় সব পুজোতেই বাঁশের ব্যবহার রয়েছে। বস্তুতঃ বাঁশ উপজাতি জীবনে অসহায়ের শক্তি, সকলের আশ্রয়, ক্ষুধায় খাদ্য। নিশ্চিতভাবেই এতে দেবত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। সাধারণতঃ বাঁশ মাটিতে পোঁতা হয়। এই বাঁশের আবার কখনো কখনো বিশেষভাবে তার গায়ে দায়ের আঁচড়ে বিশেষ রূপ দেয়া হয়। এই বাঁশকে ফুলের মালা বা ফুল দিয়ে সাজানো হয় আবার কখনো কখনো তুলা দিয়েও সাজানো হয়। অনেক সময় রীছা (বক্ষ আবরণী)ও ব্যবহার করা হয়। বনের অফুরন্ত কলাপাতাই উপকরণ রাখার, উপচার সাজার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উপচার হিসেবে চাল, কলা, সুপারী, ধান, হলুদ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিশেষ ব্যবহার্য বস্তু হলো ডিম। প্রধানতঃ মোরগ বলি দেয়া হয়। এছাড়া মহিষ, পাঁঠা বা শুকর বলি দেয়ার প্রথাও আছে। ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় অনুষ্ঠানেই পানীয় ব্যবহার হয়—এর মধ্যে বুতুক, লঙ্গি, আরাক প্রধান।

পুজা পদ্ধতিও সরল। পুজোর প্রথমে অচাই (পুরোহিত) বারুয়া (সাহায্যকারী), জগাল্লাকে (উলুধ্বনিকারিণী) পান সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ জানানো হয়।

মোরগ বলি দেওয়ার পর রক্ত কলাপাতায় ফেলা হয়—রং উজ্জ্বল লাল হলে শুভ বলে ধরে নেয়া হয়। আচাই পুজোর পর মদ পান করেন, পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন। প্রায় সব পুজোতেই নাচ গানের আয়োজন থাকে। গানের বিষয়ও পরিচিত জীবনকে কেন্দ্র করে। পুজোর মধ্য দিয়ে সকলে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে।

মগদের পুজোর মধ্যে কেয়াং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উপজাতিদের মধ্যে প্রায় সব পুজোতে বাঁশের ব্যবহার, বৃক্ষপুজার প্রতিই ইঙ্গিত করে। এ ছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে "টিপরাদের 'মুলিখানাই' পুজা এবং 'কালাইয়া'

পূজা উভয়ের অন্তরালেই বৃক্ষপূজার লক্ষণ বর্ত্তমান। মূলীখানাই পূজার মতো কালাইয়া পূজাও অরণ্য অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজার উপচার উৎসর্গ করা হয় বৃক্ষকে। এই পূজার উদ্দেশ্য বিভিন্নমুখী। ফসলবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মঙ্গল, সন্তান জন্মলাভ প্রভৃতি বিষয়বস্তুই এই পূজার অন্তর্নিহিত রূপ। নির্দিষ্ট দিনে কালাইয়া দেবতার মূর্ত্তি গড়ে বেদীতে স্থাপন করা হয়। তৎপর মুর্গী হত্যা করে এই পূজা আরম্ভ করতে হয়। তুইবুকমা, চুংগ্রাংমা অথবা কোয়াই চানাই মা পূজায় যেমন শূকর হত্যা নিষিদ্ধ তেমনি কালাইয়া পূজায়ও শূকর হত্যা করা চলে না। কালাইয়া পূজার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যে পরিবার এই পূজার আয়োজন করে তাদের মস্তক মুণ্ডন করতে হয় এবং এই পূজা চলাকালে অজাই বা অচাই খাওয়া তো দূরের কথা জলও স্পর্শ করতে পারে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৃক্ষপূজা আদিম সমাজের এক প্রাচীনতম নিদর্শন।"[৯৩]

সূর্য ও চন্দ্র দেবতার প্রতি তাদের বিশেষ ভক্তি লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ সৌরশক্তি সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই নানারকম ধারণা গড়ে উঠে। বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতের বা পৃথিবীর নানা প্রাচীন জাতির মধ্যেই সূর্য বা চন্দ্র সম্পর্কে নানা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমাজে সূর্য দেবতার পূজার প্রচলন আছে। সূর্যব্রতের প্রচলন এখনও এতদ্অঞ্চলের সমাজে রয়েছে। প্রাচীন ত্রিপুরার প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে সূর্যদেবতার মূর্তির সংখ্যা খুব উল্লেখযোগ্য। সূর্য পূজার স্থান হিসাবে দক্ষিণ ত্রিপুরার বাগমা ও পিলাক খুব প্রসিদ্ধ। শুধু এদেশে নয়, পৃথিবীর অন্য অঞ্চলের প্রাচীন সমাজেও সূর্য পূজার রীতি প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে ফ্রেজারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ—

"As one of the most conspicuous and powerful objects in the physical world the sun has naturally attracted the attention and obtained the homage of many races, who have personified and worshipped it as a god. Yet the worship of the sun has been by no means so widely diffused among primitive peoples as, on purely abstract grounds, we might at first sight be tempted to suppose. If we were to draw a map of the world showing in colour the regions where sun worship

is known to have prevailed, we might be surprised at the many large blanks in the chart, blanks which would probably be particularly numerous and extensive in countries occupied by the most backward races."[১৪]

ইউরোপ, আমেরিকা এবং অন্যান্য মহাদেশেও সূর্য পূজায় প্রচলিত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি দেখা যায়। উড়িষ্যার কোণারকের সূর্য মন্দিরের শাম্বের কাহিনী বহুল প্রচলিত। কুষ্ঠরোগের নিরাময়ের জন্য সূর্যদেবতার পূজার প্রচলনের কাহিনীও ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত আছে। ত্রিপুরী রাজ্যেও কুষ্ঠ ব্যাপক সংক্রমণ সূর্য দেবতার পূজার প্রতি ইঙ্গিত করে।

"প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতিতেও সূর্য-পূজার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে সূর্যদেবতা রা (Ra) বা রি (Re) নামে খ্যাত। বেদে বর্ণিত সূর্য, গ্রীকদের হেলিওস, ল্যাটিন ভাষার সোল (sol), বেবিলিয়নদের শাম্‌স এবং আসিরীয়দের উতু কিংবা বাব্বার-এর যে প্রাধান্য মিশরীয়দের রা অথবা রি একই ভূমিকা পালন করে থাকেন।

বেদে বর্ণিত সূর্য দেবতা শবর, জেন্দাবাস্তায় বর্ণিত সূর্যদেবতা হবারে এবং গ্রীকদের হেলিওস যেমন শ্বেত ঘোড়া চালিত রথে আকাশপথে ভ্রমণ করেন তেমনি মিশরীয় সূর্যদেবতা রা অথবা রি আকাশপথে ভ্রমণ করেন ; তবে শ্বেতঘোড়া চালিত রথে নয়, জাহাজ বা নৌকায় চড়ে।

প্রাচীন মিশরীয়দের পৌরাণিক গ্রন্থ 'দি বুক অব আম দুআট্' (The Book of Am Duat) এবং 'দি বুক অব দি গেট্‌স্' (The Book of the Gates) ইত্যাদিতে উল্লেখিত আছে যে, সূর্যদেবতা রা বা রি রাত্রিবেলায় দুআত (Duat) নামক অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন এবং এই অঞ্চল মৃত মানুষের দেশ বলে কথিত। মৃত মানুষের দেশে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এক বিরাট নদী প্রবাহিত হয় এবং এই নদী পথেই রা বা রি-এর জাহাজ বা নৌকা চলাফেরা করে।

প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণায় সূর্য ছিলেন পুরুষ দেবতা ; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা সূর্যদেবতাকে দেবী হিসাবে স্থান দেয় এবং রা বা রি-এর পরিবর্তে তাঁর নামকরণ করে রাত বা রাততই। রাত বা রাততই দেবীর কার্যকলাপে অবশ্য কোন পার্থক্য টানা হয়নি। কেননা সূর্যদেবতার মতো তাকেও অপরূপ শক্তির অধিকারিণী বলে কল্পনা করা হয়।

শুধু আরাধ্য দেবতা হিসাবে নয়, প্রাচীন মিশরীয় উপকথায় সূর্যদেবতার প্রাধান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি কোন কোন রাজবংশও সূর্য থেকে উদ্ভূত বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ অসিরিস (Osiris) রাজবংশের নাম করা যায়। অবতার হিসাবে তিনি মানবকুলের উপর প্রভুত্ব করেন।

সূর্যদেবতার জন্মকাহিনীতেও প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যময়। অবশ্য এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণাব পরিচয় পাওয়া যায়। এ. আরমান সমর্থিত বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নান (Nun) নামক সমুদ্র থেকে সূর্যদেবতা উঠে আসেন। তবে কখন এবং কিভাবে তা অবশ্যি তিনি ব্যাখ্যা করেননি। সে সংবাদ অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। কেউ কেউ অনুমান করেন সূর্যদেবতা প্রাথমিক অবস্থায় শিশুরূপে পদ্মপাতায় অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর এই আবির্ভাব। অন্য মন্তব্যে জানা যায় যে, পাহাড় শীর্ষের কোনোও এক ডিমের মধ্য থেকে সূর্য-দেবতার আবির্ভাব।

প্রথম অবস্থায় এই ডিম ছিল সমুদ্রগর্ভে। পরবর্তী ঘটনা এইরূপ ঃ 'সমুদ্রগর্ভ থেকে ডিম পাহাড়শীর্ষের এক বাসায় আশ্রয় লাভ করে। সেখানে ডিমে তা দিবার সময় আটজন দৈত্য-দানব, সাপ, ব্যাঙ এবং গাভীর আকারে সেখানে উপস্থিত ছিল। সূর্যদেবতা ডিম ফেটে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাভীর পিঠে আরোহণ করলেন এবং সেই গাভীই তাঁকে আকাশে স্থাপন করলো। বলা প্রয়োজন যে, মিশরীয় উপকথায় বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক অবস্থায় আকাশ ছিল মাথার উপরে বিস্তৃত। শো (Shu) দেবতা কর্তৃক সেই আকাশ বর্তমানের অবস্থায় রাখা হয়েছে। এবং এই শো দেবতাই মাটি (সেব অথবা কেব) এবং আকাশ (নুত)-এর মধ্যবর্তী স্থানের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। প্রাচীন মিশরীয়দের মতে সূর্য-দেবতা আকাশ দেবী নুত-এর পিঠের উপর দিয়ে জাহাজ বা নৌকায় ভ্রমণ করেন। এ সম্পর্কে আগেও সামান্য ইংগীত দেওয়া হয়েছে।

আকাশ এবং মাটি যে খুব কাছাকাছি ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের বহু আদিম সমাজের উপকথায় তার সন্ধান পাওয়া যায়। খাসীয়া ধর্ম কথায় বলা হয়েছে, আকাশ এবং মাটি খুব কাছাকাছি ছিল। মানবজাতি কি পাপ করেছিল তাই আকাশ উপরে তোলা হয়েছে।

মিশরীয় উপকথায় সূর্য-সম্পর্কিত বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সূর্য-দেবতা যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এবং তাঁর জন্মও যে অলৌকিক ভাবে সংঘটিত হয়েছে এরূপ বিশ্বাস মিশরের সর্বত্র প্রচলিত।"[৯৫]

প্রাচীন সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে চন্দ্রেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। বেদ ও পুরাণের অভিমত অনুযায়ী সোম বা চন্দ্র অত্রির পুত্র।

এছাড়া আছে, নানা গ্রাম্য দেবদেবী। যেমন, টিপরাদের চুআ মাখ লায়ে, হাকামা, খুলুমরু, কালাইয়া গরাইয়া, বুরসার, মাতাই চাংগরাম, বির্চাচিনি, সামুং, তুইমা, চাকমাদের মা লক্ষ্মী, বুহত্তারা, ধলধবরি, পরমেশ্বরী, মত্যা, হত্যা, ফুলকমরী, মেলকোমরী, মোহিনী কালাখেদর, ভূত, রাখ্যোয়াল, বিয়াত্রা, থান, চাল্লোয়াদ, বজমপতি, থাম্মাং, চেক্কং, মগনী, শিজি, কালীজান্দর, আনেয়া, লাত্তজ্যা, ঠাকুর ইত্যাদি ; গারোদের তাতারা রাবুগা, নস্তনুপান্তু, মাচি, সালজং, ছোছুম, নোরিংগ্রো নোজিংজু, গোয়েরা, নোরিচিত কিমরী বোক্রী, সেন, আদিমা, দিংছিমা, কালকেম, চোরাবুদি, রোকিম, মিসি, আগাং, সোলজং সংগিটাং এবং নবাং ; সাঁওতালদের মনরেনকো, তোরইশে, দাংগী, পুংগী, হিসী. ডুমনী, চিতা, কাপড়া, বেরহাপাত, মংগরপাত, বুধ পাহাড়, পাউরীপাত, কালাচান্দী, কালামাহিচান্দি, নাচনকুদ্রা ইত্যাদি ;...বলা আবশ্যক যে, হিন্দুদের দেবদেবী এবং আদিম সমাজের দেবদেবী অনেকক্ষেত্রেই এই অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ।" (আরণ্য সংস্কৃতি ; আবদুস সাত্তার পৃঃ ৪৪) প্রসঙ্গতঃ ডঃ সুধীর কুমার করণের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ "বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের পুরোহিত পুষ্ট দেবদেবীর প্রভাব আমাদের সমাজে আজো অপ্রতিহত। এর পার্শ্বে আর একদল দেবদেবীও সেই আদিমকাল থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের করুণা লাভের জন্য অপেক্ষা করেনি। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের পূজা প্রাপ্তির জন্য এদের মাথাব্যথা নেই। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এদের প্রভাবও সমাজ স্বীকৃত। এদের প্রচলিত নাম গ্রামদেবতা।

বাংলাদেশে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদি পূর্বেই এই অকুলীন দেবতার দল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল ; অন-আর্য সংস্কৃতির অন্তঃশীলা প্রবাহের স্রোতরেখা ধরেই এদের আবির্ভাব। বেদপূর্ব যুগের সবকথা আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের পুরা কাহিনীর অঙ্গাবরণ নেই বলে এই সব দেবতার স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না। বলা বাহুল্য, আদিম মানুষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত প্রেত আত্মার জন্ম দিয়েছিল, সেই ভয় এবং বিশ্বাসই পরিমার্জিত সংস্করণে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের পর্যায়টি

মানব সমাজের অভিব্যক্তির সূত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের মধ্যে আদিম মানুষের বিশ্বসই নিহিত। জীবপূজা, অচেতন পদার্থ পূজা এবং সর্বপ্রাণ-পূজার সংমিশ্রণে বৈদিকদেবতার আবির্ভাব এবং এই দেবতাদের ক্রমবিকাশের আদিপর্বটি গ্রামদেবতাদের আবির্ভাবের সঙ্গেও বিজড়িত।"[২৬]

সুতরাং গ্রামীন পূজা পার্বণের মূল বিষয় হলো গ্রামদেবতার প্রাধান্যই অধিক, পরবর্ত্তী সময়ে উচ্চতর দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়।

দেবদেবীর মতো ধর্মীয় আচায় আচরণ, তত্ত্বকথা সম্বলিত গ্রন্থ ইত্যাদিও ধর্ম বিশ্বাসে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত সম্পর্কে আমাদের প্রায় অনেকেই বিশ্বাসী। তেমনি চাকমা সমাজেও বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাওয়া যার, কিংবা খ্রীষ্টান বা মুসলমান সমাজে বাইবেল ও কোরাণ হিন্দুর দেবদেবীর সমতুল মর্যাদা লাভ করে। বস্তুতঃ ধর্ম ও পূজা পার্বণ উপজাতি তথা আদিম সমাজের জীবনবোধকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

জুমভিত্তিক জীবনযাত্রা

উপজাতিদের মধ্যে একটা অংশ বিশেষভাবে রিয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায় পাহাড়ের উঁচুভূমিতে বসবাস করে। এবং এরা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে জুম চাষ করেই জীবনধারণ করে। জুমচাষ শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের নয়—ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ উপজাতি বা আদিবাসীদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। ভারতের স্বাধীনতার পর এই জীবনযাত্রা থেকে এদের সরিয়ে আনার চেষ্টা হলেও সম্পূর্ণভাবে এখনও সম্ভব হয়নি।

টাক্কল বা একপ্রকার দা-এর সাহায্যে তারা এই চাষ বাস করে। শরতের শেষভাগ থেকে জুমের জমির সন্ধান করে—এবং পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফাল্গুণ চৈত্র মাসে জঙ্গল সাফ করার কাজ চলে এবং আগুণ জেলে এইসব কাঁটাবন পুঁড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর এইসব পোড়াজমিতে কাল বৈশাখীর ধারাপাতের পর ধান ও অন্যানা চাষ চলে। জুমের চাষে ধানের সঙ্গে অন্যান্য ফসলও উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে তারা সারা বৎসরের খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে।

'জুম' শব্দটি ত্রিপুরা রাজ্যে বহুল প্রচলিত হলেও, ভারতের বিভিন্ন

অঙ্গরাজ্যে যেখানে এই প্রথা চালু আছে, সেখানে বিভিন্ন নামের ব্যবহার দেখা যায়। এ সম্পর্কে গবেষকের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ "Our prelusive lines have not so far explained the term 'Jhumia'. Though the people of this territory know it, we should not fail to define and depict it with precision to apprise the people of the rest of the world.

Jhumias are shifting cultivators in Tripura and the term "Jhum" is most frequently used for shifting cultivation in this territory. It is the most prominent among the terms used by other tribes in Tripura. For instance, the Garos tell it 'abagana' while the Khasis use the word 'Lyngkhalum'. The Madias who live in the most inaccessible hilly areas, practice a method of shifting cultivation know as 'dahia'. This system of cultivation is known as 'Bewar' or 'Dyaya' in Madhya Pradesh, kumari by Malayalars or Malabar, 'Pama Dohi' 'Ko non' or 'Bringa' in North ORRISSA 'Gudia' or 'Dhongarchar' in the South Orissa. The Reang of Tripura again have 'Hookni Smong' as synonym to Jhum. However, all the tribal Communities including personnal of the Administration are very much closely acquinted with only the term 'Jhum'.

There are few lines of historical interest behind the evolution of the term 'Jhum'. Rajmohan Nath, the eminent historian who wrote book of ethnological importance mentioned that the people who once migrated from the South-West past of China to Kamrup used to tell 'Chao-Thieus' when refering their original place of above. The very word 'Chao thieus' assumed many changes in it and it was pronounced in various typical ways depending upon different phonetic change which took place from time to time. Thus

"Chao-thieus' was once developed as 'Jehe-thieus' which meant people of high land and since than 'Jehe' was 'evolved' as a ward to mean high land ; because the people of this group who migrated from South-west part of China settled in the hilly part of Assam and adopted a type of cultivation in which paddy, turmeric and other useful seeds were sown by the use of 'Takhal' (a kind of hoe). Such cultivation was named 'Joho-Mo' and this very term Joho-Mo sometimes assumed the name Jhum which means cultivation in hill slops by the use of hoe.

Coming down to the present day many anthropologists attempted to define it in different language ; although, all their definations brought out the same thing. Conklin defined Jhum as any continuing agricultural system in which impermanent clearings are cropped for shorter periods in years than than they are followed. Just when and how people fell into the custom of this type of cultivation will always remain a matter of speculation. Be that as it may, the general consensus of opinion among anthropologists is that the foundation of agriculture economy was once laid by the shifting cultivators in all parts of the globe"......Many interesting rites are associated with the cultivation ; although with the advent of new economic order in the hills much of those ritua's have become faded afflatus. Religions minded and God fearing tribes want to know the approval of the God behind selection of Jhum by making a toss. A piece of bamboo is thus cut vertically into two and thrown above to fall upon the ground. If the two pieces fall upon the ground in positions which are contrary to the other, the Jhumias deem it to be a good sign. If, however, the pieces

fall in a way which does not communicate any sanctions of the unseen, the Jhumias have custom to try the luck for a couple of times through toss. In circumstances when approval of the supernatural is not obtained, the plot however suitable it may be, would be, abandoned and if the case is reverse, the Jhumia would plant a piece of bamboo upon which two thin pieces would be fixed crosswise to let others know that this particular plot has been chosen by one. Some even take a little soil from the plot and keep it in their beds at night before retiring to sleep with the expectation of a sweet dreams a sweet dream the plot would be deemed to be the herbinger of affluence and the next phase of work would follow them."[৯৭]

জ্‌মচাষের সময়ে তাদের যে গান, সেগ্‌লিও জ্‌মভিত্তিক। এর মধ্যেও তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও ফসল রক্ষার উপায় লক্ষ্য করা যায়। জ্‌মভিত্তিক নানা অন্‌ষ্ঠান প্রচলিত আছে। বিশেষ ভাবে ফসল তোলার সময় তারা ম্‌রগ ম্‌রগী উৎসর্গ করে ফসল ঘরে আনতো।

বর্ত্তমানে জ্‌ম জীবনধারণের একমাত্র উপায় নয়। (ফলে জ্‌মকেন্দ্রীক অনেক প্রক্রিয়াও উঠে যাচ্ছে এবং গানও আর স্‌ষ্টি হচ্ছে না এবং অনেক অঞ্চলে হারিয়ে যাচ্ছে। একদা প্রাকৃতিক কারণে ভারতবর্ষ বা প্‌থিবীর বিভিন্ন অংশের মত এখানে জ্‌ম প্রথা প্রচলিত ছিল। "Be that as it may, geographical condition have left only this alternative to our tribals. When sufficient plain land is not available and when the techneques of bunding is still foreign to them, the Jhum becomes the only alternative In Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Hydrabad and Madras everywhere shifting cultivation is prevalent. In foreign lands also such a thing is not foreign shifting cultivation is practised with some variation. Bamboo of Rhodesia, the yao of southern Nyasaland, the Boro of Amazan

Forest, the hill tribes of Borneo, Indo-China, Burma and Cylon raise crop in the same way so to say like the tribals of Tripura."[৯৭]

বর্ত্তমানে উপজাতিদের জীবনে যেমন অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি এই ব্যবস্থা ভূমিক্ষয়, বন্যার আধিক্য ইত্যাদি দিক সম্পর্কেও সজাগ হচ্ছে।

তাছাড়া আর্থিক দিক দিয়েও কম লাভজনক। নীচের দুটি চিত্রের মাধ্যমে জুম চাষের লাভ এবং জুম চাষের গতি প্রকৃতির চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ—

The Cost of Jhum Cultivation of one acre.

Sl. No.	Particulars of operations	Labour	Cost of Lobour	Other cost
1	2	3	4	5
1. Presowing operations.	a) Selection of Plot.	2½	7·50	
	b) Cutting of trees	10	30·00	
	c) Firing	—		
	d) Root clearing	10	30·00	
2. Sowing operation.	a) Cost of seed 30 Rs.	—	—	30·00
	b) Sowing	7½	22·50	
3. Inter-culture operations.	a) 1st weeding	12	36·00	
	b) 2nd weeding	12	36·00	
4. Harvesting Operation	a) Harvesting & carrying	6½	19·50	
	b) Thrashing.	5	15·00	
				30·00

Rs. 196·50 + Rs. 30·00 = 226·50 p·

এক একরে মোট ধান হতে পারে ১৭ মন এবং এর দাম পাওয়া যাবে ৫৪৪·০০ টাকা সুতরাং মোট ৬৫½ শ্রমজীবি মানুষের কাজের বিনিময়ে পাওয়া যাবে ৫৪৪·০০—২২৬·৫০ = ২১৭·৫০ পয়সা। (source Do p—15)

জুমচাষের গতি লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই ঃ

Table I

		1960	1970
1.	Population	6,45,707	11,42,005
2.	No. of Tribal families engaged in Jhum.	28,554	35,000
3.	Total area of Jhum. Total area (A table + Forest reserve).	6,75,734 Hec.	5,01,713 Hec.[৯৮]

এই চিত্রে আমরা জুমচাষীদের বৃদ্ধির পরিমাণ লক্ষ্য করি। এই প্রবণতা রোধ করবার জন্য সরকার নানা চেষ্টা নিচ্ছে। মহারাজার আমলেও আমরা দেখি অ-উপজাতিদের চাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উপজাতিদের 'রিজার্ভ এলাকা'র ব্যবস্থা করা যায়। পরবর্ত্তী সময়ে তাদের আরো সুযোগ সুবিধার জন্য চেষ্টা চলে।

কৃষি নির্ভর হওয়ার জন্যই এরা সরল। এদের জীবনযাপনের পদ্ধতিও সহজ। এদের সমাজ-অর্থনৈতিক বিকাশের নানা বিশ্লেষণ দেখা যায়। ভারতের সর্বত্র একই পদ্ধতিতে এই বিকাশের ধারা পরিচালিত হয়নি। "উঃ পূঃ ভারতে বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ জীবনের উপর সমতল অধিবাসীদের সমাজ-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাব সৃষ্টি করেছে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এবং এই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিই হচ্ছে আদিবাসীদের মাঝে বর্ত্তমান সামাজিক ও নানাবিধ রাজনৈতিক অস্থিরতা। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী চিরকালই এঁদের স্বাধীন জাতীয় সত্তা রক্ষা করার জন্য উন্নত-উৎপাদিকা শক্তির অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আদিবাসীরা জয়ী হয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের জাতিসত্তার একেবারে বিলুপ্তি ঘটেছে। জাতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা আদিবাসী জীবনের বৈশিষ্ট্য। নাগা মিজো খাসী ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী দীর্ঘস্থায়ী

প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল বলেই নিজস্ব জাতিসত্তার একেবারে বিলুপ্তি ঘটেনি। বরং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে আদিম সামন্তবাদের জয় থেকে আরেক ধাপ উন্নত স্তরে উত্তরণ করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও বুর্জোয়া সংস্কৃতির কু প্রভাব কালক্রমে তাদের জাতীয় সংস্কৃতির উপর দারুণ কুঠারাঘাত করেছে। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এও দেখা গেছে যে, অপেক্ষাকৃত উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার কাছে হার মেনে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বকীয়তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। দক্ষিণ ভারতে চকুস বা চেংকাস নামক আদিবাসী তেলেগু সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে।"[১৯] চেংকাসদের সংস্কৃতি উন্নত লাঙল সংস্কৃতির কাছে হেরে গেছে। কিন্তু এ ধরনের আগ্রাসন ঘটেনি, নাগা মিজো প্রভৃতি জাতির ক্ষেত্রে। কারণ তারা সমতলবাসীদের অর্থনৈতিক প্রভাব কিংবা সাংস্কৃতিক প্রভাব মুক্ত ছিল।

ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই রাজ্যের তিন দিকে বাংলাদেশ বেষ্টিত এবং প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশের এক বৃহৎ অংশ নিয়ে আরো সমৃদ্ধ ছিল। সমতলভূমিতে লাঙল প্রথায় চাষবাসের প্রচলন। তারপর এই রাজ্যের নানা ভাঙ্গা গড়ার সময় ত্রিপুরার মহারাজারা বাঙালী কৃষক মহাজনদের এই রাজ্যে অবাধ প্রবেশের সুযোগ দেন। সম্ভবতঃ পাহাড় ত্রিপুরায় সেই সময় কোন রাজস্ব আদায় হতো না। কারণ উৎপাদনের অপ্রতুলতা। লাঙল প্রথায় এই উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে এবং রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ হয়। এইরাজ্যে সমতলবাসীদের আগমন এবং উপজাতি জীবনে ও অর্থ-সামাজিক জীবনের ধারাকে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তারকরণের প্রক্রিয়া লক্ষণীয়।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এই রাজ্যে বাঙালীরা আসতে থাকে। তখন মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল অধিক। এবং এদের অধিকাংশই ছিল ভূমিহীন চাষী, শ্রমিক। অন্যান্য অংশের মানুষ বিশেষতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আসে। বিশেষভাবে নোয়াখালি চট্টগ্রামের লোকেরা এ রাজ্যকে বলত, 'হুরের হড়', (পুবের পাহাড়) চৌদ্দদেবতার জায়গা। যারা চতুর, কিংবা কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন তারা মহারাজা থেকে জায়গা জোত করে নিত। আবার অনেকে ভয়ে জোত করত না—কারণ খাজনা দিতে হবে। এখানে তখন ফসল ফলানো কঠিন ছিল—কারণ সমস্ত লুঙ্গা বা অন্যান্য সমতল অংশ ছিল অনাবাদী। অনাবাদী জায়গা চাষের উপযুক্ত করলেও যে ফসল পেতো—তা দিয়ে লাভ হতো না—কারণ ফসলের কোন বাজার ছিল না। রাস্তাঘাট ও

পাটের আঁশে পায়ের চাপ দিয়ে মাপলে যে পাঁচ সেরে ছয় সের নেয়া যায়, এ সব মার প্যাঁচ অনেক উপজাতিই বুঝতো না। বিশেষতঃ মেয়েরা বেচাকেনা করতো বলে (যা তারা হামেশাই করতো) এসব ব্যাপার আরো বেশী ঘটতো। এরপর ছিল জমি কেনা—বাবার আমলে ৫ টাকা দাদন এনেছে, 'ঝরা খরায়' ফসল গেছে কয়েক বছর—ঋণ শোধ হয়নি। ছেলের আমলে হয়তো সুদে আসলে ৫০ টাকা ধরে ১ কানি ভাল ফসলী জমি মহাজন 'কবলা' করে নিয়ে নিল। তহশীলদার দারোগা বাবুদের সেলামী তো ছিলই। এই দলিলে কত টাকা কতটুকু জমি লেখা হলো অনেক গৃহস্থই তা জানতে পারতো না। মহাজনের দেনা শোধ না করা অধর্মের কাজ তাই ঋণের দায়ে জোত জমি মহাজনদের ছেড়ে দিয়ে গহন অরণ্যে বড়মুড়া, আঠারমুড়ার দিকে চলে যাওয়াকে বরং ধর্মপথ মনে করা হতো। অবশ্য সব মহাজনের ক্ষেত্রে এসব খাটে না। মানবিক ও সৎ ব্যবহারের জন্য কেউ কেউ উপজাতি পরিবারের কাছে আপদে বিপদে নিতান্ত আপন জন হিসেবেই পরিগণিত হতো।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থ ও বুদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত উন্নত বাঙ্গালী সম্প্রদায় যতই বেশী সংখ্যায় প্রায় তিন দিক থেকে ত্রিপুরায় ঢুকে পড়ে আশ্রয় গড়তে থাকলো, ততই এসব উপজাতি দরিদ্র লোকদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে লাগলো। কিছুদিন এসব উপজাতি নরনারী বাঙালী ভূস্বামীদের জোত জমিতে দিন মজুরের কাজ করলো, লাকড়ি ও ঢেঁকিশাকের ব্যবসা করলো ও দুধ ও আনাজ বিক্রি করলো। বাঙালী কৃষ্টি ও জীবনধারার কাছে তারা নিতান্ত নিরুপায় বোধ করতো লাগল—হাটে বাজারে 'মামা' বা 'চৌধুরী' সম্বোধনে আপ্যায়িত হয়েও শান্তি পেত না। স্বাভাবিকভাবে অনেকের মাথায় জেগে উঠলো নেতিবাচক মনোভাব—মনে হলো সমতল ছেড়ে গহণ বনে চলে গেলেই বাঙালীর প্রভাব থেকে বাঁচা যাবে। আসাম আগরতলা রোড ও অন্যান্য 'হাইওয়ের' দুপাশে গড়ে উঠলো বাঙালীর বস্তি। জিরানীয়া, চম্পকনগর, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, শান্তির বাজার, জোলাইবাড়ী, বড়পাথারী প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু বাঙালী এলাকার ইতিহাস খুঁজলেই বুঝা যাবে, কতটা প্রচণ্ড চাপে এসব অঞ্চলের আদিবাসীরা জোতজমি ও বাড়ীঘর ত্যাগ করে চলে গেছে হাজারে হাজারে। উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা গরীব. তারাও একই নিয়মে ধনী বাঙ্গালীর কাছে জায়গা জমি ছেড়ে দিয়ে উজানের দিকে চলে গেছে। এধরনের অনেক বাঙ্গালী ও উপজাতি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী এখনো

বাস করছে প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে। শোষণের নিয়মও সর্বত্র এক ও অভিন্ন।

…অফিস, আদালত, স্কুল-পাঠাশালায় কর্মরত কর্মচারী, অফিসার ও শিক্ষক প্রায় সবাই ছিল অ-উপজাতি। আগরতলায় বাইরের কোন উপজাতি এসব জায়গায় গিয়ে ভয়ে ভয়ে চতুর্দিকে তাকাতো ; অনেক জায়গায় প্রতারিত হতো। নিতান্ত দায়ে না পড়লে এরা বড় শহরমুখী হতো না।

তৎকালীন সরকার এসব ব্যাপার নিয়ে ততটা মাথা ঘামাননি। একটা অনুন্নত জাতি সত্তাকে আরো অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য যা যা করার প্রয়োজন ছিল, তার কিছুই করা হলো না। ভাষা, সংস্কৃতি, পুণর্বাসন, শিক্ষা—কোন ব্যাপারেই উপজাতিরা বিশেষ সুযোগ পায়নি। চরম দুর্নীতির মাধ্যমে—'সেল সার্টিফিকেট' সংগৃহীত হতো—উপজাতিদের জমি বিক্রীর জন্য। শেষ পর্যন্ত মহারাজার আমলের 'ট্রাইবেল রিজার্ভ' এলাকাও তুলে দেওয়া হলো। ফল যা হওয়ার তাই হলো। চল্লিশের দশক থেকে যে উপজাতি কৃষক বা জুমিয়া জনশিক্ষা অন্দোলন বা গণমুক্তি পরিষদের মাধ্যমে বুঝে নিয়েছিল যে, পাহাড়ী বাঙ্গালীর ভাব ও সংহতিগত ঐক্য ছাড়া নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলা অসম্ভব, তারই পরিবারের কিশোর ও তরুণদের একাংশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে জেগে উঠলো হতাশা ও তার থেকেই, বিছিন্নতাবাদী মনোভাব। এই মনোভাবকে আরও চাঙ্গা করে তোলার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও বিদেশী শক্তি বিভিন্ন উপায়ে মদত দিয়েছে ও দিচ্ছে। ফলে কিছু সংখ্যক তরুণ ঐসব চক্রান্তের শিকার হয়ে নানা ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছে ; আরেক দিকে অ-উপজাতি অংশে জন্ম নিয়েছে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যাদের কাজের ফলে দিশেহারা 'উগ্রপন্থী' তরুণরা আরো বেশী করে জাতীয়তার বিরোধীর শক্তির আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে।'

লক্ষণীয় যে, যাটের দশক থেকে ত্রিপুরার রাজনৈতিক চিন্তাধারা দুটি পৃথক খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। অনেকটা যেন কৃতজ্ঞতার (!) দৃষ্টিতে অ-উপজাতিরা কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছে ; আর উপজাতিরা সমর্থন করেছে সাম্রাজ্যবাদী দলকে। আস্তে আস্তে এর রূপান্তর ঘটতে লাগলো—বাঙ্গালীরা (বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও গরীবরা) এ সিদ্ধান্তে পেঁছিল—পাহাড়ী বাঙ্গালী মিলে ত্রিপুরার উন্নয়ণ করতে হবে।"[১০০]

রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় উপজাতিদের উন্নতির জন্য বিশেষ কোন কর্মসূচী

নেয়া হয়নি। এই সময় তাদের উন্নয়নকল্পে জনগণের বিশেষভাবে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনমঙ্গল সমিতির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপজাতি সমাজে কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস নেই। বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যেও গ্রামীণ অর্থনীতি সহজ সরল পথে পরিচালিত ছিল। যেহেতু ধনতন্ত্রের বিকাশ এখানে বিলম্বিত ছিল, তাই দীর্ঘদিন বংশ বিচার প্রধান ছিল। উপ-জাতিদের ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস ছিল না—শুধু তাই নয় তাদের মধ্যে পেশাগত কোন শ্রেণীও নেই। এবং এই সমস্ত দিক থেকে পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য এরা সহজেই পেশায় উন্নত ও দক্ষ বাঙালী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছে। কামার, কুমোর, নাপিত বা অন্য পেশার লোকেরা এক সময় তাদের জীবনেও অনিবার্য হয়ে পড়ে। পাশাপাশি রাজানুকূল্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে—সহজেই তাদের সংস্কৃতি উন্নত সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়। "পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে বংশ বা রক্ত সম্পর্কে গড়ে উঠেছে নমশূদ্র জলচর, মুচি মেথর, কুলীন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি সামাজিক উপশ্রেণী। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজে পেশাগত শ্রেণী বিভাগ না থাকার দারুণ ঐ সমস্ত উপশ্রেণীগুলির উন্মেষ ঘটতে পারেনি। কালক্রমে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সমতল বাঙ্গালীদের ব্যাপক আগমনের ফলে আদিবাসী সমাজে কিছুমাত্রায় শ্রেণী বিভাজনের প্রভাব দেখা গেছে। নানাবিধ অথনৈতিক সংস্কারের ফলে শ্রেণী চেতনা অতি সূক্ষভাবে প্রবেশ করেছে। নানাবিধ সামন্তবাদী ভূমি সংস্কার আইন, সরকার কর্তৃক নানা প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠা এবং আদিবাসী জাতীয় জীবনে ভারতীয় অর্থনীতির স্রোতের গতিতরঙ্গ ইত্যাদি কারণগুলিই এর জন্যে দায়ী। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লাঙ্গলের চাষীরা ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্র সমতল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং খাস জমি দখল করে। গ্রাম গ্রামাঞ্চলে গ্রামীন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের কৃষক শ্রেণী উন্মেষ ঘটতে থাকে। গ্রাম্য অর্থনীতির ভিত গড়তে থাকে। এটাই হচ্ছে শ্রেণী বিন্যাসের প্রথম সোপান এবং সামাজিক ইতিহাসের গতিশীলতার বেগ সৃষ্টি করে। এর শুরু আধুনিক কাল থেকে অর্থাৎ মাত্র ত্রিশের দশকের প্রথম থেকে।

বৃটিশ ভারতে ত্রিপুরা' স্বাধীন ছিল। তদানীন্তন উপনিবেশিক ভারত-বর্ষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ থেকে 'ত্রিপুরা' সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল।

ত্রিপুরার হিন্দু রাজারা ব্যাপটিস্টদের এ রাজ্যে প্রবেশ করতে দেননি। একথা অনস্বীকার্য যে খ্রীশ্চীয়ান (ব্যাপ্‌টিস্টদের অনুপ্রবেশ হয়নি বলেই ত্রিপুরার আদিবাসীরা উঃ পূঃ ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে 'অমার্জিত' রয়ে গেছে। তদানীন্তন রাজারা কৃষির অর্থনীতির উন্নতি কল্পেই হোক আর কৃষির উপর রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যেই হোক তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উৎখাত কৃষক শ্রেণীকে দস্তুর মত স্বাগত জানিয়েছিলেন। এতেই বাঙালী দক্ষ কৃষি শ্রমিকদের আদিবাসীদের উপর আধিপত্যবিস্তারের সুযোগ হয়। রাজারা এই উন্নত চাষী সম্প্রদায়কে অন্যায় সুযোগ সুবিধা সহ স্থায়ী নাগরিকত্বের মর্যাদা দেন। বিনিময়ে এদের আনুগত্যে এবং সাহচর্যে রাজ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত কৃষি ব্যবস্থা কায়েম হয়। এতে রাজ্যে রাজস্ব বৃদ্ধির উপায়ও হয়। অনেকে যেমন আসামে বৃটিশ চা রোপণকারীরা পূর্ববঙ্গ থেকে ধনী কৃষক সম্প্রদায়কে আহ্বান করে সমতল জমির উপর সামন্ত প্রথা (classical feudalism) কায়েম করে। ত্রিপুরার বিদ্যমান আদিম সামন্ত প্রথার সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় সামন্ত প্রথার সহাবস্থান সম্ভব হয়। পূর্ববঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সে গ্রাম বাঙলার সামন্ত অর্থনীতি ইউরোপের প্রচলিত সামন্ত অর্থনীতির ন্যায় বিকশিত নয়। আগেই বলেছি পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য ব্যবস্থা আত্মনির্ভরশীল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আধুনিক উৎপাদনের কলাকৌশল এবং যান্ত্রিক প্রভাবের অভাব হেতু সামন্ততন্ত্র এক জটিল স্তরে ছিল (Asiatic feudalism বলে খ্যাত) যার জন্য শ্রেণী বিভাজন অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ছিল না। বংশ গৌরব ও রক্ত সম্পর্কই প্রধান ছিল। সমাজের কুলীন পরিবার দরিদ্র হলেও শ্রেণী মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতো। সদাগর শ্রেণী কারিগর শ্রেণী বা অবস্থা সম্পন্ন জেলে বা কৃষক শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করলেও, তাঁদের শ্রেণীমর্যাদা দেওয়া হত না। বংশ এবং রক্ত সম্পর্কের অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস। তাই সেকালের অর্থনীতি অচল ও স্থিতিশীল ছিল। সুতরাং সামন্তবাদের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়নি। বর্তমান ধনবাদী সংস্কৃতির ও অর্থনীতির চাপে আধা সামন্তবাদের চেহারা এক উৎকট কদর্য রূপ নিয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে ত্রিপুরা পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেও ত্রিপুরার মৌল সমাজ অর্থনীতির কাঠামো গড়ে উঠেছে আদিম সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আধা সামন্তবাদের অদ্ভুত

সংমিশ্রণে। আগেই বলেছি ত্রিপুরায় শ্রেণী বিভাজন হয়নি বলেই আদিবাসীদের মধ্যে ধনী, মধ্যনিম্ন বা ক্ষেত মজুর শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি। বংশ গৌরব বা রক্ত সম্পর্কের আভিজাত্যকে আশ্রয় করে পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তরা ত্রিপুরায় উচ্চশ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে থাকে। এমন কি কপর্দক শূন্য অবস্থায় এসেও আভিজাত্যকে একমাত্র পুঁজি করে রাজানুগ্রহ লাভ করে। এঁরা ভাগ্যবান, এরাই ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়েছে বিত্তশালী ধনাঢ্য শ্রেণীতে। সুতরাং একদিকে এ রাজ্যে গড়ে উঠেছে সমতলবাসীদের মাঝে শ্রেণী বিভাজন ও উপশ্রেণী আর অপর দিকে রয়েছে আদিম সামন্তবাদের অনড়তা।"[১০১]
তারপর ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর এ রাজ্যে প্রবেশের ফলে রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সংখ্যাগুরু উপজাতি যখন ক্রমশঃ সংখ্যালঘু যাচ্ছিল, তখন রাজ্যে নানা গোলযোগ দেখা দেয়। যেমন; রতনমণিরিয়াংয়ের আন্দোলনের পর, ১৯৪৮-৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন হয়। এবং ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য নিযুক্ত কমিশনের কাছে উপজাতিরা এই রাজ্যকে আসামের সঙ্গে নিযুক্তির দাবী জানায়। আবার একশ্রেণীর বাঙালীর দাবী এই রাজ্যকে কাছাড়ের সঙ্গে যুক্ত করে আলাদা রাজ্য গঠন করা হোক। এই সময় উপজাতিদের মধ্যে বিভেদকামী অকটা অংশ 'সেংক্রাক' নাম নিয়ে রাজ্যে বাঙালীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থায় উপজাতিদের জন্য বিশেষ প্রকল্প নেওয়া হয়।

স্বাধীনতার পূর্বেই তাদের সমস্যা চিন্তা করে অ-উপজাতিদের থেকে রক্ষা করার জন্য মহারাজা ট্রাইবেল এরিয়া নির্দিষ্ট করে দেন। পরবর্ত্তী সময়ে স্বাধীন ত্রিপুরায় তাদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নানা ভাবে উন্নতির .র।

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরত মূলতঃ কেন্দ্র নির্ভর। ৯০% ভাগ কেন্দ্রীয় অনুদান হিসাবেই আসে। অন্যদিকে উপজাতীয় অর্থনীতি বলতে কোন আলাদা অর্থনীতি না থাকলেও তাদের কৃষিপদ্ধতি বা নানা শিল্পকর্ম যা আয় ব্যয়ের সঙ্গে তা নিয়ে তাদের অর্থনীতির বনিয়াদ গঠিত বলা যেতে পারে। জুম স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যদিও বর্ত্তমানে তা ভাঙ্গনের পথে।

কিন্তু বর্তমানে তারাও আধুনিক সমাজজীবনের অংশীদার হচ্ছে শিক্ষার জন্য উপজাতি ছাত্র ছাত্রী শহরে আসে, চাকুরী সূত্রে শহরে আসে, ফলে আধুনিক জীবনযাত্রা তাদের নিকট আকর্ষণীয়। এই প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার পরবর্ত্তী দিন গুলিতে তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হয় এবং বিপর্যস্ত হয়। পূর্ববর্ত্তী আলোচনায় এর রূপরেখা ফুটে উঠেছে, তবু তাকে নিম্নলিখিত সূত্রে ধরা যায়ঃ

"গত পঁচিশ বছরে ওদের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কারণ (১) শরণার্থী পুনর্বাসনের ফলে জুমচাষের জন্য জমির পরিমাণ কমেছে (২) শরণার্থীরা ঘর বাড়ী করার জন্যে ও জীবিকার তাগিদে বনের উপর আক্রমণ চালায়। এতে করে জুমের জন্য জঙ্গলের পরিমাণ কমে যায়। (৩) গত পঁচিশ বছরে রাস্তা ঘাটের উন্নতি ঘটেছে। ফলে পাহাড় অঞ্চলে অনেক ছোট বড় বাজার ও গঞ্জ গড়ে উঠেছে। এসব গঞ্জে কাপড়, বাসন পত্র, সিগারেট ও চায়ের দোকান গজিয়ে উঠে। জনজাতীয় লোকদেরও সেলাই করা জামা কাপড়, চা, সিগ্রেট, বিড়ি ছাড়া আজ আর চলে না। কেউ কেউ বাস, জীপ বা লরী করে রাজধানী বা মহকুমা শহর গুলোয় সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অনেকেরই আগের জিনিস পত্রের ওজন বা দাম সম্বন্ধে ধারণা ছিল না; সে সুযোগ নিয়ে সমতলবাসী দোকানীরা অনেক সময়েই ওদের ঠাকিয়েছে। এখন ওজন ও দাম সম্বন্ধে তাদের সষ্ট ধারণা হয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ী, মহাজন এবং দোকানদারদের সম্বন্ধে থেকে গেছে একটা চাপা বিদ্বেষ এবং ঘৃণা। (৪) জুমিয়া পরিবারে ৩০ বৎসর আগে 'ঋণ' বলে কিছু ছিল না। কিন্তু আজ অনেক জুমিয়া পাররাবই ঋণগ্রস্ত। প্রথমতঃ জুম চাষের ক্ষেতের পরিমাণ এই পঁচিশ বছরে অনেক কমে গেছে। আধুনিক সার বীজ ব্যবহারের অভাবে উৎপাদন কমারই কথা।

অথচ জনসংখ্যা বেড়েছে। ফলে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পাতা দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক হালফ্যাসনের জীবনের প্রভাবে যে চাহিদা দেখা দিয়েছে তা মেটাতে জুমিয়াদের এখন অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেই বাড়তি টাকা যুগিয়েছে। মহাজন এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা 'দাদন' দানের মাধ্যমে। ফলে এই জুমিয়ারা এদের গম্পরে গিয়ে পড়েছে। চড়া সুদে টাকা ধার করে এরা আজ অনেকেই ঋণগ্রস্ত।

এখন এদের আয় ব্যয় সঞ্চয়-ঋণের খতিয়ান নেওয়া যাক্। ১৯৫৮ সালে

ডক্টর জলদবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে জুমিয়া গড় পরিবারের আয় হয়েছে ১০৭৪.৩২ পয়সা। মাথাপিছু আয় হিসেবে পরিবারের বণ্টন ছিল এরূপ ঃ

মাথাপিছু আয় টাকায়	পরিবারের সংখ্যা	মোট পরিবারের শতকরা হার
১—১০০	১৪	১২.৩
১০১—২০০	৬৩	
২০১—৩০০	২৪	৫৫.২
৩০১—৪০০	৯	২১.০
৪০ —৫০০	১	
৫০১—৬০০	০	৮.০
৬০১—৭০০	১	
৭০১—৮০০	১	
৮০১—৯০০	১	৩.৫
মোট	১১৪	১০০.০

এ চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ। শতকরা ৬৭.৫ ভাগ পরিবারের মাথাপিছু আয় ২০০ টাকার কম। অথচ তৎকালীন হিসেবে একজন লোকের নেহাৎ বেঁচে থাকার জন্য দরকার ২২৪ টাকার।

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ নিরীক্ষাযুক্ত পরিবারের শতকরা ৮৮.৫ ভাগই গরীব, বস্তুতপক্ষে অত্যন্ত গরীব।

জুমিয়া পরিবারের ব্যয়ের মধ্যে আছে খাদ্য, বস্ত্র, মদ্যজাতীয় পানীয়, তামাক ইত্যাদির খরচ। তাছাড়া আছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা পার্বনের খরচ। বিলাস দ্রব্যের মধ্যে আছে 'গন্ধতেল ও সাবান, কুমকুম, আলতা, চুলের কাঁটা, সস্তাদামের গরম কাপড় ও সস্তা সিগারেট ইত্যাদি। বছরে একজন লোকের পক্ষে কোনরকমে বেঁচে থাকতে গেলে দরকার ২৯০ টাকার (তৎকালীন দামে) স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে গেলে ৩১৬ টাকার ও যন্ত্রপাতির খরচো সহ ৩৩২ টাকার। অথচ অধিকাংশের বাৎসরিক আয় ছিল ২০০ টাকার কম।

শতকরা ৯৫ জন জমিয়াকেই মহাজনদের কাছ থেকে দাদন বা ঋণ নিতে হয়। আগে তারা ঋণ যেভাকেই হোক বছর বছর পরিশোধ করে দিত। বর্তমানে তাও পারছেনা। কলের ঋণের বোঝা ক্রমশই বাড়ছে। ১১৪টি পরিবারের মধ্যে ৫৭ টিই ১৯৫৮ সালে ছিল ঋণগ্রস্ত অর্থাৎ অর্ধেক পরিবারেরই ঋণ ছিল। এবং প্রত্যেক পরিবারেরই গড়ে টা ৫৮·৪২ পয়সা ছিল।

ঋণের উৎস বিচারে দেখা যায় যে আগে যেখানে একমাত্র মহাজনেরাই ঋণ দিত, ১৯৫৮ সালে শতকরা ১·৮ থেকে ৩১·৫ ভাগ ঋণ দিয়েছে মহাজন, শতকরা ৪৭·৪ ভাগ ঋণ দিয়েছে সরকার, আত্মীয় অন্য জমিয়ারা দিয়েছে ১৯·৩ ভাগ, সমবায় সমিতি দিয়েছে ১·৮ ভাগ।

১৯৬৩-৬৪ সালে অনুষ্ঠিত ১৮তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে সমীক্ষাভুক্ত ৬০,৯৪৫ টি পরিবারের মধ্যে ৩৪০৬৮ টি জমিয়া পরিবারই অর্থাৎ শতকরা ৫৬ টি পরিবারই ঋণগ্রস্ত। গড় মাসিক ব্যয় অনুযায়ী শ্রেণীভুক্ত পরিবারের ঋণের বিস্তারিত হিসাব নিম্নের সারণীতে পেশ করা হল ঃ

গড় মাসিক ব্যয় অনুযায়ী ঋণগ্রস্ত জনজাতীয় পরিবারের শতকরা হিসাব।

গড় মাসিক (টাকা) ব্যয়	ঋণগ্রস্ত পারিবার সংখ্যা	অ-ঋণগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	ঋণগ্রস্ত পরিবারের শতকরা হিসাব
০— ৫০	২,৩৯৭	৩,৪১৭	৪১
৫১—১০০	১৫,৫০৪	১৩,৭৭০	৫৩
১০১—২০০	১৪,০৭৬	৮,৮২৩	৬১
২০১—৩০০	১,৮৮৭	৬৬৩	৭৪
৩০০—৫০০	২০৪	১৫৩	৫৭
৫০১—৮০০	—	৫১	—
৮০১ ও তদূর্ধ্ব	—	—	—
সমস্ত	৩৪,০৬৮	৬,২৮৭৭	৫৬

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত জমিয়া পরিবারের গড় মাসিক ব্যয় ৩00 টাকা পর্যন্ত সে সমস্ত পরিবারের মধ্যে গড়ে শতকরা ৫৭ অংশই ঋণগ্রস্ত। এখানে লক্ষণীয় যে, 0—৫0 টাকা যাদের মাসিক ব্যয় এমন সব পরিবারের মধ্যে ৪১ শতাংশ ঋণগ্রস্ত। অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত পরিবারের তুলনায় এদের মধ্যে কম ঋণগ্রস্ততার কারণ সম্ভবতঃ এটা হতে পারে যে এদের আয় তথা ব্যয় এতই কম যে এদের ঋণ প্রাপ্তি যোগ্যতাও আনুপাতিক ভাবে অত্যন্ত কম।

১০১—৩০০ টাকা যে সমস্ত পরিবারের ব্যয় সে সমস্ত পরিবারেই ঋণগ্রস্ততা বেশী—গড়ে ৬৭ ভাগ পরিবার ঋণগ্রস্ত।

আজ ১৯৭৩ সালে মুদ্রাস্ফীতির চাপে জুমিয়া পরিবারের আর্থিক আয় হয়তো বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আসল আয় কমারই কথা। জুমিয়া পরিবারের ব্যয়ের পরিমাণ অনেকাংশে বাড়ার কথা, কারণ এই ১৪ বছরে (১৯৭৬) দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিষ পত্রের দাম চার পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ জুমিয়া পরিবারের আয় বৃদ্ধি সে হারে হয়নি। কারণ জুমিয়ারা বিক্রি করে কৃষিজাত দ্রব্য যথা তুলা, মেস্তা, তিল ইত্যাদি। কিন্তু কোন শিল্পজাত দ্রব্যাদি আর দাম দিন দিনই অস্বস্তিকরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব অনুমান করতে বিন্দু-মাত্র অসুবিধা হয় না যে, এর ফলে অধিকাংশ জুমিয়া পরিবারেরই অর্থনৈতিক অবস্থা আরো কাহিল।"[১০২]

এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য স্বাধীনতার ঊষালগ্নেই প্রচেষ্টা শুরু হয়। ইংরেজ শাসিত ভারতে সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচক মণ্ডলী ছিল। ১৯০৯ সালে ইংরেজ সরকার মর্লে-মিণ্টো সংস্কার অনুসারে এই প্রথা চালু করে। সেই আইন পরবর্ত্তী সময়ে ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালে আরো নানা ধারার সাহায্যে পূর্ণশক্তি অর্জন করল। পরবর্ত্তীকালে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে আমরা এই তিক্ত অবস্থা মুক্ত হতে পারিনি। তবু সত্যিকারের পশ্চাদপদ যারা তাদের মধ্যে উপজাতিদের প্রসঙ্গ সংবিধান প্রণেতারা স্মরণে রেখেছেন। তাদের স্বার্থ সংবক্ষণে সংবিধানের ষোড়শ খণ্ডে কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ত্রিপুরায় উপজাতিদের স্বার্থে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ১৯৫১ সালে তপশীলি উপজাতি আদেশ বলে [(The Constitution Scheduled Tribes, Union Territories) Order 1951, C,O, 33] পূর্বে উল্লিখিত ১৯টি জনগোষ্ঠীকে তপশীলি উপজাতি হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়।

তপশীলি এলাকার ঘোষণা না হওয়ায় (বর্ত্তমানে ৬ষ্ঠ তপশীলি চালু আছে) ৫০% বা তার বেশী সংখ্যক উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে Tribal Development Block বা উপজাতি উন্নয়ন ব্লক (T. D. Block) নাম দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাতে এমন ৫টি উন্নয়ন ব্লক আছে। ত্রিপুরাতে মোট ১৭টি ব্লক আছে। অবশিষ্টগুলি T. D. Block না হলেও উপজাতিদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা আছে। সেজন্য এগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ব্লক বা সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development project)

চালু হয় ভারতের সমাজ, বিশেষ করে গ্রাম সমাজকে উন্নত করার বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প দু' রকমের—বুনিয়াদী গ্রামীন সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (The Basic Type Rural Community Development Project) ও যৌগিক সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Composite Type Community Project)। প্রথম প্রকল্প ২ লক্ষ অধিবাসী আছে এরূপ ৩০০ গ্রাম ও প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত। কৃষির উন্নতির উপরই বেশী জোর দেয়া হয়। স্থান বিশেষে ১০০টি গ্রাম নিয়েও ক্ষুদ্র বুনিয়াদী প্রকল্প করা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকল্পে কৃষি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ও গ্রামাঞ্চলে সহরবাসের বিবিধ সুবিধা সমূহ প্রবর্ত্তনের কার্যক্রম নেওয়া হয়। ভারতের পরিকল্পনার সঙ্গে এর সূত্রপাত। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় এই খাতে খরচ করা হয় ৫২৭.৫৭ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ণ প্রকল্প ও পঞ্চায়েতী রাজ্যের জন্য মোট ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। আর পঞ্চম পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয় ১২৮.৭১ কোটি টাকা। পরে এর সামান্য হের ফের হতে পারে। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রথম প্রায় ৫২৬৫টি ব্লক ছিল। কিন্তু পরে পুনর্গঠনের জন্য ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এর সংখ্যা নেমে হয় ৫১০৩টি। ত্রিপুরাতে প্রথম পরিকল্পনাকালে তিনটি ব্লক গঠিত হয় এবং মোট খরচ হয় ১৫.৯৮ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রথমে ১৫টি ব্লক গঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৯টি ব্লক ও ২টি প্রি এক্সটেন্সন ব্লক গঠন করা হয়। ৭৫ লক্ষ টাকার মত খরচ করার কথা ছিল কিন্তু এর চেয়ে ৫ বা ৬ লক্ষ টাকার মত কম খরচ করা হয়। ক্ষুদ্র সেচ কার্যের ধীর গতির জন্য খরচ করা যায়নি। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯০ লক্ষ টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত ছিল এবং ৪র্থ পরিকল্পনায় ১৭টি ব্লক গঠিত হয় এবং ৩৫,২৫০ লক্ষ টাকা খরচ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

ব্লকগুলি প্রত্যেক মহকুমার উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। ব্লকের মাধ্যমে নানা গ্রাম্য কাজের (rural work) সৃষ্টি করা হয়। এই ১৭টি ব্লকের মধ্যে ৫টি উপজাতি উন্নয়ন ব্লক। অবশিষ্ট ব্লকগুলিও বলা বাহুল্য অন্যান্য অংশের মানুষের সাথে উপজাতি জনগণেরও সাহায্য করে। এবং এই ১৭টি ব্লকে ১৭ জন Tribal Extention officer থাকেন এঁরা বি. ডি. ও. বা পি. ই. ও-র সাথে যোগাযোগ ক্রমে কাজ করেন। তবে তাঁদের দায়িত্ব জেলার উপজাতি কল্যাণ আধিকারিকের নিকট।

[ত্রিপুরার সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ—গায়ত্রী ভট্টাচার্য ঃ ঋণস্বীকার]

ত্রিপুরাতে একটি উপজাতি মন্ত্রণা কমিটি আছে যার সভাপতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপসভাপতি, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী। এ ছাড়াও তাঁদের উন্নয়নের জন্য নিম্নরূপ প্রশাসনিক কাঠামো আছে।

উপজাতি কল্যাণ বিভাগের সচিব—উপজাতি অধিকর্তা বা সহসচিব—উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক—৩জন উপজাতি কল্যাণ আধিকারিক, তিনটি জেলা পর্যায়ে।

এইভাবে সরকার তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, এবং জীবনযাত্রা উন্নীত করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে। ফলে "Their way of life is undergoing continuous changes on getting exposed to the forces of modern development exhibits. Attempts in bigger scale to improve their lot and bring them at par with the general population are going on since the inauguration of the five year plans in the country. The tribal welfare organization of Tripura has been working since the year 1953 mainly for formulation and implementation of scheme for the welfare of scheduled tribes and scheduled castes."[১০৩]

১৯৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত সংখ্যা চিত্র দেখলেই এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা করা যায় ঃ

পরিকল্পনা	রাজ্যস্তরে ব্যয় (উপজাতি উন্নয়নের ব্যয়) পরিকল্পনায় ধরা হয়েছে	লক্ষ্য টাকা হিসাবে ব্যয় হয়েছে
প্রথম পরিকল্পনা	২৪'৯০০	২১'০৪০
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	১১৯'২৪০	১০৭'৪৯৭
তৃতীয় পরিকল্পনা	১১৮'৭০৫	১১৬'৬৯৯
১৯৬৬-৬৭	২৮'৭৪০	৩০'৮৫৬
১৯৬৭-৬৮	৩১'০০৬	২০'৯৯৭
১৯৬৮-৭৯	২৯'০০	২৩'৩৩৫
৪র্থ পরিকল্পনা		
১৯৭২ এর মার্চ পর্যন্ত	১৬৯'০০০	৬৬'৭০২
	৫১৯'৫৯১	৪১২'৫৪০

কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব ব্যয়

৪র্থ পরিকল্পনায়	৪০·০৫০	১৪·৯৭৪
কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৭২-এর মার্চ পর্যন্ত দেয় অর্থ		
মোট	৫৫৯·৬৪১	৪০৯·১৩০

এসব পরিকল্পনায় বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পের মধ্য দিয়ে উপজাতিদের জীবনে অর্থনৈতিক স্থিরতা আনয়নের চেষ্টা করা হয়।

ত্রিপুরায় বহিরাগত ও রাজআনুকূল্যপুষ্ট সাহিত্য

উপজাতিরা ত্রিপুরার মূল আদিবাসী হলেও বর্ত্তমানে এদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় কম, এদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ব্যবহার প্রসারের অপ্রতুলতার জন্য এরা আজো বিংশ শতাব্দীর আলো থেকে বঞ্চিত। ফলে এদের জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক। এছাড়া মহামারী প্রভৃতির ক্ষেত্রে শিশুবৃদ্ধ প্রায় সকলেই অজ্ঞতাবশতঃ চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে সুযোগ গ্রহণ করে না কিংবা গ্রহণের সুযোগ পায় না।

ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি শাসিত রাজ্য হলেও এ রাজ্যের আদিবাসীরা যেমন সরল তেমনি ত্রিপুরার মহারাজাও ছিলেন সরল এবং প্রজাবৎসল। ফলে তারা উপজাতি বাঙালীকে ভিন্ন চোখে দেখেননি। বরং বাঙালীদের মধ্যে শিক্ষিত ও গুণীর সন্ধান পেয়ে তাদের বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। ত্রিপুরার মহারাজ "ডাঙ্গরফার জীবদ্দশায় তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র রত্নফা গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্তার সাহায্যে ১২৭৯ খ্রীঃ ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া রাজা হন।……তৎকালীন ত্রিপুরার সামাজিক অচলায়তনের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন বৃত্তিভুক্ত দশসহস্র বাঙালী প্রজা রাজ্যমধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন।"[৩৮]

এইভাবে ত্রিপুরার মহারাজাদের আনুকূল্যে ত্রিপুরায় বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেহেতু ত্রিপুরার রাজারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, সেহেতু ত্রিপুরার প্রজাসাধারণের সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে অনৈক্যের কোন সুযোগ ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে বাংলাদেশে মুসলমান শক্তির উৎপীড়নের যে দীর্ঘ ইতিহাস ও বিশৃঙ্খলার কাহিনী আছে তাতে মনে হয় অনেক হিন্দু

রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় নিরাপদ ও জনমানববিরল অঞ্চলে নিজেদের নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজতে দলে দলে চলে আসে। এভাবে এরাজ্যে বাঙালীদের অনুপ্রবেশের দীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়।

তবে বর্ত্তমানের এই পরিবর্ধমান জনসংখ্যা ইদানীংকালের। ১৯৩১ সাল থেকেই এদেশে অনুপ্রবেশের ধারাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়।

এই রাজ্যে বহিরাগতদের আগমণের মূল কারণগুলি এরূপ ঃ

প্রথমতঃ ত্রিশদশকের গোড়ায় সারা বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংকট ও তজ্জনিত দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে আতংকিত কিছু সংখ্যক মানুষ এ জেলায় আশ্রয় নেয়।

পরবর্ত্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়। ঐ সময়ও কিছু লোক খাদ্যের সন্ধানে ঐ জেলায় চলে আসে। তবে চল্লিশ দশকে বেশী লোকের অনুপ্রবেশের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সংকটের ফলে জনজীবন অসহায় হয়ে পড়েছিল—অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কিছু আন্দোলনকারী ও ভীত লোক ইংরেজ শাসন মুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরায় চলে আসে।

তারপর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে কিছু অংশের মানুষ বেঁচে থাকার আনন্দের পরিবর্ত্তে লাভ করল মরণ যন্ত্রণা। কারণ দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর নির্ভর করে অখণ্ড ভারতবর্ষ দুভাগ হল—ভারত ও পাকিস্তান। মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান। ফলে সেখানকার হিন্দুরা বাধ্য হলো ভারতে চলে আসতে। দলে দলে লোক এদেশে চলে এলো।

এভাবে দেশবিভাগের পরে লক্ষ লক্ষ মানুষ পার্শ্ববর্ত্তী জেলা চট্টগ্রাম নোয়াখালি, কুমিল্লা থেকে এসে বসবাস করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ত্রিপুরার মহারাজা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের অধীনে "রিলিফ এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেল" নামে একটি সেল ১৯৪১ সালে রায়পুর রায়টের পরে (অবিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়) খোলেন। পরবর্ত্তী সময়ে নোয়াখালিতে ১৯৪৬ সালে দাঙ্গা আরম্ভ হলো—এটাকে আলাদা ডিপার্টমেণ্টে হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং ১৯৫০ সালে ভারতসরকারও এই ডিপার্টমেন্টের স্বীকৃতি দেয়। এইভাবে স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে বাংলাদেশ

থেকে বাঙ্গালীরা এসে বসবাস করছে এবং ভারতের নাগরিক হিসেবে পরিচয়পত্রও সংগ্রহ করছে।

ত্রিপুরারাজ্য দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষিত বাঙালীর নিকট শুধু পরিচিতই নহে—বাঙালী ত্রিপুরা জাতির নিকট নানাভাবে ঋণীও। "বিশ্বকবি ও বিজ্ঞানাচার্য বসুমহাশয়কে বাদ দিয়া আধুনিক সভ্য বাঙ্গালী পরিচিত হইতে পারে না। তাই বাঙ্গালীর এই দুইটি শ্রেষ্ঠ সন্তানকে জানিতে গেলে ত্রিপুরা রাজকেও কল্পনায় জানিতে হয়।...এই জাতির কাছে বাঙালী এক হিসাবে ঋণী। এই রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। শাসনকার্য, আইনকানুন, পূর্ত্ত ও পৌরবিভাগ সকলই বাংলায় পরিচালিত হয়। মামলা, মোকদ্দমা, সওয়াল, জবাব, জেরা, রায়দান, ইত্যাদি বাংলা ভাষায় হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ একটি রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, বাংলা ভাষার চলিতেছে বলিয়া বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে এই ত্রিপুর জাতির দান কালে অক্ষয় হইয়া থাকিতে বাধ্য।"[১০৪]

মহারাজ ধর্মমাণিক্য (১৪৩১-১৪৬২) পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে সিংহাসনে বসেন। তাঁর প্রবল সাহিত্য অনুরাগ ছিল। তিনিই প্রথম 'রাজমালা' রচনার কাজ শুরু করেন। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে তিনিই সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দান করেন। তারপর কয়েকশ বছর অতিক্রান্ত হয়। বহু রাজার উত্থান পতন হয়েছে। বিভিন্ন ভাবধারা ত্রিপুরা রাজ্যকে প্লাবিত করেছে কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠাকে দুর্বল করতে পারেনি। 'রাজমালা' লেখক কৈলাসচন্দ্র সিংহ লিখেছেন—

"ত্রিপুরার রাজভাষা বাঙ্গালা, ইহার অধিকাংশ অনুশাসন বাঙ্গলাভাষা ও বাঙলা অক্ষরে লিখিত। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলা ভাষা গৌরবান্বিত।" প্রসঙ্গতঃ কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুরের উক্তিও উল্লেখযোগ্য ঃ "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সোনার চেনের সহিত একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞেস করিয়াছিলেন, 'তোর চেনের ঝলঝলানির সঙ্গে যে মোহর চক চক করিতেছে,—ইহা কোন মোহর?' আমি বিনম্র বচনে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম (১৮৮৪ খ্রীঃ এর কথা) ইহা আমাদের রাজ্যের মোহর। তিনি হাতে করিয়া পাঠ করিলেন, "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, শ্রীশ্রীমহারাণী গুণবতী দেব্যা।' ইহা পাঠ করিয়াই তিনি পুলকিত হইয়াই উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ইহাতে

যে বাংলাভাষার ছাপ। তবে আমার বাঙলা রাজভাষা।'—এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নিকট লইয়া যান। তারপর ত্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের নিকট তাঁহারা উভয়ে পত্র লিখিয়া উক্ত মহারাজাকে বঙ্গভাষা সংবর্ধনসভার পৃষ্ঠপোষকরূপে পাইয়াছিলেন।

শুধু রাজকার্যে নয়,—ত্রিপুরার মঠ-মন্দিরে সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি থাকলেও এগুলি বাংলা হরফে লেখা হয়। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উত্তর দিকের ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে দুটি প্রস্তর ফলক বাংলায় লেখা। উত্তরদিকের ফলকে শক ১৬৩ লেখা। মনে হয় এটা ভুল। এটা হতে পারে ১৬০৩ শক বা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

সারাভারতে যখন ইংরেজদের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত তার প্রভাব কখনও ত্রিপুরায় পড়েছিল। একবার মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর মন্ত্রী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ইংরেজী ভাষায় আদেশ প্রচার করতে দেখে তাঁকে লিখেছিলেন, "এখানে আবহমানকাল রাজকার্য্যে বাঙ্গলাভাষার ব্যবহার এবং এই ভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপে অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় ; হিন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে করি। বিশেষতঃ আমি বঙ্গভাষাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি এবং রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাবা যাহাতে দিন দিন উন্নত হয় তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি। ইংরেজী শিক্ষিত কর্মচারীবর্গের দ্বারা—রাজ্যের এই চিরপোষিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় সে বিষয়ে আপনি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন।"

অন্যদিকে রাজপরিবারের অনেকেই এই ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে ত্রিপুরায় সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার সূত্রপাত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য, মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর, রাজকুমারী কবি অনঙ্গমোহিনীদেবীর (মহারাজ বীরচন্দ্রের কন্যা) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের 'হোরি', 'ঝুলন,' 'উচ্ছ্বাস', 'অকালকুসুম', 'সোহাগ' উল্লেখযোগ্য। রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর বিশেষ কোন গ্রন্থ না লিখলেও বিভিন্ন সময়ে রাজপরিবারের লেখায় সমৃদ্ধ 'বার্ষিক' পত্রিকায় লিখেছেন। এটি রাজপরিবারের একটি বার্ষিক পত্রিকা ছিল।

রাজকুমারী কবি অনঙ্গ মোহিনী দেবীর রচনার মধ্যে বীরচন্দ্রমাণিক্যের প্রতিভা পরিস্ফুট হয়েছিল। তাঁর কবিতার ভাষায় ও শব্দ নির্বাচনে পাণ্ডিত্যের

পরিচয় রয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম 'কণিকা'। এটি ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলো—'শোক গাথা,' 'প্রীতি' প্রভৃতি। 'শোকগাথা' কাব্যের ভূমিকায় কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের উক্তি স্মরণীয় "ত্রিপুরার রাজ পরিবারে সরস্বতীর বিশেষ কৃপা সঙ্গীতে চিত্রে, কাব্যে, রাজপরিবারের খ্যাতি বঙ্গদেশ ব্যাপী। রাজপরিবারের মহিলাগণও যে উহাতে অনুরাগিণী এবং কবিত্ব প্রতিভায় দীপ্তিমতী রাজকুমারী অনঙ্গ মোহিনীদেবীর কবিতায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।" 'প্রীতির কবিতাগুলিও উল্লেখযোগ্য। এগুলি সম্পর্কে গবেষক মোহিত পুরকায়স্থ বলেছেন, "প্রীতির কবিতাগুলি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে বিচিত্র রসধারায় বাংলা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করেছে।"[১০৫]

বস্তুতঃ 'প্রীতি' ত্রিপুরারাজ্যে সাহিত্যচর্চায় নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। (প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ সাল) কাব্যের 'উৎসর্গ' প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন—

"তোমার কণ্ঠের সুরে বাঁধিয়া লইয়া বীণা
প্রতি তারে দিয়াছি ঝঙ্কার ;
গাহেনা সে অন্য গান তব প্রিয় নাম বিনা,
গীতি, প্রীতি, সকলি তোমার"

এই কাব্যের ৩১টি কবিতার প্রায় সকল কবিতায় প্রেমের গভীর ব্যাকুলতা, প্রীতি লাভের প্রবল বাসনা বা প্রকাশ ঘটে। প্রথম কবিতায় এর সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে ঃ

"কি প্রীতি লভিতে আজি আসি
দাঁড়ায়েছি দুয়ারে তোমার ?
তুমি জান, হে জগৎ স্বামী
নাহি যাচি তৃপ্তি বাসনার।
প্রীতি নহে সুখ-রস-পান
আঁখি সুদে আলস্যেতে লুটে
প্রীতরসে তাজা মৃত প্রাণ।
প্রীতি দীপ্ত বিশ্ব চলে ছুটে।
যে প্রীতির স্রোত নিরবধি
শুষ্ক চিত্ত রসে সিক্ত করে,

সেই প্রীতি অমরার নদী—
প্রবাহিত কর এ অন্তরে।" (নিবেদন)।

প্রীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

"পূর্ণ্যের নামে যেই অভাগিনী
পুষি' দুখ, প্রাণ-মাঝে তার;
গৃহ-কোণে বসি কাঁদে অনাথিনী
উড়ে যাব আমি কাছে তার।
বুঝাব, প্রীতির লক্ষ বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা ;
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা।"
(সাধনা,) পৃঃ ৩)

শুধু তাই নয়, তিনি বিশ্বজুড়ে প্রেমকে অনুভব করেন

"প্রেমের অসীম সিন্ধু মাঝেতে জীবন
যেন ক্ষুদ্র দ্বীপসম জাগে ;
কূল উপকূল তার করিয়ে চুম্বন
উত্তাল তরঙ্গ আসি লাগে।...
তোমাতে বিরাজে শুধু করুণা তরল,
অতি শান্ত, অতি স্নিগ্ধ নীল ;
দর্পণের মত স্বচ্ছহৃদয় সরল,
সুগভীর অতি অনাবিল।
প্রেমের সাগরে ডুবে আমি গলে যাই,
প্রেম হয়ে প্রেম মাঝে থাকি।
হে অসীম, হে অনন্ত, এই ভিক্ষা চাই
রাম মোরে স্নিগ্ধ নীরে মাখি।
[প্রেমসিন্ধু পৃঃ ২৮-২৯]

এই কাব্যেও বৈষ্ণব সাধনা বিষয়ক একটি কবিতা আছে—

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ
। কীর্ত্তন।

পরাণের কোন গো আমার
পীরিতি লুকানো ছিল ?

কভু—বুঝি নাই কভু—খুজি নাই
(কোথা) পীরিতি ভরিয়া ছিল?
(কার) পরশের অণু পবনেতে তনু
পরশিয়া উলসিল?
(ওগো) দেখি নাই যারে সে কিনা আমারে
পাগল করিয়া দিল।
(ঐ) উছলিয়া যায় পীরিতি কোথায়
মোরে ভাসাইয়া স্রোতে গো?
(সেকি) এই নদী দিয়া আসিবে গাহিয়া
ভেসে ভেসে সুখ স্রোতে গো?
এতখানি সুখ লিখিয়াছে বিধি রাধার কপালে কিগো?

[পৃঃ ৩৭]

'মৃত্যুর অমৃত পাত্রে' যে সুধা তাকে গ্রহণ করব কি ভাবে—এই নিয়ে কবির ভাবনা অতি সুন্দর ভাবে রূপ লাভ করেছে তাঁর 'মরণ' কবিতায়—

"এস ওগো, এস এস আমার মরণ।
এস হে সুন্দর সৌম্য। সুনীল বরণ।
বাজিয়া উঠিছে শঙ্খ সন্ধ্যার আরতি,
তুমি এসে হৃদিতলে, মৃদু মন্দ গতি!
হেরিব তোমার শ্যামরূপ বিমোহন,
এসো গো, মহান, মোর তাপ বিমোচন।
সমস্ত দিবস হয়ে গেছে অবসান
চাহি পথ ক্লান্ত মোর হয়েছে নয়ান!
জীবনের পর পারে বসি উভরায়
সতত কে যেন মোরে ডাকে "আয় আয়।
কেমনে অচেনা পথে একা যাব আমি
সম্মুখে ঘনায়ে আসে মসীময়ী যামি।
গরজি ছুটিছে উর্ম্মি অকূল পাথার—
তুমি বিনা এ পায়ের সাথী কেব আর।
ঘনীভূত হয়ে আসে সন্ধ্যার আঁধার।
দাঁড়াও আসিয়ে ধীরে শিয়রে আমার।

শ্যামস্নিগ্ধ-গোধূলিতে কবির চরণ,
এসো সখা, বরবেশে মন্থর বরণ।
আমরা দুজন যাত্রী অনন্ত পথের
বাজিছে অধীরে ভেরী তোমার রথের
হৃদি অন্তপুর হতে পরাণ বধূরে
অলক্ষে লইয়া যাও অনন্ত সুদূরে!
দেখিবে না, জানিবে না, কেহ কভু আর
পাবে না উদ্দেশ্য খুঁজি এ জগতে তার।
ফুটিয়া উঠেছে তারা রঙীন আকাশে
পতাকা চঞ্চল তব সন্ধ্যার বাতাসে।
শিথিলিত হয়ে আসে জীবন বন্ধন—
নিমিলিত হয়ে আসে অবশ নয়ন।
সময় হয়েছে এবে সুদূরে যাত্রার
এসো অসীমের সাথী, মরণ আমার।" [পৃঃ ৪৪—৪৬]

এইভাবে রাজমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং ত্রিপুরার রাজাদের সাহিত্য কর্ম দ্বারা পুষ্ট হয়ে বাংলা ভাষা উন্নত হয় ও ব্যাপকতা লাভ করে। এ ভাষা সম্পর্কে 'রাজমালা' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত বলেছেন, "ত্রিপুরার দরবারী সকল ক্ষেত্রে ঠিক বর্ত্তমানকালের বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ না হইলেও অন্যান্য প্রদেশের আমলাই ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত, একথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে।"

জাতি উপজাতির সংস্কৃতিগত ঐক্য

এ জেলার বাঙালী এবং উপজাতি উভয় অংশের সংস্কৃতিগত দীর্ঘপথ পরিক্রমণ রয়েছে। সংস্কৃতিগত মিলনের এই দিককে মিশ্র সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে "এই রাজ্যের জনতার প্রতি নেহেরুজীর 'মিক্সড পপুলেটেড' উক্তিটি মিথ্যে নয়। তাই আপাত অবয়বে জীবিকার ভিন্নতর চেষ্টায় রক্তের সহযোগে আমরা পরস্পরকে পুষ্ট করছি, কখনো বা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছি। মূলতঃ এই ভূখণ্ডের প্রথম দাবীদার বলে ইন্দোমঙ্গোলীয় বড়ো পরিবারভুক্ত যে উপজাতীয় সমাজের কথা আমরা বলি এদের কর্মচিন্তা এবং পার্শ্ববর্ত্তী বাংলার জনজীবনই এই মিশ্রণ কৃতিত্বের অগ্রবর্ত্তী ভূমিকা

নিয়েছে। তৎসহ একদা সংখ্যা গৌরবে মুসলমান সমাজ, খণ্ড ধারায় মণিপুরী সম্প্রদায়, বিক্ষিপ্তপটে হিন্দুস্থানী ও নেপালী গোষ্ঠী, এদের উপস্থিতিও এই মিলন সেতু রচনায় সহায়ক হয়েছে। বেঁচে থাকায় উপকরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও মানস সম্পদ সংস্কৃতি চিন্তার এই যে তিন অঙ্গ, এই ত্রিমুখী প্রয়োজনেই ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলার সংযোগ সাধিত হয়ে এসেছে এবং এই সংযোগের কাল মুঘল ভারতের সময় থেকে।··· উদয়পুরের মহাদেব বাড়ীতে পাঁঠা বলিদান, ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির অথবা চতুর্দ্দশ দেবতার বাড়ীতে ডিম পুজো দেওয়ার রীতি আদিবাসী প্রভাবের কথা বলতে পারে।···মূর্ত্তিগুলির মুখের গড়নে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব হয়তো কারো কারোর দৃষ্টিতে পড়তে পারে। হিন্দু নামকরণের সঙ্গে মূর্ত্তিগুলির আদিবাসী নামকরণ রয়েছে। চন্তাই যেমন এই দেবতার প্রধান পূজক, তেমনি গোষ্ঠীর একজন।"[১০৬] এই ভাবে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠে।

এই সংস্কৃতি জীবন সম্পৃক্ত, বস্তু সংলগ্ন এবং মানস-সম্ভূত। একেই ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বাংলাদেশে যে সংস্কৃতিগত ঐক্য হাজার বৎসর ধরিরা গড়িয়া উঠিয়াছে, যে যে বস্তু বা অনুষ্ঠান অথবা মনোভাবকে অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—নীচে তাহার একটি দিগদর্শন বা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইতেছে।"[১০৭] তালিকাটি পাশ্চাত্য পণ্ডিত ই. বি. টেইলারের সমর্থনে নিম্নরূপ দর্শাইতে পারি—

(ক) বস্তুগত সংস্কৃতি
(খ) অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতি
(গ) অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি

বস্তুগত সংস্কৃতি মূলতঃ ব্যবহারিক জীবন প্রয়াসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জীবনপ্রয়াস সৃষ্টিধর্মী—হস্তশিল্প, যন্ত্রশিল্প, বাসস্থান—নিত্যব্যবহার্য জিনিস-পত্র এই জীবনপ্রয়াস সম্ভূত।

মানুষ কাব্যে, নৃত্যে, চিত্রে, আনন্দলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করে। মানুষের এই সৃষ্টি তার ব্যবহারিক জীবনের অতিরিক্ত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোলোকের এই চিন্তার ফসলকে অতীন্দ্রিয় সংস্কৃতি বলে।

আবার কখনো কখনো মানুষের কাজ, গান, নৃত্য, সব একাকার হয়ে যায়। যেমন চাষী মাঠে ধান বুনতে বুনতে আপন খেয়ালে গাইতে থাকে কিংবা ব্রত

অনুষ্ঠানে সংগীত, চিত্র ও আচারের সমাবেশ ঘটে। ক্রিয়া নির্ভর এরূপ আচার আচরণ ও আমোদ-প্রমোদকে অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি বলে।

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য সংস্কৃতির এই তিনরূপকে—ত্রিসঞ্চয় বলেছেন—যথা, দ্রব্যসঞ্চয়, শিল্পসঞ্চয়, সত্যসঞ্চয়। তিনি লিখেছেন—"দ্রব্যসঞ্চয়ে মানুষের অর্থনৈতিক চাওয়া-পাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, শিল্পসঞ্চয়ে পাওয়া যায় তার প্রকাশ ব্যাকুলতার রূপ আর চিন্তা বা সত্যসঞ্চয়ে পাওয়া যায় ভাব ভাবনা, ও জ্ঞান বিজ্ঞানের পরিচয়। মোটামুটি এই তিন উপকরণের হিসেবেই সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতির হিসেব।"[১০৮]

নানা লোকাচার ও স্ত্রীআচার এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে। প্রসঙ্গতঃ লোকসংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন।

'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমাদের সমস্ত জীবনকে কেন্দ্র করে যে চর্যা তার সমস্তই লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। লোকসংস্কৃতি সরল ও গতানুগতিক। সাধারণতঃ উত্তরাধিকার সূত্রেই এগুলি প্রাপ্ত। লোকসংস্কৃতি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সৃষ্ট নয় অর্থাৎ মননশীল নয়। স্বাভাবিকতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিরক্ষর জনসাধারণ কোন কিছু গ্রন্থিবদ্ধ করে রাখে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা প্রকাশ লোকমুখে প্রচারিত হয় এবং সমাজের বহুজনের গ্রহণযোগ্যভাবে গৃহীত হয়। ফলে একটি দেশের একটি জাতির সামাগ্রিক পরিচয় লোকসংস্কৃতির মধ্যে ধরা পড়ে। লোকসংস্কৃতির দুটি দিক মৌখিক দিক (formali·ed culture) ও বস্তুগতদিক (material culture)। একে লোকসাহিত্য, লোকনৃত্যও লোক শিল্প বলা যেতে পারে। উভয়ের মধ্যে লোকমানস ও লোকজীবনের ছবি আছে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে লোকসংস্কৃতির পুনর্জাগরণের শুরু—তার প্রয়াস আজো অব্যাহত। ইংরেজ, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আকর্ষণে আমাদের নাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল। তাই আজ যখন স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও একে আরে বেগবান করার প্রয়োজনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি বিশ্ব জুড়ে এক অনুশীলন ও গবেষণা চলছে তখন আমরা এই বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারি না। বস্তুতঃ লোকসংস্কৃতির চর্চা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব।

লোক-নৃত্য-গীত-কথা-নাট্য-বাদ্যশিল্প চিত্রশিল্প বিলুপ্ত হয়নি। তাই আজ এই সব শিল্পের বিকাশের বৃহত্তর পটভূমিতে লোকশিল্পীদের অর্থনীতিক,

রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দ্রুত ও যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিল্পী যদি মানুষের মত ভয় শূন্য, মুক্ত চিত্তে বাঁচার সুযোগ পায় তবে শিল্পও যথার্থ ভাবে বাঁচবে।

লোকসংস্কৃতির চর্চা যত বেশী হবে—বিশ্বজনীনতা বোধ তত গভীরতর হবে এবং প্রসার লাভ করবে। কারণ লোকসাহিত্যের বা লোক শিল্পের মধ্যে আন্তর্জাতিক ঐক্য রয়েছে। ব্যাপক চর্চার ফলে তা উদ্ঘাটিত হবে এবং আমাদের সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করবে। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় ভেদবুদ্ধির দূরীকরণে লোকসংস্কৃতির চর্চা বিশেষ ভূমিকা নেবে।

লোক কবি গেয়েছেন——

"নানান বরণ গাভীরে ভাই/একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দ্যেখলাম/একই মায়ের পুত"

এই ছত্রের মধ্যেই লোকসংস্কৃতির মূল সুরটি ধরা পড়েছে। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও মহামিলন গড়ে তোলার প্রয়াসে—এর চেয়ে বড় কথা কি হতে পারে' ?

সুতরাং 'সমগ্র জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান উন্নয়নের জন্য যে নতুন ধরনের সাংস্কৃতিক জাগরণের শপথ উচ্চারিত হচ্ছে তারই বিস্তৃত বহু শোভিত প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কৃতির পুনর্জাগরণের দায়দায়িত্ব সমগ্র দেশের উপর এসে পড়েছে। দেশ যদি এই দায়ভার গ্রহণ না করে তবে সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ে লোক-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদগুলিও বিনষ্ট হবে'।"[০৯]

সমাজ-ব্যবস্থা মূলতঃ কৃষিভিত্তিক। ফলে এই সমাজে লোকাচারগুলিও কৃষিকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ভাত এই রাজ্যের মানুষের প্রধান খাদ্য। বহুরকমের ধান—এই মাটিতে উৎপন্ন হয়। এখানে তিনশ্রেণীর ধান চাষ হয়—আউশ, আমন ও বোরো। চাউলের ব্যবহার খুবই প্রাচীন, যদিও কেউ কেউ ধানের জন্মস্থান হিসেবে চীনের কথা বলেন। চাউল থেকে শুধু ভাত নয়—নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য তৈরী হয়, যেমন—পিঠা, চিড়া, মুড়ি, খই—এগুলি থেকে আবার নানা মুখরোচক খাবারও হয়।

কৃষি রক্ষা করার তাগিদেই নানা আচার আচরণ গড়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে 'পুত এবং ক্ষেত' কৌমজীবনের এ দুটি নিয়েই নানা ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল এবং ব্রত বা অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই সেই জন্যই "অনগ্রসর কৃষি সমাজের মূলকামনা শস্য ও সন্তানের জন্যই নানাবিধ ইন্দ্রজালের অবতারণা…ভূমি বা

পাথরে সিঁদুর দিয়ে প্রকৃতিকে ঋতুমতী কল্পনা করা হল। প্রকৃতির নানা ফসল প্রকৃতির সন্তানরূপে গৃহীত হল। বিভিন্ন বৃক্ষে বিভিন্ন দেবদেবীর আস্তানা কল্পিত হয়ে বৃক্ষপূজা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। পূজিত হতে লাগল নানা ফল ও ফসল। বিশ্বাস, সংস্কার, টোটেম, ট্যাবু আদি লোকজীবনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এরই মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারাদি এসে ভীড় জমাল—লোকসমাজ, কৃষিজীবী সমাজ। তাই শুধু হলকর্ষণের জন্যই নয়, বীজবপনের জন্য নানাবিধ শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় আচার আচরণ অনুষ্ঠিত হতে লাগল। অনুষ্ঠিত হতে লাগল লোকসমাজের সেই আদিম ও অকৃত্রিম ব্রত আচার আচরণাদিও।

তাই হলকর্ষণের পরে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী বীজ রোপনের দিন নির্দিষ্ট করতে হয়। যেমন—

'শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো,
এর মধ্যে যত পারো'...।[৪৭]

বিজ্ঞানের প্রভাব যদিও এসব আচার আচরণের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেছে—তবু গ্রামের নিরক্ষর মানুষ এগুলি আজো বিশ্বাস করে এবং যারা অবিশ্বাস করতে চান—গল্প, পরস্পরের মধ্য দিয়ে এগুলি তাঁদের কাছেতও পেঁছয়।

শুধু লোকাচার নয়—নানা বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রাচীন মূল্যবোধ জীবন ও সমাজকে প্রভাবিত করছে। অবশ্যই সমাজ ও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ তার প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার ও মূল্যবোধকে বর্জন করে নতুন জ্ঞান, নতুন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিশাল পটভূমিতে এসেছে—এবং এই অগ্রগমন অব্যাহত রয়েছে। তবু আজকের অতি সভ্যমানুষও বলতে পারে না আদিম সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কার ত্যাগ করতে পেরেছে। নানা কারণে এই লোক বিশ্বাস, লোক সংস্কার বা সংস্কারের বাড়াবাড়ি খুবই প্রকট।

আসলে মানুষের অজ্ঞতা থেকেই নানা সংস্কার ও লোকবিশ্বাস জন্ম নেয়। আদিকাল থেকে প্রকৃতি নানা কার্যকলাপ, কিংবা রোগ, শোক থেকে মুক্তির চিন্তা করেছে, কখনও নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছে—কখনও পূর্বপুরুষদের প্রচলিত পথেই বিচরণ করেছে, কিংবা অসহায় হয়ে পরিদৃশ্যমান জগতের নানা ক্রিয়ায় হয় আত্মসমর্পণ করেছে।

ভারতবর্ষের প্রায় ৭0% লোক নিরক্ষর। ফলে শিক্ষার আলো থেকে

বঞ্চিত এ সমস্ত মানুষের জীবনে যে লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কার রাজত্ব করবে,—তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এসব লোকসংস্কার গ্রাম ও শহরে কিছুটা আলাদা থাকে তবে লোকসংস্কার বা বিশ্বাস বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। যেমন তের সংখ্যাটি অশুভসূচক, এধারণা খুবই ব্যাপক। কিংবা হাঁচি, টিকটিকি, খালিবলস, বা মঘা, অমাবস্যা, ভাদ্রমাসের পয়লা তারিখে যাত্রা—এগুলি যে অশুভ শুধু এ অঞ্চলে নয়। বাংলাদেশ বা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধারণা রয়েছে। কিংবা সন্তানের নাম রাখার মধ্যেও নানা কুসংস্কারের প্রভাব দেখা যায়—যেমন যে সব মাতা পিতার সন্তান মারা যায়—তারা তাদের শিশুদের নাম রাখেন মরণ বা মরণী, তোয়ান্যা,* ফকির, আঁচাল্লা* প্রভৃতি। ভূমিকম্প বা গ্রহণ সম্পর্কেও নানা লোকবিশ্বাস আছে। কিংবা নানাবিধ নিষেধ গড়ে উঠেছে—লোকবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে, যেমন—বৃহস্পতিবার ও রবিবার ঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে নেই—কারণ বৃহস্পতিবার বাঁশের জন্মদিন, রবিবারে বাঁশের জ্বর হয়।

ত্রিপুর জাতির মূলভাষা উচ্চবিদ্যালয় কিংবা কলেজের শিক্ষায় স্থান না পেলেও ত্রিপুরায় মূল জনসমাজ তাদের আপন ভাষায় কথা বলে। এ ভাষাকে 'কগবরক' বলে।

তাদের স্বভাবগত কলাপ্রীতির দিক খুবই উল্লেখযোগ্য। তারা সম্প্রদায় হিসাবেই সঙ্গীত, চিত্রকলা ও কবিতাপ্রিয়। এই ত্রিপুরজাতি থেকে উদ্ভূত কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা হলেন মহিলা কবি ও সাহিত্যিক অনঙ্গমোহিনী দেবী, করবী দেববর্মন, গায়কশ্রেষ্ঠ শচীন দেববর্মন, বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন মহাশয়, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য ও সংগীতে শ্রীভূবন ঠাকুর, সংগীতশিল্পী পুলিন বর্মন, কিরণ বর্মন, জ্যোতিষ বর্মন, সিনেমা জগতে প্রথিতযশা রাহুল দেববর্মন। এঁরা ছাড়াও ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ত্রিপুর জাতি তাদ্যের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে।

এদের

(ক) নিজস্ব নৃত্য আছে।

---

* তোয়াল্লা = কুড়িয়ে আনা

আঁচাল্লা = আস্তাকুড়

(খ) নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র আছে (যথা, সারিন্দা, খাস, সারিন্দা, ত্রিপুরা ফ্লুট, সুসুল)

(গ) কুটির শিল্প, চারুত্ব ও কারুত্বে নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে।

এদের এই গুণরাজির উৎস ছড়িয়ে আছে তাদের প্রচলিত সংগীত, লোককথা ও প্রতিদিনের ব্যবহৃত প্রবাদ ও ধাঁধার মধ্যে—তাদের কৃষিজীবনের উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে।

তারা পাহাড়ে টিলায় বাস করলেও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহকারে গান গায়—নিজেদের ক্লান্ত জীবনে কিছু আনন্দ আনে। এরূপ একটি গান নীচে দেয়া হলো ঃ

"...মাই সিং সিয়ারি বাংমানি বাগর যাদুম না হারয়
নুহুর লিয়া
হাদু লোক দুলোকঁ মিয়ইব নাইখা...
যাদুনি ইয়া ছিতাম—
শ্রীআঙ্গুটি জুগান পিতিপিতি...।

অর্থাৎ, ঘন কুয়াশা দিগ্‌দিগন্ত
আচ্ছন্ন করেছে।
প্রিয়কে দেখবার জন্যে
কত না যত্ন করেছি,
হায় আমার কোন মতে
দেখা হলো না।
তারপর কত চড়াই উৎরাই
ভাঙ্গতে লাগলাম।
তবু আমার প্রিয়কে
দেখা হলো না।
এখন সারাদিন বসে বসে
আনমনে
তাহার শ্রীঅঙ্গুরীটি ঘস্‌ছি।"[১১১]

আধুনিক সকল প্রভাব থেকে বহুদূরে বনভূমির ছায়ামাখা প্রান্তরে এরা নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র সুর সহযোগে এমনি সব গান গায়।

এই রাজ্যে নানা বর্ণের লোকের বাস। সকলে নিজস্বপ্রথা অনুযায়ী বিচিত্র দ্রব্য সরবরাহ করে। প্রকৃতপক্ষে এই "...বর্ণবিন্যাস ভারতীয় সমাজ বিন্যাসের ভিত্তি। খাওয়া দাওরা এবং বিবাহ ব্যবহারের বিধি নিষেধের উপর ভিত্তি করিয়া আর্যপূর্ব ভারতবর্ষে যে সমাজ ব্যবস্থার পত্তন ছিল তাহাকে পিতৃপ্রধান আর্যসমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ঢালিয়া সাজাইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছিল।...এইসব বিচিত্র বর্ণ, উপবর্ণ, সংকর বর্ণ, সকল কালে ও ভারতবর্ষের সকল স্থানে একপ্রকার ছিল না, এখনও নয়; সকল স্মৃতি শাস্ত্রে সেইজন্য এক প্রকারের বিবরণও পাওয়া যায় না।...সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্ধারিণ অনুযায়ী বিচার করিলে ভারতীয় বর্ণবিন্যাস আর্যপূর্ব ও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রকাশ। অবশ্যই এই মিলন একদিনে হয় নাই; বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম বিচিত্র মিলন ও আদান প্রদানের মধ্য দিয়া এই সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে।"[১১২] এই রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এবং শাঁখারী, মোদক (ময়রা) তন্তুবায়, দাস (চাষী), কর্মকার, সুবর্ণবণিক, কুমার প্রভৃতি উপ ও সংকর বর্ণ রয়েছে।

নানাবর্ণের সমাবেশ হলেও রাজ্যের ধর্মীয় আচরণে বৈষ্ণবীয়তা ও পৌরাণিকতার সঙ্গে লৌকিক দেবতাদের একত্র অবস্থান খুব উল্লেখযোগ্য দিক। "ত্রিপুর রাজগণ ধর্মমতে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব..."[১১৩] ছিলেন। পূর্বে রাজপরিবারে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ছিল। 'রাজমালার' মতে মহারাজ দৈত্যের পুত্র অত্যাচারী ত্রিপুরকে প্রজাদের কাতর আহ্বানে মহাদেব হত্যা করেন। পরে পুত্র লাভের জন্য হীরাবতী মহাদেবের আরাধনা করে পুত্র লাভ করেন। এ ছাড়া ত্রিপুরার যে কুলদেবতা চৌদ্দদেবতা সেখানেও শিবের মাথা আছে। শক্তিদেবী ত্রিপুরীশ্বরী তো দীর্ঘদিন রাজপরিবারের আরাধ্য দেবতা ছিলেন। ত্রিপুরীশ্বরীকে কেন্দ্র করেই 'বিসর্জন' নাটক গড়ে উঠে। তবে এই পরিবারে শেষ দিকে বৈষ্ণব ধর্ম আধিপত্য বিস্তার করে। রাজধর মাণিক্যের সময়ে নিত্যানন্দের বংশধর গোস্বামীগণ রাজবংশকে দীক্ষা দেন, কল্যাণমাণিক্যের সম্পর্কে 'রাজমালা'য় দেখা যায়ঃ

> "নিজপুত্র সম্মুখেতে ছিল একস্থান।
> বিষ্ণুর আলয় তাতে করয়ে স্থাপন।"
>
> (রাজমালা : ৩য় খণ্ড)

বীরচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৬২-১৮৯৭) বৈষ্ণবধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত বৈষ্ণবপদগুলি একজন বৈষ্ণব ভক্তেরই পরিচয় ফুটিয়ে তোলে। তাঁর কৃষ্ণরূপ বর্ণনা করে লিখিত একটি পদ তুলে ধরা হলো ঃ

"নীল নব জলদ রুচি রুচি রুচির সুন্দর
পীত ধটি কটিতটে সুসাজে।
মুকুট পরি খচিত শিখী পুচ্ছে নবমল্লিকা
বক্ষে বনমালা বিরাজে।
অধরপর বেনু তঁহি মিলিত সুখ মোদনে
মধু মধু মধুর মোহতানে।
শুনহি পশুপাখী কুল পাখীকুল পুলকিত
তপন তনয়া বহু উজানে।
শ্রবণ যুগে মণিমকর গণ্ডে করা ঝলমল
সেই পয় বিজরি যনু হাসে।
সহজে দৃক্ অঞ্চল জিনিয়া সরসীরুহ
তাহে কত কুসুমশর ভাসে
কেলি কদমতলে সুললিত ত্রিভঙ্গিয়া
নব অরুণ চরণ অরবিন্দ।
গোকুলকুল রমণীক মনসিজ সুমূর্ত্তিময়
শেখর কি ললিত মতিনন্দ।

বীরচন্দ্র মাণিক্যের অন্য নাম ছিল ললিতচন্দ্র। তাঁর একটি গৌরচন্দ্রিকাপদঃ

"দেখরে রঙ্গ,
গৌরচন্দ্র ভোলে অপরূপ ভাবিয়া,
অনুপরসরূপ নাহিক স্বরূপ
প্রভাত অরুণ জিনিয়া।
সুরঙ্গ হিন্দোল অতিঝলমল
কুলায় ভবত মিলিয়া,
সঘন আনন্দে করত জয়ধ্বনি
যতেক নদীয়া বসিয়া।
করু নবরসে গৌর কিশোর
কুটিল কটাক্ষ রঙ্গিয়া,

নদীয়া নাগরী হেরিও মাধুরী

বিবশ বদনে মাতিয়া।

ঝুলতহি পহু আনন্দ হিন্দোলে

কতকোটি কাম জিনিয়া।

পহু গুণগান আনন্দে গাঁওত

দীন বীরচন্দ্র দাসিয়া।"

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম 'কণিকা' ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রাজকবি মদনমোহন মিত্র লিখেছেন "ত্রিপুরা রাজ পরিবার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত। গোপীভাব অবলম্বনে আরো দুইচারটি কবিতা লিখার জন্য অনুরোধ করি ঃ আমার উৎসাহেই শেষের কবিতা কয়টি লিখিত হইয়াছে।"

তাঁর কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

"সখী কে বুঝিবে আর

দুখিনী রাধার

ব্যাকুল প্রাণের কথা

ওগো কারে বা কহিব

কেহ বা শুনিবে

এ ঘোর বিরহ গাথা।

আমি পারিনে পারিনে

আর যে পারিনে

বহিতে এ হৃদিভার

আমার সুখ ঘুমঘোর

গিয়েছে ভাঙ্গিয়া

ছিঁড়েছে হৃদয় তার।"

শেষের দিকে রাধিকা 'দারুণ জ্বালা জুড়াতে' মৃত্যু কামনা করেছেন।

আজি তিমিরা যামিনী

চাঁদ বিরহিনী

আঁধার নিকুঞ্জবন,

ফেলি দুঃখের শোয়াস

বেড়ায় বাতাস

বন অতি নিরজন।

দেখ নীরদ গগন

সাজিল সঘন

চারিদিকে ঘোরতম।

আজি নিকুঞ্জকানন

বিষনাদে মগন

মম হৃদয়ের গান।

শুন ডাকিছে যমুনা

কুল কুল করি

আয় রাই মম কোলে।

তব এ দারুণ জ্বালা

জড়াবে গো সখী

আমার শীতল জলে।"

তবে যাইগো সজনি

আকুল হৃদয়

জুড়াইতে চিরতরে—

আজি সজনিলো মম

পিয়াসিত প্রাণ

মিলাব যমুনা নীরে।"

রাজপরিবারের উল্লিখিত সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও ত্রিপুরার সন্তান অজয় ভট্টাচার্যের দান বাংলা কাব্য সংগীতে নজরুলের পরই উল্লেখের দাবী রাখে। শুধু তাই নয়, গীতিকার ও. চিত্রপরিচালক হিসেবে অজয় ভট্টাচার্য, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত এবং গায়কশ্রেষ্ঠ শচীনদেব বর্মনের অবদান স্বীকার্য।

উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরা সম্প্রদায় অধিক। অনেকের ধারণা এই শাখা থেকে বর্ত্তমান রাজবংশের উদ্ভব। ধর্ম অনুষ্ঠানে এরা হিন্দুধর্মের অনুসারী। তবে এরা পীঠদেবী ত্রিপুরী সুন্দরীর সেবা করেন, আবার কুলদেবতার পূজাও করেন। এই চতুর্দ্দশ দেবতার মধ্যে শৈব, শক্তি ও বৈষ্ণব ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতারা আছেন। ফলে চতুর্দ্দশ দেবতা শুধু নানা কাহিনী, কিংবদন্তীতে সীমাবদ্ধ নয়। এ নিয়ে গবেষকদের নানা সুচিন্তিত মত দেখা যায়। চতুর্দ্দশ দেবতারা হলেন ঃ

১.	হর (শৈব)	৮.	বাণী (বাগ্দেবী
২.	উমা (তান্ত্রিক)	৯.	কুমার (কার্ত্তিক)
৩.	হরি (বৈষ্ণবসম্প্রদায়)	১০.	গণপা (গণেশ)
৪.	মা (লক্ষ্মী)	১১.	বিধি (ব্রহ্মা)
৫.	গঙ্গা (ভাগীরথী)	১২.	ক্ষিতি (পৃথিবী)
৬.	শিখি (অগ্নি)	১৩.	অবদি (সমুদ্র)
৭.	কাম	১৪.	হিমাদ্রি

অবশ্য এই চৌদ্দ দেবতা শুধু রাজ পরিবারে নয়, ত্রিপুরাবাসীও আরাধ্য দেবতা, এই রাজ্যকেও চৌদ্দ দেবতার জায়গা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রথমে ত্রিপুরার রাজধানী ত্রিবেণী নগরে (ত্রিবেগ রাজ্য) চতুর্দ্দশ দেবতাকে স্থাপন করে। পরবর্ত্তী সময়ে উদয়পুরে আনা হয়। উদয়পুরের প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরটি এখনও আছে। পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান স্থান, পুরাণ আগরতলায় আনয়ণ করা হয়। চৌদ্দ দেবতার বিশেষ কোন অবয়ব নেই— শুধু চৌদ্দটি মাথা আছে। তেরটি মাথা অষ্টধাতুর, শুধু শিবের মাথা রৌপ্য নির্মিত।

সংস্কৃত 'রাজমালায়' উক্ত দেবতাদের নাম ঃ

"হরোমা হরিমা বাণী কুমারো গণনাবিধি।
ক্ষাব্ধি গঙ্গা শিখীকামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশঃ।"

আরেক জায়গায় ঃ

"শঙ্করঞ্চ শিবানীঞ্চ মুরারিং কমলাং তথা।
ভারতীঞ্চ কুমারঞ্চ গণেশং মেধসং তথা॥
ধরণীং জাহ্নবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা।
হুতাশঞ্চ গণেশঞ্চ দেবতাঙ্গঃ শুভাবহাঃ॥"

বাংলায় রাজমালায় অছে ঃ

মহাদেববিধি কহে শুনে মন্ত্রিগণে।
করপুটাঞ্জলি হইয়া শুনে সর্ব্বজনে।
হর উমা হরি মাবাণী কুমার গণেশ।
ব্রহ্ম পৃথবী গঙ্গা অব্ধি অগ্নিযে কামেল।
হিমালয় অন্তে করি চতুর্দ্দশ দেব।
অগ্রেতে পুজিব সূর্য্য, পাছে চন্দ্রসেবা।"

পুরানো আগরতলায় এখনও চতুর্দ্দশ দেবতার পূজো উপলক্ষ্যে মেলা বসে এবং এর বৈশিষ্ট্য ত্রিপুরাবাসী ও বহির্রাজ্যের লোকদের আকর্ষণ করে।

তবু "পুরাণো আগরতলার চতুর্দশ দেবতার মন্দিরটি দেড়শো বছরের বেশি পুরাণো কিছুতেই নয়। সাধারণ দো- চালা বড় পাকা ঘর। সংলগ্ন বারান্দা আছে। সামনে নাটমণ্ডপ, বলির বলির সর্ববিধ আয়োজন আছে। মণ্ডপের সামনে বড় প্রাঙ্গণ এবং তার সামনে বিরাট দীঘি, পূজার্থী ও বলির পশুদের স্নান করানো হয়। মন্দিরের পিছনে প্রবীন প্রধান পুরোহিত (চন্তাই উপাধিধারী এবং ক্ষত্রিয় রাজবংশ সম্ভূত বলে দাবীদার, আসলে বৃত্তিভোগী) এবং অন্যান্য পূজারীদের সপরিবার আবাসস্থল। নাটমণ্ডপের একদিকে গাছতলায় (আদিতে নাকি গাছটি শিমুল ছিল) টিনের চালা বেঁধে বুড়োবাবার (বড়াম—বড়ম—বুড়ো—বুড়োবাবা) থান্। কাঠের ফুট দেড়েক লম্বা, মনুষ্যমূর্ত্তির আদলে তৈরী, চোখ মুখ নাক কিছু নেই—অনেকটা অবনীন্দ্রনাথের কাটুম কুটুম শিল্পকর্মের মত। বুড়োবাবার পায়ের কাছে পাথরের একটি ব্যাঘ্রপদ, পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট থাবা—ফুটখানেক লম্বা। মূর্ত্তির কাষ্ঠ অবয়বে এবং ব্যাঘ্রপদে সিঁদুর ফুল বেলপাতা দিয়ে নিত্য পূজা হয়। পূজারী গাসিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষ। চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার আগে বুড়ো বাবার পূজা হয়। বাঁশের পাত্রে জল ঢেলে প্রথমে বুড়ো বাবাকে স্নান করানো হয়—তারপর পূজো। একই ভাবে চৌদ্দ দেবতাকে স্নান করিয়ে পূজো দেওয়া হয়। ধাতু নির্মিত পাত্রের জলও পরে ঢালা হয়। মনে হয় পরবর্ত্তীকালের এটি আধুনিক সংযোজন প্রয়াস। চৌদ্দ দেবতার মন্দিরের বারান্দায় এককোণে চক্রবর্ত্তী উপাধিধারী এক অশীতিপর বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত দৈনিক চণ্ডীপাঠ সহ ব্রাহ্মণ্য মতে পূজার্চনা করে থাকেন। চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের মধ্যে কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিত্য ও বিশেষ পূজায় চণ্ডাই সম্প্রদায়ের পুরোহিত ছাড়া মন্দিরের ভেতর অন্য কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। ক্ষীণ আলোকে চণ্ডাই পুরোহিত প্রথমে বাঁশের পাত্রে জল নিয়ে অভ্যন্তর ভাগ ধুয়ে মূল মূর্ত্তিকে স্নান করান। যতদূর দেখা গেছে (আলোক চিত্রের অনুমতি নেই) ফুট দেড়েক লম্বা আধফুট চওড়া কাল পাথরের দাঁড়ানো পুরুষমূর্ত্তি, দেহের উপরের অংশ হয় ভগ্ন কিম্বা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকায় দৃশ্যমান নয়। মূর্ত্তিটিকে ঘিরে পাথরের সপ্ত অশ্ববাহী সপ্ত সারথী মূর্ত্তি। সম্মুখে দুই পাশে ঊষা ও প্রত্যূষের মূর্ত্তি।

মূর্ত্তিটির ঢাকা অংশের ওপরে একটি কাঠের সুদৃশ্য পেটিকা। পেটিকাটিও কাপড় দিয়ে ঢাকা। ঢাকা কাপড়ের উপর হর, হরি ও পার্বতী তিনটি মুখ শায়িত। নিত্যপূজায় স্নানের পর বাদ্য বাজনা সহ পূজারতি সম্পন্ন হয়। আরতির পর ছাগল বা অন্য কোনো প্রাণী বলি দেওয়া হয়। দৈনিক পঞ্চাশ ষাটজন স্থানীয় পূজার্থী পূজা মানত অঞ্জলিদান ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। চণ্ডাই পুরোহিতরা পূজাবিধি, মন্ত্র বা দেবতার আরাধনা পদ্ধতি সম্পর্কে কোন কিছুই প্রকাশ করতে চান না।"[১১৪]

ত্রিপুরার লোকজীবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অল্প পরিসরে অতি অল্প আলোচিত এই দিকটির প্রতি সুধীজনের বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টির জন্য এই আলোচনার সূত্রপাত। আশা করি, আগামী দিনে এই বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা হবে। এই খণ্ডে ত্রিপুরার লোক সাহিত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য লোক জীবনের বিস্তৃতরূপ তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায়—এই রাজ্যের অধিকাংশই বাঙালী এবং ত্রিপুরায় এই সমস্ত উপজাতিদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এবং জাতি হিসাবে উন্নত হওয়ার জন্য নানাবিধ সাধু প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অনস্বীকার্যভাবে "অনেকখানি বাঙালীত্ব ঘটেছে অর্থাৎ এরা অনেকখানি বাঙালী সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে।"[১১৫] পরবর্ত্তী লোক-সাহিত্যের আলোচনায় বাঙালী জীবনধারাই মুখ্যস্থান লাভ করেছে।

উল্লেখ পঞ্জী

১। After partition and settlement of refugee the population composition and demographic aspects of Tripura have entirely changed. As compared to 646000 in 1951 the estimated population for the year 1957 was 921000. The refugee outnumbered the original inhabitant and the Original inhabitants and the total population of the territory was quite large for migration [Techno—Eeconomic survery of Tripura National Council of applied economic research]

২। Census of India—1971

৩। ত্রিপুরার ইতিকথা : কৃষ্ণপদ দত্ত পৃঃ ৪০

৪। ঐ : পৃঃ ৪৩

৫। Census of India. vol. XII Assam, Manipur & Tripura. Part I Page—361

৬। সীমান্ত প্রকাশ—পূজা সংখ্যা ১৩৮১

৭। ঐ

৮। রাজমালা—১ম খণ্ড—ত্রিপুর রাজবংশের আখ্যান

৯। Tripnra a patriot of population. Page—145

১০। ত্রিপুরা গেজেটিয়ার

১১। রাজমালা। কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১ম লহর।

১২। ঐ পৃঃ ৮৫

১৩। ঐ পৃঃ ৪দ৯ পৃঃ ৬

১৪। Kirata—Jana—Krti (Forward) : S. K. Chatterjee
১৫। ঐ পৃ: ১৮—১৯
১৬। পূর্বভারতের সংস্কৃতির সংহতি : ডঃ মহেশ্বর নেওগ।
১৭। বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা : গোপাল হালদার পৃ: ১৫১
১৮। আসামের লোকসংস্কৃতি : যোগেশ দাস। পৃ: ৩—৫
১৯। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি : প্রফেসর পিয়ের ব্যাসানত। পৃ: ৫
২০। রাজমালা ; কৈলাসচন্দ্র সিংহ : ২য় পুনর্মুদ্রণ। পৃ: ৫৯
২১। 'ত্রিপুরার রূপকথা' (ত্রিপুরা সরকার প্রকাশিত) অবলম্বনে।
২২। 'রাজমালা' (কৈলাসচন্দ্র সিংহ) অবলম্বনে।
২৩। ত্রিপুরার ইতিহাসের রূপরেখা : ডঃ জগদীশ গণচৌধুরী।
২৪। বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম : শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত। পৃ: ৭৮
২৫। ঐ পৃ: ৬৬
২৬। ঐ পৃ: ৭৯
২৭। বাংলার ইতিহাস : রমেশচন্দ্র মজুমদার। ১ম খণ্ড পৃ: ১৮
২৮। ঐ পৃ: ১৭০
২৯। রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ। পৃ: ৬৩
৩০। ঐ পৃ: ৪৮—৪৯
৩১। ঐ পৃ: ৬৪
৩২। Tripura through the Ages : N. R. Roy Chowdhury P-25
৩৩। ত্রিপুরার ইতিহাস। কে. পি. দত্ত। পৃ: ৫
৩৪। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা। ত্রিপুরা সরকার। পৃ: ৪১৯
৩৫। ঐ পৃ: ৩৪
৩৬। ঐ পৃ: ১৬
৩৭। অধুনা গুপ্ত 'রবি' পত্রিকা। ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।
৩৮। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা পৃ: ১৬
৩৯। 'ভারতভাস্কর' অনুষ্ঠানে কবির বাণী থেকে।
৪০। 'রবি' ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।

৪১। Tripura through the Ages: N. R. Roy Chowdhury P-82

৪২। ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর। ধর্মনগর বিভাগ। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

৪৩। রাজমালা। কালীপ্রসন্ন সিংহ। পৃ: ৬২

৪৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। পৃ: ৪৫—৪৬

৪৫। ঐ পৃ: ৪৫

৪৬। নাথপন্থ: কল্যাণী মল্লিক পৃ: ৫

৪৭। প্রাচীন বাঙলার গৌরব: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃ: ৩৫—৩৭

৪৮। নাথপন্থ: কল্যাণী মল্লিক পৃ: ১০

৪৯। রাজমালা। কালীপ্রসন্ন সিংহ। পৃ: ৬২

৫০। ত্রিপুরার স্মৃতি। সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মন। পৃ: ৭২

৫১। স্মৃতি বিজড়িত পিলাক সভ্যতা। একটি সমীক্ষা। (প্রবন্ধ)

আশীষ কুমার বৈদ্য।

৫২। 'ত্রিপুরার স্মৃতি' অবলম্বনে।

৫৩। ঐ পৃ: ৭৯—৮০

৫৪। উনকোটি মূর্ত্তি প্রসঙ্গে। ডঃ সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৫। অমলীঘাট নিবাসী (সাবরুম) শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের নিকট থেকে সংগৃহীত। বয়স—৭৩

৫৬। Tripura throgh the Ages. N. R. Roy Choudhury, P-52

৫৭। মনুঘাট নিবাসী শ্রীযুত গৌরাঙ্গশীল মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত। বয়স—৪৩

৫৮। ত্রিপুরা দর্পন। ২৫শে মার্চ '৮০

৫৯। ঐ

৬০। Tripura Through the Ages. N.R. Rcy Chowdhury, P-107

৬১। রতনমণির গান ও রিয়াং বিদ্রোহের আধ্যাত্মিক পটভূমি। শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত।

৬২। দৈনিক দেশের কথা—২১শে মার্চ ১৯৮০

৬৩। আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমিকা : শ্রীবীরেন দত্ত।

৬৪। ত্রিপুরার বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রসঙ্গে। ক্ষিতিশ দাস (প্রাক্তন মন্ত্রী)

৬৫। ভারতের আদিবাসী : সুবোধ ঘোষ। পৃঃ ১—৬

৬৬। Tripura a potrait of Population : 1971

৬৭। Tripura and its tribal population : Dr. Nira Chatterjee.

৬৮। ভারতের আদিবাসী : সুবোধ ঘোষ। পৃঃ ৫০

৬৯। রিয়াং একটি সম্প্রদায় : হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা।

৭০। রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় উপজাতির গণচেতনা : বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য।

৭১। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট : একটা সমীক্ষা। ত্রিপুরা দর্পণ। শারদ সংখ্যা। ১৯৮৪।

৭২। ঐ পৃঃ ১৪

৭৩। ঐ পৃঃ ১৫

৭৪। The tirbes of Tripura : Directorate of Tribal Research Govt of Tripura. P—12

৭৫। আরণ্য সংস্কৃতি : আবদুল সত্তার। পৃঃ ৮১

৭৬। রিয়াং একটি সম্প্রদায় : হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা।

৭৭। The Tribes of Tripura : Directorate of Tribal Research P—4-5

৭৮। The Melencsian : Studies in their Anthropology and Folklore (1938). R. H. Codrington. P--118

৭৯। 'গড়িয়া প্রসঙ্গে কিছু কথা' (নিরঞ্জন দেববর্মা) অনুসরণে।

৮০। চাকমা : ত্রিপুরা সরকার পৃঃ ১—২

৮১। বিজু উৎসব কি ? ও কেন ? (অনিল চাকমা) অনুসরণে।

৮২। বিজুগান সংগ্রহ ও অনুবাদ : নমিতা বড়ুয়া।

৮৩। আরণ্য সংস্কৃতি : আবদুল সাত্তার। পৃঃ ৪—৫

৮৪। ঐ পৃঃ ১০৬

৮৫। ত্রিপুরার উপজাতি : সাঁওতাল। (ডঃ এস. বি. সাহা) অনুসরণে।

৮৬। আরণ্য সংস্কৃতি : আবদুস সাত্তার। পৃঃ ২৯

৮৭। ঋণস্বীকার : কমলকুমার সিংহ। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে ত্রিপুরার আদিবাসী।

৮৮। কগবরকের জন্য—বাংলা হরফ কেন চাই ? দশরথ দেব।
পৃঃ ৩-৯

৮৯। জনশিক্ষা সমিতির ঐতিহ্য : সুধন্য দেববর্মা।

৯০। ভারতের আদিবাসী : 'সুবোধ ঘোষ পৃঃ ১৯—২১

৯১। কগবরকে জন্য বাংলা হরফ কেন চাই ?

৯২। Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura : Dr. Heinz Bechert.

৯৩। আরণ্য সংস্কৃতি। আবদুস সাত্তার। পৃঃ ৮৫

৯৪। The worship of Nature I, J, G. Frazer. P—441

৯৫। আরণ্য সংস্কৃতি। আবদুস সাত্তার। পৃঃ ৪০—৪১

৯৬। সীমান্ত বাংলার লোকযান। সুধীরকুমার করণ।

৯৭। A study of the Jhum and Rehabi atior in the union territory of Tripura, By Directorate of Research
P—10

৯৮। ঐ পৃঃ ২০

৯৯। ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সমাজ অর্থনৈতিক সম্পর্ক : জগৎজ্যোতি রায়।

১০০। ত্রিপুরার জনসংখ্যা রূপান্তরের প্রেক্ষাপট : অনন্তকৃষ্ণ ধর।

১০১। ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সমাজ অর্থনৈতিক সম্পর্ক : জগৎজ্যোতি রায়।

১০২। জন জাতীয় ত্রিপুরী : অর্থনৈতিক রূপান্তর। এন. আর. দত্ত।

১০৩। Tripura a potrait of population : P—168

১০৪। ত্রিপুরার বাংলাভাষা ও সাহিত্য। মোহিত পুরকায়স্থ। পৃঃ ৫

১০৫। ঐ পৃঃ ১৪৫

১০৬। ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির রূপরেখা—ধবলকৃষ্ণ দেববর্মা।

১০৭। ভারত সংস্কৃতি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১১২—১১৫

১০৮। নাটকের রূপরীতি প্রয়োগ : সাধনকুমার ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩২

১০৯। ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির পরিচয় (লেখক) ভূমিকা।

১১০। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। শংকর সেনগুপ্ত। পৃঃ ৩৭৫

১১১। শ্রীবীরেণ দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।

১১২। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)। নীহাররঞ্জন রায়।
পৃঃ ২৬৭—২৭৭

১১৩। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড)। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১১৪। ত্রিপুরার চতুর্দশ দেবতা : প্রমোদ মুখোপাধ্যায়।

১১৫। ভারতের আদিবাসী : সুবোধ ঘোষ। পৃঃ ২০২